দর্শনের ভূমিকা

ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী
এম. এ., ডি. ফিল,
দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক,
প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত
তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৭৩

মুদ্রাকর ঃ
ভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বিপ্লবী পুলিন দাস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

পরমারাধ্যা মাতৃদেবী
স্বর্গতা অমিয়বালা দেবীর
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে—

নিবেদন

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো 'দর্শনের ভূমিকা' বিরাট দর্শনশাস্ত্রের সামান্য ভূমিকা মাত্র। দর্শনের মূল সমস্যাগুলোকে সহজ ও সরল মাতৃভাষায় প্রকাশ করার প্রচেষ্টা থেকেই এর জন্ম। এই ভূমিকা লেখবার সময় সাধারণ পাঠক ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হ'য়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাতৃভাষার কদর বেড়েছে। বিভিন্ন বিষয় মাতৃভাষায় লেখবার জন্য উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে। সাধাবণ লোক 'দর্শন' বুঝতে চায়। কিন্তু, উপযোগী বই নেই বলে তাদের আশা মিটছে না। এদের মুখ চেয়েই বই লিখতে বসেছি। এই বই লেখার আর একটা উদ্দেশ্যও আছে। শিক্ষকতা করতে গিয়ে দেখেছি, ছাত্রছাত্রীরা প্রায়ই দার্শনিক-সমস্যা ও তার বিভিন্ন সমাধানের জটিল অরণ্যের মধ্যে পথ হারিযে ফেলে। তাদের পথ-নির্দেশ দেবার চেষ্টাও এই গ্রন্থের লক্ষ্য। এই দুই উদ্দেশ্যের দিক থেকে যদি 'দর্শনের ভূমিকা' কোন অংশে সফল হ'য়ে থাকে তবে আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক হ'ল বলে মনে করব।

আর একটা কথাও বলে নিচ্ছি। এই গ্রন্থে মুখ্যতঃ পশ্চিমী দর্শনই আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের দেশের দর্শন অন্য গ্রন্থে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

মাতৃভাষায় দর্শনের কোন বই লিখতে গেলেই পরিভাষার প্রশ্ন খুব জটিল হ'য়ে দেখা দেয়। আমি এবিষয়ে আমার পূর্বসূরীদেব যথেষ্ট সাহায্য নিয়েছি। যেখানে যে পরিভাষা সুন্দর ও সহজ বলে মনে হ'য়েছে তা-ই গ্রহণ করেছি। আবার কখনও কখনও নিজেও পরিভাষা সৃষ্টি করেছি। পাঠকদের সুবিধের জন্য পরিভাষার সঙ্গেই বা পাদটীকায় ইংরেজী প্রতিশব্দ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আমার আগে যাঁরা বাংলা ভাষায় দর্শনের আলোচনা করেছেন, আমি পরিভাষা প্রণয়নে কমবেশী তাঁদের সকলের কাছেই ঋণী। এখানে কোন বিশেষ নাম করলে অন্য নাম বাদ পড়তে পারে ভয়ে কোন নামই করছি না। আমি সাধারণভাবে সকলের কাছেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

এই প্রসঙ্গে মাতৃভাষায় দর্শনের আলোচনায় যাঁরা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাঁদের নাম করি। পরমশ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ, ডক্টর রাসবিহারি-দাস, ডক্টর কালিদাস ভট্টাচার্য ও ডক্টর

অনিলকুমার রায়চৌধুরীর কাছেই আমি এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশী ঋণী। এঁদের সকলের জন্যই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা রইল।

অধ্যাপক অশোককুমার ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীদীপক চৌধুরী ও বন্ধুবর শ্রীবিনয়কুমার চক্রবর্তী মহাশয়েব নিত্য উৎসাহ ও নিরলস সাহায্য ছাড়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ সম্ভব হ'ত না। পরম শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয় মাতৃভাষায় দর্শনের গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য আমাকে খুবই উৎসাহ দিয়েছেন। সাহিত্যিক বন্ধু নারায়ণ চৌধুবী পুস্তক-প্রকাশেব ব্যাপারে যে সাহায্য করেছেন তার তুলনা নেই। আমি এঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শ্রীমতী মাধুবী দেবী পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। কিন্তু, তাঁব সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন অবকাশ নেই।

কৃষ্ণনগর
মহালয়া, ১৩৬৫

নিবেদক—
শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'দর্শনের ভূমিকা' তৃতীয় সংস্করণে নব কলেবর ধারণ করলো। আমবা এই সংস্করণে নূতন একটি অধ্যায় সংযোজিত করেছি। তত্ত্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। অন্যান্য অধ্যায়ও প্রয়োজন বোধে পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার চেষ্টা করেছি। অন্যান্য বারের মত এই সংস্করণ অধ্যাপক, বিদ্যার্থী এবং সাধারণ পাঠকের আনুকূল্য পাবে বলে বিশ্বাস করি।

প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা।
ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৭৩

নিবেদক—
শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী

॥ সূচীপত্র ॥

প্রথম অধ্যায়
দর্শনের সংজ্ঞার্থ ও বিষয়বস্তু
দার্শনিকের কাজ

জটিল জগতে আমরা জন্মেছি। এই পৃথিবী আমাদের সৃষ্টি করা নয়। আমরা জগৎকে এই ভাবেই পেয়েছি। ভদ্রভাবে যাতে আমরা জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি সেই চেষ্টাই আমরা করি। সীমিত ক্ষমতা নিয়ে বিপুলা এ ধরণীর কোন পবিবর্তন-সাধন আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। কিন্তু আমরা সবাই বুদ্ধি নিয়ে জন্মেছি। সুতরাং জগৎটাকে বোঝবার চেষ্টা আমাদের সকলেরই করা উচিত।

জগৎ ও জীবনকে বোঝবার চেষ্টা এবং পৃথিবীতে নিজের স্থান নির্ণয়ের আকাঙ্ক্ষাই দার্শনিক-জিজ্ঞাসার মূলে রয়েছে। এই দিক থেকে আমরা সবাই দার্শনিক, কাবণ জগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা আমাদেব সকলেরই আছে। হয়ত কাবও কাবও ধাবণা অত্যন্ত বলিষ্ঠ, কারও কারও আবাব অতি সাধারণ। তাতে দর্শনের মূল্য-বিচারে সব ধারণা নিশ্চয়ই একরকম হবে না, কিন্তু এগুলো যে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন তা কখনও অস্বীকাব করা যাবে না। অবশ্য বিশেষভাবে দর্শন বলি আমরা সেই সমস্ত চিন্তাধারাকেই যা সুসংবদ্ধ ও পরস্পব সম্পর্কযুক্ত। সাধারণ লোক সাধারণ ভাবে জগৎকে বুঝতে চেষ্টা করেন, আব দার্শনিক যুক্তি-তর্ক ও বিচাব-বিশ্লেষণেব মাধ্যমে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তোলেন। সাধারণ লোকেব সঙ্গে দার্শনিকের বোধ হয় এইটুকুই তফাৎ।

দর্শন যুক্তি-তর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণের ব্যাপার। জগৎ ও জীবনকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখবার চেষ্টা করেন দার্শনিক; নূতন নূতন দৃষ্টিকোণ খুলে দেন তিনি। অঙ্কশাস্ত্র বা ব্যাকরণ যে অর্থে শেখা যায়, দর্শন কিন্তু সে অর্থে কখনই শেখা যায় না। দর্শন পড়া মানে কতগুলো নূতন তথ্য জানা নয়। অবশ্য দর্শনে যে আমরা নূতন তথ্য একেবারেই পাই না, এমনও নয়। পুরনো পরিচিত **বস্তুকেই নূতন ভাবে দেখতে চেষ্টা করা বিশেষভাবে দার্শনিকের কাজ।**

দর্শন কিন্তু শেখানো যায় না। দর্শন করতে হয়। আগেই ত বলেছি, দর্শন চিন্তার ব্যাপার। চিন্তা নিজে নিজেই করতে হয়, অন্য কেউ তা শিখিয়ে দিতে পারে না। দর্শন যে শেখানো যায় না তার অবশ্য আর একটা কারণও আছে। পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা বা ইতিহাস শেখানো যায়, কারণ এই সব বিষয়ে সর্বজন-গৃহীত কতগুলো সিদ্ধান্ত আছে। দর্শনে কিন্তু সর্বজনস্বীকৃত কোন সিদ্ধান্ত নেই বললেই চলে। একজন দার্শনিক যে কথা বলেন, প্রায়ই দেখা যায় আর একজন দার্শনিক সে-কথা বলেন না। একই বস্তুকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্যই মতের এরকম গরমিল হয়ে থাকে।

প্রচলিত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের মধ্যে কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা মিথ্যা তা সহজে বলা যায় না। দর্শনের ইতিহাসে কেউই সর্বজন-স্বীকৃতির দাবী করতে পারেন না। যাঁর বুদ্ধিতে জগৎ ও জীবনের চেহারা যে ভাবে ধরা দিয়েছে, তিনি তা-ই প্রকাশ করেছেন।

যে জগতে আমরা জন্মেছি তাকে বুঝতে গেলে নানা রকমের জটিলতা এসে দেখা দেয়। পরিচিত জগৎকে রহস্যময় বলে বোধ হয়। দুনিয়ার ব্যাপার যে খুব সহজবোধ্য নয়, এ-জ্ঞান প্রায় সকলেরই আছে। আমাদের জ্ঞান যে কী বস্তু এবং কি করেই বা আমরা জানি—এসব ব্যাপারও কিন্তু কম রহস্যময় নয়। জগৎকে জানতে বা বুঝতে গেলে জানা বা বোঝা যে কী জিনিস তা জানবার প্রয়োজন আছে। দার্শনিক প্রথমেই তা জানতে চেষ্টা করেন।

আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, দার্শনিকের প্রশ্নগুলি একটু বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। যদি প্রশ্ন করা যায়—এই বইটি কি টেবিলের উপরে ছিল, না আলমারিতে ছিল? প্রশ্নের আগে এর উত্তর আমাদের মনেই আসেনি। কিন্তু এমন কতগুলো প্রশ্ন আছে যা জিজ্ঞেস করার আগেই তাদের উত্তর আমাদের মনে মনে থাকে। জগতের প্রকৃতি, পৃথিবীতে মানুষের স্থান প্রভৃতি দার্শনিক প্রশ্নগুলি এই ধরণের। এই সব প্রশ্ন করার আগেই আমরা প্রত্যেকে এদের কোন না কোন উত্তর ঠিক করে রেখেছি।

একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। প্রশ্ন হল—কাল কি দেশ-নিরপেক্ষ ভাবে পরিমাপ করা যায়? সাধারণ দৃষ্টিতে সাধারণ লোকের কাছে প্রশ্নটা অত্যন্ত জটিল বলে মনে হবে। আর সাধারণ লোক এমন ধরণের প্রশ্ন কখনও ভেবেছে কি না তাও সন্দেহের বিষয়। কিন্তু সব চেয়ে মজা হচ্ছে এই যে সাধারণ লোক

এরকম ধরণের প্রশ্ন না জেনেই তার উত্তর একটা ধরে নিয়েছে। অনেকেই ত মনে করেন, দেশ-নিরপেক্ষভাবে কাল পরিমাপ করা সম্ভব। আমরা সবাই ভাবি, কলকাতা রেডিও স্টেশনে ৪৫ মিনিট ধরে যে নাটক হল মুর্শিদাবাদেও ঠিক ৪৫ মিনিটই সে নাটকটা আমরা শুনব। যদি এর পেছনের যুক্তি জিজ্ঞেস করা হয়, তবে হয়ত অনেকেই আমরা তার সদুত্তর দিতে পারব না। কিন্তু আমাদের সহজ বুদ্ধিজাত এই ধারণাকেও আমরা সহজে ছাড়তে পারব না।

অন্য আর এক ধরণের ধারণার উদাহরণও গ্রহণ করা যেতে পারে। শীতের তীব্রতায় যখন আমরা কষ্ট পাই, তখন ভাবি শীতের পরই ত বসন্ত আসবে; তখন আমাদের কষ্ট আর থাকবে না। শীতের পর বসন্ত আসবে—এই বিশ্বাস আমাদের এতই দৃঢ় যে, এর অন্যথা আমরা ভাবতেই পারি না। আমাদের ধারণা হয়ে গেছে যে, ঋতু-বিবর্তন চিরকাল একরকম ভাবেই হবে। আমরা ধরেই নিয়েছি যে, প্রকৃতিতে নিয়মের রাজত্ব চলেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল—এই ধারণার ভিত্তি কি? একথা বললে অবশ্য চলবে না যে, শীতের পরই ত বসন্ত আসে। যা প্রশ্ন তাই ত আবার ঘুরিয়ে এখানে উত্তরে বলা হয়েছে। এ ত আর কোন ব্যাখ্যা হল না। আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, ঋতু-বিবর্তন একরকম ভাবেই হবে, এটা আমাদের একটা ধারণা। কিন্তু আমরা জানি না যে, এটা আমাদের ধারণামাত্র।

অবশ্য সবাই এ ধারণা করবে তাব কোন মানে নাই। পর্বতবাসী অরণ্যচারী বহু মানুষের মধ্যেই ঋতু-বিবর্তন সম্বন্ধে ভিন্ন ধারণা প্রচলিত আছে। তারা মনে করে, বসন্ত কখনও আসবে না যদি বসন্তের আগমনের কোন ব্যবস্থা তারা না করে। সেজন্যই নানা দেব-দেবীব পূজো আর যাগযজ্ঞ তারা করে থাকে। আরাধনায় তুষ্ট হয়ে বসন্ত আসবে—এই তাদের আশা। যদি তাদের জিজ্ঞেস করা হয়—আরাধনা না করলে বসন্ত আসে না, একথা তাদের বললে কে?—এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর তারা দিতে পারবে না। আসলে এটা তাদের একটা ধারণা।

এসমস্ত উদাহরণ থেকে দু'টো কথা খুব স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে। প্রথমত—আমরা সবাই খুব জটিল বিষয় সম্বন্ধেও বিশেষ বিশেষ ধারণা পোষণ করে থাকি। দ্বিতীয়ত—এসব ধারণা যে আমাদেরই সৃষ্টি সে সম্বন্ধে প্রায়ই আমরা অবহিত থাকি না।

আমাদের জীবনে এসমস্ত ধারণা অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আমাদের সমস্ত কার্যাবলী এসমস্ত ধারণা দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়। ধারণার পরিবর্তনের সঙ্গে কার্যক্রমেরও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বন্ধুকে বলা যাবে যে তুমি দেরী করে এসেছ, যদি আমরা বিশ্বাস না করি যে ভিন্ন ভিন্ন লোক একই ভাবে সময়ের পরিমাপ করে থাকে। কৃষক তার কৃষিকাজই করতে পারবে না যদি সে বিশেষ রকম ঋতু-বিবর্তন ধারায় বিশ্বাস না করে। সুতরাং আমরা যে নিরুপায়ভাবে আমাদের বিশ্বাস ও ধারণার উপর নির্ভর করে থাকি, তা অস্বীকার করা যাবে না।

আমাদের ধারণা যদি ঠিক হয় তবে সেই ধারণানির্ভর কর্ম নিশ্চয়ই সফল হবে। কিন্তু আমাদের ধারণা যদি ভুল হয় তবে কাজ করতে গিয়ে বিড়ম্বনার আর শেষ থাকবে না। যে কৃষক স্বাভাবিক ঋতু-বিবর্তনে বিশ্বাস করে, সে অতি সহজেই সুফল পেয়ে কৃষিকাজ করে থাকে। কিন্তু যারা মনে করে দেবতাকে তুষ্ট করে ঋতু-বিবর্তন ঘটাতে হয়, তারা এই ভুল ধারণার জন্য অযথা পূজো অর্চনায় খানিকটা সময় নষ্ট করে।

আমরা কিন্তু নিজেদের ধারণা সম্বন্ধে খুব কমই অবহিত থাকি। যাঁরা নিজেদের খুব সাংসারিক লোক বলে পরিচয় দেন, তাঁদের মধ্যে একথার সত্যতা খুব পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। যদিও তাঁরা বলেন যে, নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁরা সাংসারিক জ্ঞান আহরণ করেছেন, তবুও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা ধারণা দিয়েই পরিচালিত হয়ে থাকেন। কিন্তু এই ধারণাগুলোকে তাঁরা ভুল করে অভিজ্ঞতা-জাত জ্ঞান বলে মনে করেন। সে জন্যই তাঁদের সঙ্গে তর্ক করা মুশকিল।

আমরা কি কি ধারণা করেছি তা জানা আমাদের পক্ষে একান্তভাবেই অপরিহার্য। আর তা জানতে গেলে নির্মোহ মন নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। এই চিন্তাই ত দার্শনিক চিন্তা।

যতক্ষণ আমরা আমাদের ধারণা সম্বন্ধে অবহিত না হই, ততক্ষণ আমরা এদের দ্বারা অন্ধভাবে পরিচালিত হই এবং নানা রকমের অসুবিধা ভোগ করি। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, আমাদের মজ্জাগত ধারণার জ্ঞান না থাকলে আমরা কখনই স্বাধীনভাবে কোন কাজ বা চিন্তা করতে পারি না। সুতরাং সাধারণ লোক যে মনে করে মানুষ নিজ ক্ষমতা ও ভাগ্য অনুসারেই কাজ করে সাফল্য বা অসাফল্য লাভ করে এবং দার্শনিক

চিন্তা আমাদের জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য নয়, তারা কিন্তু ভুল করে থাকে। চিন্তা করে কাজ করলেই সহজে সাফল্য আসে। আমরা বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন জীব যখন না ভেবে চিন্তেই কাজ করি তখন কিন্তু আমরা আমাদেরই অপমান করি, আমাদের বুদ্ধির শক্তিকে অশ্রদ্ধা করি। আমাদের এরকম ব্যবহার কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়।

চিন্তা করে কাজ করি না বলে প্রায়ই আমাদের অনুশোচনা করতে হয়। যদি সব সময়েই মাথা খাটিয়ে কাজ করি তবে অসুবিধে খুব কমই ভোগ করব। আর বিচারবুদ্ধি নিয়ে আমরা মানুষ যারা জন্মেছি তাদের ত বিচার করেই কাজ করা উচিত। সুতরাং দার্শনিক চিন্তা আমাদের কার্যাবলীর নিয়ামক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যেহেতু আমরা মজ্জাগত ধারণা দিয়েই বিশেষভাবে পরিচালিত হয়ে থাকি, সুতরাং এসব ধারণার যৌক্তিকতা আমাদের ভেবে দেখা উচিত। এই যৌক্তিকতা-বিচার কিন্তু সহজ কাজ নয়। যদি কোন ধারণা অযৌক্তিক বলে প্রতিপন্ন হয় তবে তা পরিত্যাগ করে নূতন ধারণা গ্রহণ করতে হবে। **মজ্জাগত ধারণার যৌক্তিকতা-বিচার ও সময় বিশেষে নূতন ধারণার সৃষ্টি, এই হচ্ছে দার্শনিকের কাজ।** কাজটা মোটেই সহজ নয়। দার্শনিক তাঁর কাজের গুরুত্ব বোঝেন। তিনি বিনীতভাবেই তাঁর বিচার-বুদ্ধিমত কাজ করে যান। ফলের ভাবনা তিনি ভাবেন না। দার্শনিক সত্যই নিষ্কাম কর্মী।

চিন্তার যে সমস্ত কাজ আছে তার মধ্যে দার্শনিক চিন্তা অত্যন্ত কঠিন ও একটু নূতন ধরণের। সক্রেটিস, প্লেটো, হিউম, কাণ্ট প্রভৃতি সমস্ত প্রখ্যাত দার্শনিকেরাই দর্শনের দুরূহতা স্বীকার করেছেন। দর্শনের দুরূহতা একটা বিশেষ কারণে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা ত শুধু যুক্তি দিয়ে পরিচালিত হই না; প্রায়ই ভাবপ্রবণতা আমাদের নিয়ন্ত্রিত করে। মজ্জাগত সমস্ত ধারণাই ভাবপ্রবণতার কোমল কোলে লালিত হয়ে থাকে। তাই যুক্তি দিয়ে মজ্জাগত ধারণার দোষগুণ বিচার অনেকেই ভাল চোখে দেখে না। যার পেছনে হৃদয়ের দুর্বলতা আছে তা শত খারাপ হলেও আমরা সহজে তা ত্যাগ করতে পারি না। সে জন্যেই নির্মোহ মনে দার্শনিক-বিচার জনসাধারণ প্রীতির চোখে দেখে না। তবু যাঁরা সত্যসন্ধী তাঁরা শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কাজ করে যাবেন। দার্শনিকের কাজ স্বাভাবিক ভাবেই শক্ত। যেহেতু লোকে তাঁদের কাজ ভাল চোখে দেখে না, সেজন্য এ কাজ আরও শক্ত।

দর্শনের আলোচ্য বিষয় (Scope of Philosophy)

জগৎ, জীবন ও সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা যে সব ধারণা নিয়ে কাজ-কারবার করি তাদের যৌক্তিকতা-বিচার আর মূল্যাবধারণই দর্শনের কাজ। জীবনেব পথে চলতে গিয়ে জ্ঞানেব সম্ভাবনা[১], জড[২], প্রাণ মন আর ঈশ্বরেব অস্তিত্ব সবই সাধারণত আমরা মেনে নেই। দর্শনে এই মেনে-নেওয়া' তত্ত্ব-গুলোর স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা হয়ে থাকে। দার্শনিক বিচার করে দেখেন—আমাদের পক্ষে কতটুকু জানা সম্ভব? জ্ঞানের সীমা কি? জ্ঞান-লাভেব জন্য কি কি প্রাগুপকবণ[৩] প্রয়োজন? জ্ঞানের সত্যতা কিসেব উপর নির্ভর করে? জড, প্রাণ, মন আব ঈশ্বরেব আসল রূপ নির্ধারণেবও চেষ্টা কবেন দার্শনিক। জডেব সঙ্গে প্রাণ ও মনেব সম্পর্ক কি? প্রাণ ও মন কি জড থেকেই এসেছে, না তাদেব স্বতন্ত্র সত্তা আছে? ঈশ্বর আছেন কি? থাকলে, ঈশ্বরেব সঙ্গে জীব ও জগতের সম্পর্ক কি?—এই সবই দার্শনিকের প্রশ্ন। সাধারণ ভাবে দেশ, কাল ও কার্যকাবণ তত্ত্বও আমরা জীবনের প্রয়োজনে মেনে নেই। দার্শনিক এই সব তত্ত্বেবও সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা কবেন। জীবনেব প্রতি মুহূর্তে আমবা বিভিন্ন জিনিসেব মূল্যাবধাবণ করে থাকি। কোন একটা ফুলকে বলি সুন্দর, কোন একটাকে বা কুৎসিত, শ্যামকে বলি ভালো আব রামকে বলি মন্দ। নবীন যখন কোন সংবাদ এনে দেয় তখন বলি সত্য খববই সে দিয়েছে; আবাব অন্য কেউ খবব এনে দিলে হয়ত বলি খবরটা ত সত্য নয়। সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-কুৎসিত, ভালো-মন্দ এই বিচার ত আমরা হামেশাই করে থাকি। দার্শনিক এই সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-কুৎসিত আর ভালোমন্দেব স্বরূপ নির্ধাবণের চেষ্টা করেন।

এতক্ষণ যা বলা হল তা সাজিয়ে নিলে দেখা যাবে—দর্শনের আলোচ্য বিষয় মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে :—

(১) জ্ঞানেব সম্ভাবনা-নির্ণয় ;

(২) দেশ, কাল, কার্যকারণতত্ত্ব, জড়, প্রাণ, মন আর ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় ;

(৩) সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-কুৎসিত আর ভালোমন্দের প্রকৃতি নির্ধারণ।

কাজের সুবিধার জন্য আলোচ্য বিষয়ের বিভিন্নতা অনুসারে দর্শনের বিভিন্ন শাখার সৃষ্টি হয়েছে। এই শাখাগুলো কিন্তু দর্শনেরই অঙ্গবিশেষ। দর্শনের যে শাখা জ্ঞানের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে, তার নাম দেওয়া

১। Possibility of knowledge ২। Matter ৩। Pre-conditions

হয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান[১]। জ্ঞানের উৎপত্তির ইতিহাস কি? জ্ঞানের সীমা কোথায়? জ্ঞান-লাভের প্রাগুপকরণ কি? জ্ঞানের সত্যতা কি ভাবে নির্ণয় করা যায়?—এই জাতীয় প্রশ্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

দর্শনের যে শাখা দেশ, কাল, কার্যকারণতত্ত্ব, জড়, প্রাণ, মন আর ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে তার নাম **পরা-বিজ্ঞান** (Metaphysics)। জড়, প্রাণ, মন আর ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এদের বিভিন্ন প্রকাশের রূপ আগে জানা দরকার। বিভিন্ন প্রকাশের মধ্য দিয়েই যিনি প্রকাশিত তাঁর রূপ জানা যায়। আমের স্বরূপ জানতে গেলে আমের বিভিন্ন প্রকাশ—কাঁচা আম, কাঁচামিঠে আম আর পাকা আম—আগেই ত জানতে হবে। তাই পরা-বিজ্ঞান যা বস্তুর স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে—তার আগে বস্তু-প্রকাশের আলোচনা করা দরকার। বস্তুর প্রকাশ্য রূপ নিয়ে দর্শনের যে শাখা আলোচনা করে তার নাম **প্রকাশ-বিজ্ঞান** (Phenomenology)। প্রকাশ-বিজ্ঞান জানাব পরই পবা-বিজ্ঞানে প্রবেশ করা যেতে পাবে। তবে প্রকাশ-বিজ্ঞান আর পবা-বিজ্ঞান ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। একটাকে ছাড়া আর একটা ভাবাই যায় না।

সর্বশেষে বস্তুর মূল্য-নির্ণয়ের জন্যও দাশনিক চেষ্টা করেন। দর্শনের যে শাখায় মূল্যাবধারণ ও মূল্য-বিষয়ক বিধান বা বচন[২] নিয়ে আলোচনা করা হয়, তার নাম **মান-বিজ্ঞান** (Axiology)। মূল্য-বিষয়ক বিধানের রূপ, মূল্যের মূল্য আর সত্য-শিব-সুন্দরের স্বরূপাবধারণই এই মান-বিজ্ঞানের কাজ।

ওপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে দর্শন চতুরঙ্গবিশেষ। জ্ঞান-বিজ্ঞান তার প্রথম অঙ্গ। দ্বিতীয় অঙ্গ তার প্রকাশ-বিজ্ঞান; তৃতীয়—পরা-বিজ্ঞান আর চতুর্থাঙ্গ তার মান-বিজ্ঞান। এই চার অঙ্গের কোন অঙ্গ বাদ পড়লেই দর্শন বিকলাঙ্গ হয়ে যাবে।

দর্শন ও পরা-বিজ্ঞান (Philosophy and Metaphysics)

পরা-বিজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রের একটি অঙ্গবিশেষ। চতুরঙ্গের অন্যতম অঙ্গ এই পরা-বিজ্ঞান কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের সর্বপ্রধান অঙ্গ। দর্শনশাস্ত্রের প্রাণই

১। Epistemology.
২। Value judgments.

যেন এই পরা-বিজ্ঞানে নিহিত আছে। দেশ, কাল, কার্যকারণ সম্পর্ক, জড, প্রাণ, মন, ঈশ্বর—এ সকলের স্বরূপ-নির্ণয় পরা-বিজ্ঞানের কাজ। নিষ্প্রাণ বস্তু, প্রাণ, মন আর ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে যে সব প্রচ্ছন্ন সত্তা বা তত্ত্ব নিহিত তারই আলোচনা করে পরা-বিজ্ঞান।

যে কোন জিনিসেরই দুটো বিভিন্ন দিক্ থেকে আলোচনা চলতে পারে। একটা হচ্ছে বস্তু-প্রকাশের দিক্ আর একটা হচ্ছে বস্তু-স্বরূপের দিক্। আকাশে যখন ঘুড়ি ওড়ে তখন যতই ঘুড়ি ওপরে ওঠে ততই তা ছোট বলে মনে হয়। আবার যখন ঘুড়ি মাটিতে নামান হয় তখন তা বেশ বড আকারেই দেখি। এখানে মাটিতে ঘুডির যে আকার দেখি—তা তার প্রকাশাকাব। পরা-বিজ্ঞান বস্তুর স্বরূপাকার নিয়ে আলোচনা করে, প্রকাশাকার নিয়ে নয়। অবশ্য প্রকাশাকারের প্রকাশতার যে কি রূপ তা নিয়ে পরা-বিজ্ঞানে আলোচনা চলতে পারে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মান-বিজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রের অঙ্গ, না পরা-বিজ্ঞানের অঙ্গ—এ-নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমরা জ্ঞানের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করি। তবে তা পরা-বিজ্ঞানের অংশ হবে না কেন? মান-বিজ্ঞানে সত্য-শিব-সুন্দরের স্বরূপ উদ্ঘাটনেরই চেষ্টা করা হয়। সুতবাং মান-বিজ্ঞানের পরা-বিজ্ঞানেরই অংশ হওয়া উচিত। আলেকজেণ্ডার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা ত দর্শন বলতে পরা-বিজ্ঞানই বোঝেন। তাঁদের মতে পরা-বিজ্ঞান দর্শনের অঙ্গ মাত্র নয়—পরা-বিজ্ঞান আর দর্শন একই জিনিস। পরা-বিজ্ঞান আর দশন যদি সমার্থক হয়, তবে জ্ঞান-বিজ্ঞান আর মান-বিজ্ঞান ত পরা-বিজ্ঞানেরই অঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে।

আমাদের মনে হয়—দর্শনকে পরা-বিজ্ঞানের চেয়ে একটু ব্যাপকতর শাস্ত্র হিসেবেই গ্রহণ করা উচিত। পরা-বিজ্ঞানে শুধু বস্তু-স্বরূপেরই আলোচনা হয়। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, বস্তু-প্রকাশের আলোচনা ছাড়া বস্তু-স্বরূপের আলোচনা চলে না। দর্শন বস্তু-প্রকাশ ও বস্তু-স্বরূপ দু'য়েরই আলোচনা করে থাকে। সুতরাং পরা-বিজ্ঞান দর্শনের অঙ্গই বটে, সমার্থক নয়।

তারপর প্রশ্ন উঠবে—জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মান-বিজ্ঞান দর্শনের অঙ্গ হবে, না পরা-বিজ্ঞানের অঙ্গ হবে? আমরা দেখেছি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মান-বিজ্ঞানকে পরা-বিজ্ঞানের অংশ হিসেবে ভাবা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে হয়,

এ রকম না ভাবাই উচিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার পরই পরা-বিজ্ঞানের আলোচনা হতে পারে। জ্ঞান-বিজ্ঞান বিচার করে দেখবে বস্তু-প্রকাশাতিরিক্ত বস্তু-স্বরূপ বলে কিছু জানা যায় কিনা—তারপরই বস্তুর স্বরূপ জানার চেষ্টা বা পরা-বিজ্ঞানের আলোচনা সম্ভব হবে। সুতরাং দর্শনকে একটি ব্যাপকতর শাস্ত্র ভেবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পরা-বিজ্ঞানকে তার দুটো অঙ্গ হিসেবে ভাবাই যেন অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। মান-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও একই কথা বলা যেতে পারে। মান বা মূল্য অন্য সমস্ত বস্তু থেকেই স্বতন্ত্র। মূল্য অন্য বস্তুর মত জাগতিক নয়—এ একান্তভাবেই আদশ রাজ্যের ব্যাপার। সুতরাং মূল্য-সত্তা অন্য সত্তা থেকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করাই ভাল। সুতরাং মান-বিজ্ঞান ব্যাপকতর শাস্ত্র দর্শনেরই শাখা—পরা-বিজ্ঞানের নয়।

দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান (Philosophy and Epistemology)

জগৎ, জীবন ও সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা যে সব ধারণা নিয়ে কাজ-কারবার করি তাদের যৌক্তিক বিচার ও মূল্যাবধারণই দর্শনের কাজ। সুতরাং দার্শনিক যে পথের পথিক তা যুক্তিতর্ক বিচার-বিশ্লেষণের বা জ্ঞানের পথ। দার্শনিক যখন এই পথে চলতে সুরু করেন তখন এই পথের বিপদ-আপদ আর শেষ সীমা একান্তভাবেই তাঁব জানা দরকার। নতুবা নানা বিড়ম্বনায় তাঁকে বিড়ম্বিত হতে হবে। অর্থাৎ জ্ঞানের প্রাগুপকরণ কি কি, জ্ঞানের সীমা কোথায়—এসব প্রশ্নের সদুত্তব জেনেই দাশনিক পথ চলতে পারে। আর এসব প্রশ্নই জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে। সুতরাং দশনের পক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞান একান্তভাবেই অপরিহার্য।

পুরাকালে কিন্তু দাশনিকেরা জ্ঞানের সম্ভাবনা আলোচনা না করেই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় মন দিয়েছিলেন। এভাবে অবশ্য নির্বিচারবাদ[১] গ্রহণ করা তাদের পক্ষে উচিত হয়নি। দার্শনিকদের কাজই হচ্ছে প্রতিপদে বিচার করে যাওয়া। সুতরাং বিচার না করেই কোন কিছু গ্রহণ করা দার্শনিক-সুলভ মনোবৃত্তির পরিচায়ক নয়। প্রাচীন কালের দার্শনিকেরা এরকম করেছিলেন বলেই চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন বিরোধী মতবাদ গড়ে উঠেছিল। কোন্ মতবাদকে গ্রহণ করা যাবে তা ভেবেই ঠিক করা যাচ্ছিল না। এই অবস্থায় জার্মান দার্শনিক কাণ্ট এসে সবাইকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। তিনি জ্ঞানের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে দেখালেন, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের কোন জ্ঞান হয় না।

১। Dogmatism.

সুতরাং অতীন্দ্রিয় বিষয় নিয়ে যৌক্তিক আলোচনা করা নিষ্ফল। এই ভাবে দর্শনের নির্বিচারবাদের জায়গায় সবিচারবাদ[১] এসে দেখা দিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই ব্রিটিশ দার্শনিক জন লক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এখানে জ্ঞানের প্রাগুপকরণের চেয়ে জ্ঞানোৎপত্তির মনস্তাত্ত্বিক[২] ব্যাখ্যাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। কাণ্টই সর্বপ্রথম জ্ঞানের প্রাগুপকরণ নির্ণয়ের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে দার্শনিকেরা জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা করে কাণ্ট যে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন তা মানেন নি বটে, কিন্তু তাঁরা সকলেই দর্শনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পরা-বিজ্ঞান (Epistemology and Metaphysics)

জ্ঞান-বিজ্ঞান জ্ঞানের প্রাগুপকরণ, সীমা ও সত্যতার সর্ত নিয়ে আলোচনা করে। পরা-বিজ্ঞান জগৎ ও জীবনে নিহিত তত্ত্ব বা সত্তার স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করে। এখন প্রশ্ন হল—জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরা-বিজ্ঞানের সম্পর্ক কি ?

জার্মান দার্শনিক কাণ্ট প্রথম পরা-বিজ্ঞান আলোচনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। তিনি মনে করেন, জ্ঞানের সীমা না জেনে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় মন দেওয়ার কোন মানে হয় না। জ্ঞানের সম্ভাবনা আলোচনা করে যদি দেখা যায় যে চরম তত্ত্ব জানা যায় না তবে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা করে কি হবে ? কাণ্ট ত জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা করে দেখলেন, বস্তু-স্বরূপ কখনই জানা যায় না ; যা জানা যায় তা বস্তু-প্রকাশ মাত্র। কাণ্টের মতে পরা-বিজ্ঞানের আগেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্থান। জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা করে কতটুকু জানা যায় এবং তা জেনেই পরা-বিজ্ঞানে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

কাণ্টের পরবর্তী সমস্ত ভাববাদী দার্শনিকই[৩] জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পরা-বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিষয়ে কাণ্টের মত অনেকাংশে শিরোধার্য করেছেন। অবশ্য তাঁরা কাণ্টের মতো চরমতত্ত্ব জানা যায় না, এমন কথা বলেন না। জার্মান দার্শনিক হেগেল জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে জ্ঞেয় বস্তু নিত্যই

১। Critical theory or Criticism
২। Psychological
৩। Idealists

জ্ঞান-নির্ভর আর চরম সত্তা জ্ঞান-স্বরূপ। সুতরাং পরা-বিজ্ঞান জ্ঞান নিয়েই আলোচনা করে, কারণ হেগেলের মতে পরা-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় চরমতত্ত্ব জ্ঞানই বটে। আবার জ্ঞান-বিজ্ঞানও জ্ঞান নিয়েই আলোচনা করে থাকে। সুতরাং হেগেল মনে করেন, শেষ পর্যন্ত পরা-বিজ্ঞান আর জ্ঞান-বিজ্ঞান একই বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়।

নব্য বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকেরা[১] জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পরা-বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে জ্ঞান-বিজ্ঞান জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারণ করে, কিন্তু চরমতত্ত্ব যা জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয় তার কোন পরিচয় দেবার ক্ষমতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নেই। তত্ত্ব[২] জ্ঞান-নির্ভর নয়, জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জগতের দিকে তাকালেই একথার সত্যতা বোঝা যায়। জগৎকে ত চোখের সামনে আমাদের জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। সুতরাং জগতে নিহিত তত্ত্ব আর আমাদের জ্ঞান-নির্ভর হবে কি করে? সুতরাং নব্য বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদীর মতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পরা-বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে পরস্পরনিরপেক্ষ দু'টি বিজ্ঞান। জ্ঞান-বিজ্ঞান জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারণ করে আর পরা-বিজ্ঞান জ্ঞানাতিরিক্ত তত্ত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে। এদের মধ্যে কোন সম্পর্কই নেই।

আমাদের মনে হয় হেগেলপন্থী ভাববাদী ও নব্য বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদী—এই দুই দলের দার্শনিকেরাই সত্যকে অতিরঞ্জিত করেছেন। হেগেল যে জ্ঞান-বিজ্ঞান আর পরা-বিজ্ঞান এক করে ফেলেছেন—এটা যেমন সত্যি নয়, ঠিক তেমনি নব্য বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদীরাও যে দু'টোকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়েছেন, তাও ঠিক নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পরা-বিজ্ঞান পরস্পর নির্ভরশীল। জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা করে জ্ঞানের সীমা জানা গেলেই পরা-বিজ্ঞান আলোচনা করা যেতে পারে। তত্ত্ব আদৌ জানা যায় কিনা তা জেনেই পরা বিজ্ঞানের আলোচ্য তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা আরম্ভ করা উচিত। তত্ত্ব আদৌ জানা যায় কি না, এ আলোচনা জ্ঞান-বিজ্ঞান করে থাকে। সুতরাং এই দিক্ থেকে পরা-বিজ্ঞান জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। আবার পরা-বিজ্ঞান আলোচনা করে তত্ত্বের স্বরূপ কি তা যদি জানা না যায় তবে তত্ত্ব জানা যাবে কি যাবে না তাই বা বোঝা যাবে কি করে? সুতরাং জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা করে তত্ত্ব জানা যাবে কি না,

১। American Neo-Realists
২। Reality

এই প্রশ্নের উত্তর বের করতে হলে পরা-বিজ্ঞান আলোচনা করে তত্ত্বের স্বরূপ জেনে নিতে হবে। এই দিক থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান পরা-বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। আসলে জ্ঞান-বিজ্ঞান আর পরা-বিজ্ঞানের সম্পর্ক এত নিবিড় যে একটি ছাড়া আর একটি হতে পারে না।

দার্শনিক-চিন্তার উৎপত্তি-কথা

(বুদ্ধি নিয়ে মানুষ জন্মেছে। তাই মানুষের স্বভাবই এই যে, সে চিন্তা করে। কোন না কোন বিষয়ে চিন্তা না করে মানুষ থাকতেই পাবে না।) জীবনধারণের সহজ উপায় নিয়ে যেমন মানুষ চিন্তা কবে, ঠিক তেমনি আবার জগৎ ও জীবনের জটিল প্রশ্ন নিয়েও সে চিন্তা করে। 'শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি' মানুষের সমস্ত চিন্তাকে কলুষিত করতে পারে না। জীবন-ধারণের অতিরিক্ত নানা জটিলতাব মধ্যেও তাব চিন্তা পথ কবে নেয়। জীবনের পথে চলতে চলতে যে-সব চিন্তা মানুষের মনে এসে ভিড করে দাঁড়ায, তারই মধ্য থেকে সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল রূপ নিয়ে দার্শনিক চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মানুষের জীবনের স্বাভাবিক চিন্তা থেকেই এই দার্শনিক-চিন্তার উৎপত্তি।) কিন্তু সর্বদেশে ও সর্বকালে একইভাবে এর উৎপত্তি হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও বিভিন্ন দেশ ও জাতির বিভিন্ন সামাজিক পবিবেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানুষের দার্শনিক চিন্তা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হযেছে। আমরা যদি দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করি তবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তির বিভিন্নতা দেখে সত্যিই আমাদের আশ্চর্য হতে হয়। এখানে আমরা (সংক্ষেপে দার্শনিক-চিন্তাব উৎপত্তির উল্লেখযোগ্য কারণগুলোব আলোচনা করব।

(ক) বিস্ময় থেকে দার্শনিক-চিন্তার উৎপত্তি

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতে বিস্ময় থেকে দার্শনিক-চিন্তার উদ্ভব হয়েছে। মানুষ যখন প্রথম এই জগৎ দেখল তখন তার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। সু-উচ্চ পর্বত, তরঙ্গ-সঙ্কুল সাগর, গহন অরণ্য, আকাশের অগণ্য নক্ষত্র, দিনের সূর্য আর রাত্রির চন্দ্র মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছে। বারবার মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে—এই বিচিত্র জগৎ কি ভাবে সম্ভব হল? শুধু তা-ই নয়। মানুষের জন্ম আবার তার মৃত্যু—এও কি কম বিস্ময়?

মৃত্যুতেই কি জীবনের শেষ, না মৃত্যুর পরেও একটা জীবন আছে?—এই প্রশ্নও মানুষের মনে জেগেছে। এই পৃথিবীতে যা কিছু গভীর ও গহন, বিরাট ও মহান্—তার পেছনে কোন বিরাট শক্তি কাজ করছে কিনা কে জানে! এই জাতীয় নানা প্রশ্ন মানুষের মনে এসেছে। মানুষ চিন্তা করেছে, প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করার চেষ্টা করেছে। কখনও হয়ত সে উত্তর হয়েছে ভীত মানুষের আত্ম-দুর্বলতার স্বীকারোক্তিমাত্র, আবার কখনও বা নানা উদ্ভট কল্পনাজাল জড়িত। কখনও কখনও কিন্তু এই সব উত্তরের মধ্যে মানুষের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধির প্রাখর্যেরও পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রাচীন গ্রীস দেশে এইভাবেই ত দার্শনিক-চিন্তার উৎপত্তি হয়েছিল। সেখানকার প্রাচীনতম দার্শনিক থেলিস আয়োনিয়া নামে এক দ্বীপে বাস করতেন। তিনি দেখলেন, চাবিদিকেই জল, স্থল ত সামান্যমাত্র। জলের প্রাচুর্যে বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে তিনি জলকেই বিশ্বের আদিমতম উপাদান বলে ঘোষণা করলেন।

(খ) সংশয় থেকে দার্শনিক-চিন্তার উৎপত্তি

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনেব ইতিহাস আলোচনা করলে দেখি—বেকন থেকে শুরু করে অনেক আধুনিক দার্শনিকের চিন্তাধারাই সংশয় থেকে শুরু হয়েছে। এখানে মনে রাখতে হবে বেনেসাঁস্-এর পর যে সমস্ত দার্শনিক-চিন্তা পশ্চিমে হযেছে, তার সবাই আধুনিক দর্শনের আওতায় পড়ে। এই বিচারে বেকন একজন আধুনিক দার্শনিক। বেকনের জন্মের আগে মধ্যযুগে য়ুরোপে যে সমস্ত দর্শন হযেছে তার কোন একটাও বাইবেল আর চার্চের প্রভাব এড়াতে পারেনি। তখনকার দিনে পাদ্রীদের দাপট ছিল প্রচণ্ড। সমস্ত দার্শনিক-চিন্তা তাঁরাই নিয়ন্ত্রিত করতেন। তার ফলে যে দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল তা যেন বাইবেলেরই নবভাষ্য। বাইবেলের বিরুদ্ধে কোন কথা বলার দুঃসাহস তখন কোন দার্শনিকেরই ছিল না। সেজন্য স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ মধ্যযুগীয় কোন দর্শনেই বিশেষ পাওয়া যায় না। বেকন এসে এই জাতীয় চিন্তাধারায় সংশয় প্রকাশ করলেন। বাইবেলে যা-ই আছে তা-ই অভ্রান্ত সত্য—এমন কথা মানতে তিনি রাজী ন'ন। তিনি বললেন, অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যা সত্য বলে নির্ণীত হবে তা-ই সত্যিকারের সত্য। নির্মোহ মন নিয়ে দার্শনিককে তারই গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দিতে হবে। বুদ্ধির মুক্তি ঘোষণা করলেন বেকন। বিশ্বাসের স্থানে অভিজ্ঞতা দার্শনিক চিন্তায় স্থান পেল। অভিজ্ঞতায়

যাকে সত্য বলে জানব তাকেই শ্রদ্ধার আসনে বসাতে হবে—এই হল বেকনের মূলমন্ত্র।

পরবর্তী কালে ডেকার্টের চিন্তায় এই সংশয় আরও গভীর হয়ে দেখা দিল। যা কিছু সংশয় করা যায় তিনি তা-ই সংশয় করলেন। সংশয় করতে করতে এমন একটা জায়গায় এসে তিনি দাঁড়ালেন যেখানে সংশয় আর সম্ভব নয়। সংশয়-শেষে প্রাপ্ত সেই তত্ত্বের নাম দিলেন তিনি নিঃসংশয় সত্তা। অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত সমস্ত বস্তুকে তিনি সংশয় করলেন। অন্ধকার রাত্রে রজ্জুতে যেমন মিথ্যা সর্প দেখি তেমনি প্রত্যক্ষলব্ধ এই জগৎ ভ্রান্ত হতে পারে। স্মৃতি ত প্রত্যক্ষ থেকেই জন্মায়। প্রত্যক্ষলব্ধ বস্তুর অনুপস্থিতিতে বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তির নামই ত স্মৃতি। প্রত্যক্ষ যদি ভ্রান্ত হয় স্মৃতিও নিশ্চয়ই ভ্রান্ত হবে। কল্পনালব্ধ বস্তু-সত্তা সম্বন্ধে সহজেই সংশয় পোষণ করা যায়। সুতরাং ডেকার্টে কল্পনালব্ধ বস্তুকেও সংশয় করলেন। এমনি কবে ডেকার্টে একে একে প্রত্যক্ষ, স্মৃতি ও কল্পনালব্ধ সমস্ত বস্তুকেই সংশয় কবেছেন। তারপর ডেকার্টে বললেন, অঙ্ক-শাস্ত্রে আমরা যে জ্ঞান পাই তাও সংশয় করা যেতে পারে। কোন দুষ্টা সরস্বতীর প্রভাবে পড়ে যে অঙ্কশাস্ত্র আমরা গ্রহণ করিনি—তার কি প্রমাণ আছে? সুতরাং ডেকার্টের মতে অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞানও গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বশেষে ডেকার্টে বললেন—সব কিছু সংশয় করলেও সংশয়াত্মাকে কখনই সংশয় করা যায় না। সংশয়াত্মাকেই যদি সংশয় করা হয় তবে সংশয় করার কর্তা যে কেউ আর থাকবে না। সুতরাং সংশয়াত্মাকে নিঃসংশয় সত্তা বলে স্বীকার করতেই হবে। ডেকার্টের সমস্ত দার্শনিক-চিন্তা এই নিঃসংশয় সত্তাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

কাণ্ট তাঁর পূর্বসূরীদের চিন্তাধারা সংশয় করেই নিজের স্বাধীন মত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। লক, হিউম প্রভৃতি অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের[১] মতে আমাদের সমস্ত জ্ঞানই অভিজ্ঞতা থেকে আসে। কাণ্ট এই মতবাদে পূর্ণ আস্থা স্থাপন কবতে পারলেন না। অঙ্কশাস্ত্রে আমরা যে সমস্ত সাধারণ প্রতিজ্ঞার[২] জ্ঞান পেয়ে থাকি তা কখনই অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায় না। আর অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞান জ্ঞানই নয়, এমন কথা ত বলা চলে না। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের[৩] মতে ধারণা (idea) থেকেই জ্ঞান পাওয়া যায়। কিন্তু কাণ্ট প্রশ্ন

১। Empiricists
২। Universal Propositions
৩। Rationalists

করলেন—শুধু ধারণা বলে কিছু আছে কি ? সমস্ত ধারণাই ত কোন না কোন বিশেষ বস্তুর ধারণা। সুতরাং শুধু ধারণা আমাদের কোন জ্ঞানই দিতে পারে না। ধারণা আর বস্তুর মিলন হলেই আমাদের জ্ঞান হয়। অভিজ্ঞতা থেকে পাই আমরা বস্তু আর বুদ্ধি থেকে পাই ধারণা। সুতরাং অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি—এই দুই মিলেই আমাদের জ্ঞানের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কাণ্টের এই মতবাদ অভিজ্ঞতাবাদী ও বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মতবাদের সংশয়ের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে।

(গ) উপযোগিতা-বোধ থেকে দার্শনিক-চিন্তার উৎপত্তি

আধুনিক কালে একজাতীয় দার্শনিক চিন্তাধারা উপযোগিতা-বোধ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। জেমস্, ডিউক ও সীলার এই মতবাদে বিশ্বাসী। তাঁদের মতে এমন চিন্তাই করা উচিত জীবনে যার প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা আছে। কোন্ বস্তু জীবনের কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করে—এই বিচারেই বস্তুর সত্যতা নিরূপণ সম্ভব। দার্শনিক-চিন্তা মানুষকে জীবন-পথে চলতে সাহায্য করে; নানা বিপদে সত্যপথ প্রদর্শন করে। সুতরাং দার্শনিক-চিন্তা এই উপযোগিতা-বোধ থেকে শুরু হবে।

(ঘ) জ্ঞান-প্রীতি থেকে দার্শনিক-চিন্তার উৎপত্তি

পশ্চিমদেশে দর্শনের প্রতিশব্দ 'ফিলসফি'। 'ফিলস্' ও 'সোফিয়া'—এই দুটো গ্রীক শব্দ থেকে 'ফিলসফি' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। 'ফিলস্' শব্দের মানে হচ্ছে প্রেম বা প্রীতি। আর 'সোফিয়া' মানে জ্ঞান। সুতরাং ফিলসফি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে জ্ঞান-প্রীতি। প্রাচীন গ্রীসে সোফিসট্স্ নামে একদল লোক ছিল। তারা সবার কাছেই নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করে বেড়াত। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস নিজেকে এদের থেকে আলাদা করবার জন্য নিজের পরিচয় দিতেন জ্ঞান-প্রেমিকরূপে। সেই থেকেই দার্শনিক জ্ঞান-প্রেমিক আর দর্শন জ্ঞান-প্রেম বা জ্ঞান-প্রীতি বলে পরিচিত হয়ে আসছে।

মানুষ বুদ্ধি নিয়ে জন্মেছে তাই বিশ্বের সমস্ত রহস্য জানবার আগ্রহ তার পক্ষে একান্তভাবেই স্বাভাবিক। জ্ঞানলাভ করবার এই আগ্রহশীলতাই মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে দিয়েছে। মানুষের মহত্ব, গাম্ভীর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এই আগ্রহশীলতার ওপরই একান্তভাবে নির্ভর করে। পশু যে জগতে জন্মেছে

সর্বদাই জাগছে। কেন মানুষের মনে এত প্রশ্ন জাগে? এর একমাত্র উত্তর জিজ্ঞাসাই মানুষের স্বভাব। যেদিন জিজ্ঞাসা থামবে সেদিন মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। দার্শনিক-চিন্তার উৎপত্তি মানুষের এই অনন্ত জিজ্ঞাসা থেকেই হয়েছে)

প্রত্যেকেই নিজেকে ভালবাসে। নিজের স্বভাব প্রত্যেকেরই ভাল লাগে। জিজ্ঞাসা যেহেতু মানুষের স্বভাব, সুতরাং মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার প্রেমে পড়ে। জিজ্ঞাসা করে মানুষ আনন্দ পায়। সুতরাং দার্শনিক-চিন্তা মানুষের অন্তরের আনন্দের ব্যাপার। যাকে আমি ভালবাসি, যাতে আমার আনন্দ হয়, তা জীবনের কোন্ ক্ষুদ্র প্রযোজনে আসবে—তা কখনও ভাবি না। দার্শনিক-চিন্তাও জীবনেব কোন্ কাজে লাগবে—তা ভাববার অবকাশও আমাদের নেই। চিন্তায় আনন্দ আছে, চিন্তা না করলে ভাল লাগে না—এই তো যথেষ্ট। এই যে কাননকুন্তলা সুন্দরী ধরণী আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে—এর উৎপত্তির ইতিহাস কি? ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মত এই নবজাত শিশুটিব জন্ম হল কেন? পাশেব বাড়ীব সুগঠিতদেহ তরুণীটিব অকালমৃত্যুরই বা কাবণ কি? মৃত্যুই কি জীবনের শেষ—না মৃত্যুর পরও আর একটা জীবন আছে? আকাশের এত তারা, গাছের এত ফুল ও ফল, দিনের ঐ সূর্য আব রাত্রির নিদ্রাহীন চন্দ্রকে সৃষ্টি করল কে? এ-জাতীয কত প্রশ্নই মনে আসে। স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা কবেছে। কিন্তু চরম উত্তর আজও মেলেনি। মানুষ তাতে একটুও দুঃখিত নয়। এসব প্রশ্ন সে বারবারই কবে—আর নিজেব মত করে উত্তর দিয়ে আনন্দ পায়। বহু পুরাতন প্রশ্নের নূতন নূতন উত্তর বের করার মধ্যেই আনন্দ। আনন্দ মানুষকে প্রেরণা দেয। তাই আনন্দ পায় বলেই মানুষ দার্শনিক-চিন্তা করে।

(ঙ) জাগতিক দুঃখ দুর্গতি থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছা থেকে দার্শনিক-চিন্তার উৎপত্তি

ভারতবর্ষে দার্শনিক-চিন্তা বিস্ময়, সংশয় বা উপযোগিতা-বোধ থেকে জন্মলাভ করেনি। এখানকার দার্শনিক-চিন্তার উৎপত্তির ইতিহাস একটু নূতন ধরণের। ভারতবর্ষের দার্শনিকেরা যেন উপলব্ধি করেছেন—

"বড় দুঃখ, বড় ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দারিদ্র্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।"

এ সংসার এক মরুভূমি বিশেষ। এখানে জরা, মৃত্যু, ব্যাধি জীবনের সমস্ত আনন্দ-রস নিয়ত শুষে নিচ্ছে। 'এ যে কান্না-ভরা, ঘেন্না-ধরা পৃথিবী।' এখানে অসাম্য, অসন্তোষ, আশাভঙ্গ, অত্যাচার, অবিচার মানুষের জীবনকে নিয়ত বিষিয়ে তুলছে। এই দুঃখের সাগর পার হওয়ার উপায় খুঁজতে হবে। বুঝতে হবে—কেন এত দুঃখ। দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার চিন্তাই হবে আমাদের একমাত্র চিন্তা। তাই ভাবতবর্ষের দার্শনিকেরা দুঃখের কাবণ আর দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় বের কবতে যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করেছেন। ভারতবর্ষে দার্শনিক-চিন্তা জাগতিক দুঃখ-দুর্গতি থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।) আমাদের দার্শনিকেরা বলেছেন—সত্যদৃষ্টির অভাবই দুঃখের জন্য দায়ী আর সত্যদৃষ্টিলাভ মুক্তিব একমাত্র উপায়। তাই নিত্যকালের ভারতীয় দার্শনিকের প্রার্থনা—

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়।

(অসৎ থেকে আমাকে সৎ-এ নিযে চল, অন্ধকার থেকে নাও আলোতে, আর মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ করে দাও।)

এই প্রার্থনার মধ্যেই ভারতীয় দর্শনেব মর্মবাণী মর্মরিত হয়ে উঠেছে।

দর্শনের প্রয়োজনীয়তা ও প্রভাব

অনেক স্বল্পবুদ্ধি তথাকথিত বিষয়ী লোকেরই ধারণা—দর্শন উদ্ভট কল্পনা-বিলাস মাত্র। কতকগুলো স্বপ্নবিলাসী অকেজো লোক মিলে যুক্তির জাল বুনে চলেছে। জীবনের সঙ্গে এই যুক্তিজালের কোন সম্পর্ক নেই। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কোন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা এরা করে না। এদেরই নাম দার্শনিক। দর্শন ও দার্শনিক সম্বন্ধে এরকম শোচনীয় অজ্ঞতা যত শীঘ্র সমাজ থেকে দূর হয় ততই সমাজের মঙ্গল।

একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে দশন ধনোৎপাদনের ব্যাপারে সরাসরি কোন সাহায্য করে না। কিন্তু ধনোৎপাদনকেই যদি একমাত্র প্রয়োজনীয় কাজ বলে মনে না করি তবে দর্শন ধনোৎপাদনে সাহায্য করে না বলে তাকে নিষ্প্রয়োজনীয় বলা চলে না। ধনের নিজস্ব কোন মূল্য নেই। এক তাড়া নোট চিবিয়ে খাওয়া যায় না। টাকা দিয়ে আনন্দদায়ক অনেক বস্তু কেনা

যায় বলেই তার দাম। সত্যের সন্ধান আর বস্তু-সত্তা আবিষ্কারের মধ্যে যে আনন্দ আছে, তার তুলনা নেই। দার্শনিক এই আনন্দের অধিকারী; কারণ সত্যের সন্ধান আর বস্তু-সত্তা আবিষ্কারের চেষ্টাই তাঁর সাধনা। সুতরাং টাকা দিয়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার চেয়ে বহুগুণ বেশী আনন্দ কেউ কেউ যে দার্শনিক-চিন্তা থেকে পেতে পারেন তা অস্বীকার করা চলে না। জীবনে আনন্দ-প্রাপ্তিই যদি একমাত্র কাম্য হয় তবে যে দার্শনিক-চিন্তা থেকে আনন্দ পাওয়া যায় তাকে নিষ্প্রয়োজনীয় বললে চলবে কেন?

দর্শনের পক্ষে যে এইটুকুই বলবার আছে, তা নয়। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী, সামাজিক রীতিনীতি ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা—এ সমস্তই দার্শনিক-চিন্তা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রনেতাদের বক্তৃতা, সাহিত্য, সংবাদপত্র ও মুখে মুখে সঞ্চারিত বিভিন্ন মতবাদের মধ্য দিয়ে দার্শনিক-চিন্তা জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলে। আজকের খ্রীষ্টধর্ম যে অনেক মধ্যযুগীয় দার্শনিকের চিন্তা-ধারায় প্রভাবান্বিত হয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। আজকের দিনে সাধারণ লোকও যে বলে—মানুষকে কোন কর্মসিদ্ধির উপায় হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না; সরকার সাধারণ লোকের ভোট নিয়েই গড়ে উঠবে—এরও পেছনে কিন্তু দার্শনিক-চিন্তা কাজ করছে। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও দর্শনের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। আমেরিকার শাসনতন্ত্র অনেকাংশেই দার্শনিক জন লকের রাষ্ট্রনৈতিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। জন লক্‌ কর্তৃক নির্দিষ্ট বংশানুক্রমিক রাজার স্থান অধিকার করেছেন এখানে প্রেসিডেন্ট। এইটুকুই ত তফাৎ। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মানব-মুক্তির বাণী নিয়ে যে ফরাসী বিপ্লব হয়েছিল তার মূলে দার্শনিক রুশোর যে কতখানি অবদান তা ভুললে চলবে না। অবশ্য একথা ঠিক যে মাঝে মাঝে রাষ্ট্রনীতির ওপর দর্শনের প্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক ফল প্রসব করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিকদের উগ্র জাতীয়তাবাদ যে অনেকাংশে দু'টো মহাযুদ্ধের ইন্ধন যুগিয়েছে, তা অস্বীকার করা দায়। কিন্তু মন্দ দর্শন যদি রাষ্ট্রনীতির ওপর মন্দ প্রভাব বিস্তার করে, তবে শুভ দর্শন রাষ্ট্রনীতির ওপর শুভ প্রভাব বিস্তার করবে না কেন? তা যাই হোক না কেন, রাষ্ট্রনীতিকে দর্শনের প্রভাব থেকে কখনই মুক্ত করা যায় না, একথা স্বীকার করতেই হবে। সুতরাং রাষ্ট্রনীতির ওপর প্রভাব-বিস্তারী দর্শন যাতে শুভ ও কল্যাণপ্রদ হয়, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। জার্মানরা যদি নাজী রাষ্ট্রদর্শনের আওতায় না আসত তবে বোধ হয় পৃথিবীতে অনেক রক্তপাত ও অনেক শোক-সন্তাপই বন্ধ করা সম্ভব হত।

দর্শন যদি রাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবান্বিত করতে পারে তবে শুভ দর্শনের আওতায় যে শুভরাষ্ট্র গড়ে উঠবে তাতে যে ধনোৎপাদনের ব্যাপারে একেবারেই সাহায্য হবে না—একথাই বা বলি কি করে? আজ বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ফলে আমরা যে কত শুভ ফল পেয়েছি তার সত্যিই হিসেব নেই। এই বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পেছনেও যে একটা দর্শনের পটভূমিকা আছে, তা কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না। সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে কার্যকারণ-সম্পর্কিত ধারণা রূপান্তরের একটা বিশেষ স্থান আছে। কার্যকারণ-সম্পর্কিত ধারণা দর্শনের আলোচনার বিষয়। এইদিক থেকে সভ্যতার অগ্রগতিতে দর্শনের প্রভাব অনস্বীকার্য। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বলে যে একটা কথা আছে তা কিন্তু দর্শনবিশেষ, আর দার্শনিকেরাই একথার পত্তন করেছেন।

দর্শন সভ্যতার অদৃশ্য পটভূমিকা রচনা করে থাকে। জগৎ ও জীবনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী একটা বিশেষ সভ্যতার কাঠামো তৈরী করে। আর জগৎ ও জীবনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী দার্শনিকেরই সৃষ্টি। সুতরাং একটা বিশেষ সভ্যতার ওপর দর্শনের প্রভাব মোটেই তুচ্ছ নয়। দর্শন যত বলিষ্ঠ ও উদার হবে—সভ্যতাও তত বলিষ্ঠ ও উদার হয়ে উঠবে। দার্শনিক-চিন্তার অগ্রগতির মানই একটা বিশেষ সভ্যতার মহত্ত্বের মান সূচনা করে। যে দেশে দার্শনিক-চিন্তা যত উন্নত, সে দেশের সভ্যতাও ততই উন্নত।

ধর্মবোধ, ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা, নীতিবোধ সবই দার্শনিক-চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। একটা বিশেষ দেশের ধর্ম, নীতি ও ঈশ্বরতত্ত্ব সেই দেশের বিশেষ দর্শনেরই ছাপ প্রকাশ করে। জড়বাদী দর্শনের দেশে লোক স্বাভাবিক-ভাবেই ধর্মবিষয়ে নাস্তিক আর নীতি ব্যাপারে সুখবাদী হয়ে থাকে। যে দেশের দর্শন অধ্যাত্মবাদমূলক, সেখানে ধর্মে আস্তিকতা আর নীতি বিষয়ে বৈরাগ্যবাদই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

কেউ কেউ বলেন, আজকের দিনে দর্শনের আর কোন দরকার নেই। বিজ্ঞানই এখন দর্শনের কাজ করতে পারে। কিন্তু আমরা বলি—বিজ্ঞান কখনই দর্শনের স্থানে অভিষিক্ত হতে পারে না। মানুষের আত্মার রূপ কি? জগতের কোন উদ্দেশ্য আছে কি? আমরা কি অর্থে স্বাধীন?—এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান কখনই দিতে পারে না। দর্শন এসব প্রশ্নের চরম উত্তর দিতে পারে, এমন কথাও আমরা বলছি না। কিন্তু এসব প্রশ্নের আদৌ উত্তর দেওয়া যায় কিনা, আর দেওয়া গেলে উত্তর কি হবে—এসব নিয়ে আলোচনা

যে দার্শনিক করেন, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। প্রত্যেক বিজ্ঞান কতকগুলো কথা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নেয়। দার্শনিক এই কথাগুলোর যুক্তিযুক্ততা বিচার করেন। আজকের বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি সম্ভবই হত না যদি প্রখ্যাত দার্শনিকদের চিন্তা থেকে বিজ্ঞানীরা সাহায্য না নিতেন। গত তিন শতাব্দীর বিজ্ঞান জগতের যে যান্ত্রিক ধারণার ওপর গড়ে উঠেছে, তার স্রষ্টা দার্শনিক ডেকার্টে। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞান অনেকটা এগিয়েছে। আজ যদি বিজ্ঞানকে নূতন ধারণা নিতে হয় তবে সে তা দার্শনিকের কাছ থেকেই নেবে।

অন্যদিক থেকেও দর্শনের প্রয়োজনীয়তা আছে। দার্শনিক-চিন্তা মানুষের বুদ্ধি বিমল ও মার্জিত করে। বিভিন্ন সমস্যার বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে দর্শন মানুষকে সজাগ করে দেয়। চট্ করে কোন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করা উচিত নয়—এই হ'চ্ছে দর্শনের শিক্ষা। নির্মোহ মন নিয়ে সমস্ত কিছুই বিচার করতে হবে। যুক্তির কষ্টিপাথরে যা সত্য বলে নির্দিষ্ট হ'বে তাকেই গ্রহণ করবে। কোন উচ্ছ্বাস, কোন ভাবপ্রবণতা যেন আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন না করে সে দিকে সর্বদা আমাদের নজর রাখতে হবে। এরকম মানসিকতার নাম বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। দর্শন এই দৃষ্টিভঙ্গী বা মানসিকতা মানুষকে শিখিয়ে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হলে আমাদের সমাজের অনেক অসাম্য, অসন্তোষ ও অসামঞ্জস্য দূর করা সম্ভব হবে। সুস্থ সবল মানসিকতার ওপর এক নূতন সমাজ গড়ে উঠবে—সেখানে অত্যাচার, অবিচার, মনুষ্যত্বের পরাভব, শুভবুদ্ধির পরাজয় কিছুই আর থাকবে না। নূতন আলোর দেখা পাব আমরা। মুক্তির মন্দিরে আমাদের জীবনের নূতন অভিষেক হবে। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে কলহ থাকবে না, কারণ ভুল বোঝার সুযোগই এখানে নেই, আর ভুল বোঝার জন্যই যত রকমের কলহ হয়ে থাকে। সবাই যখন যুক্তির নির্দেশে চলবে তখন অন্যায় লোভ ও ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা কারুরই থাকবে না। অন্যায় লোভ ও ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা থেকেই যুদ্ধের উৎপত্তি। সুতরাং তখন যুদ্ধের অশান্তির ওপর শান্তির যবনিকা নেমে আসবে। আর সব চেয়ে বড় কথা, সার্থক গণতন্ত্র সত্যি সত্যি তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। দেশের শুভাশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণ সম্বন্ধে যদি সত্য ধারণা না থাকে, তবে কোন দল দেশের ও দশের সব চেয়ে বেশী উপকার করতে পারবে—তা বোঝা মুশকিল। আর তা বোঝা না গেলে কোন্ দলকে ভোট দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার দেওয়া উচিত তাও বোঝা যাবে না। তার ফলে হয়ত দেশের কল্যাণ ব্যাহত

হবে। সেই জন্যই হোয়াইট্‌হেড্‌ বলেছেন—সাধারণ শিক্ষায় যতদিন পর্যন্ত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকবে ততদিন সার্থক গণতান্ত্রিক সমাজ কখনই গড়ে উঠবে না।

অবশ্য একথা ঠিক যে অধিকাংশ লোকই দর্শনের যে সমস্ত উচ্চ আদর্শের কথা শোনে তা দিয়ে পরিচালিত হয় না। যদি পরিচালিত হত তবে এতদিনে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠত। সে যাই হোক না কেন—দার্শনিক-চিন্তার শুভফলকে কিন্তু কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না। কেউ যদি উচ্চ আদর্শের দ্বারা পরিচালিত না হয় তাতে উচ্চ আদর্শের হীনতা সূচিত হয় না, বরং ব্যক্তি-বিশেষেরই দুর্বলতা ও অক্ষমতা প্রকাশ পায়।

সর্বশেষে আমরা বলব—দার্শনিক-চিন্তা আমাদের বিশেষ বিশেষ উপকারে আসে বলেই তা শ্রদ্ধেয়, একথাও ঠিক নয়। দার্শনিক-চিন্তার মধ্যে আত্মার আনন্দ আছে এই ত যথেষ্ট কথা। মানুষ ত পশু নয়। বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে যে মানুষ জন্মেছে সে অজ্ঞানের অন্ধকারে বুদ্ধির মশাল জ্বালিয়ে পথ বেয়ে চলবে—এই ত স্বাভাবিক। এই পথ চলায় কি লাভ হবে—সেটা বড় প্রশ্ন নয়। মানুষ পথ চলবে চলার আনন্দেই। দার্শনিক-চিন্তার ফল কি হবে—এটা বিচার্য নয়। দার্শনিক-চিন্তার মধ্যে আত্মার আনন্দ আছে, চিত্তের তৃপ্তি আছে, অন্তরের প্রশান্তি আছে—এই ত খাঁটি কথা। মানুষ শুধু দেহবিশিষ্ট জীব নয়। মন বলেও তার একটা পদার্থ আছে। দেহের ক্ষুধা মিটলেই যে তার মনের ক্ষুধা মেটে না। সেজন্যই সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজও করে। বিষয়ী লোকেরা হয়তো তাকে বলবে—‘অকাজের কাজ’। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে চিত্তের পরম প্রশান্তির বিশেষ মুহূর্তে মানুষ যে অকাজের কাজ করেছে তারই ফলে দুনিয়ায় যত কাজের কাজ হয়েছে। বিজ্ঞানের যত বিস্ময়কর আবিষ্কার তার সকলেরই পেছনে এই একই ইতিহাস। সুতরাং নিরুদ্দেশ সত্য সন্ধানের চেষ্টা তুচ্ছ নয়—হাস্যাস্পদ নয়—একথা মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে—কোন একটা বিশেষ ধারণা থেকে সুফল পাওয়া যায় বলেই তা সত্য নয়—তা সত্য বলেই তা থেকে সুফল পাওয়া যায়। সত্য স্বতঃভাস্বর, স্বয়ংসাধ্য। যে দার্শনিক সেই সত্যানুসন্ধান করেন—সন্ধানের মধ্যেই তিনি তার পুরস্কার পান। সুতরাং দার্শনিক-চিন্তার যে একটা নিজস্ব মূল্য আছে তা কোন অংশেই হেয় বা তুচ্ছ নয়।

দর্শন ও বিজ্ঞান

জগৎ ও জীবনের রহস্যভেদের জন্যই দর্শন ও বিজ্ঞানের সৃষ্টি। সাধারণভাবে যা দুর্বোধ্য বা অজ্ঞেয় বা জটিল তাকে সহজবোধ্য, জ্ঞেয় ও সহজ করাই দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের কাজ। আমরা যা সহজে বুঝি না তার একটা ব্যাখ্যা পেলে খুশী হই। জগৎ ও জীবনের জটিলতার আর শেষ নেই। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা দিযে তার জটিলতা সহজ করার চেষ্টা করেন। সুতরাং জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যাতা হিসাবে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক একই পথের যাত্রী। কিন্তু ব্যাখ্যা করতে গিযে বৈজ্ঞানিক যেখানে এসে থেমে পড়েন, দাশনিক সেখানেই থামেন না। তিনি আরও দূরের যাত্রী।

বৈজ্ঞানিক জগৎ ও জীবনকে আলোচনার সুবিধের জন্য কতগুলো ভাগে ভাগ করে নেন। পদার্থবিদ্যা শুধু পদার্থের ব্যাখ্যা নিযেই ব্যস্ত আর জীববিদ্যা জীবের নানা জটিলতার রহস্যভেদের কাজেই মেতে আছে। এরকম করে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিভিন্ন বিশেষ বিষযের আলোচনা ও ব্যাখ্যা নিযে সবদাই মশ্‌গুল। সেজন্যই বিশেষ বিষযের বিশেষ জ্ঞানকে বলে বিজ্ঞান।

আমরা জানি কতগুলো বিষযকে যদি একটা নিযম বা শৃঙ্খলার মধ্যে আনা যায তবে সেই বিষযগুলোর একটা ব্যাখ্যা আমরা পেযে থাকি। আম মাটিতে পড়ে, জল নীচে গড়িযে যায—এমন কতই ত হামেসাই দেখছি। এ সমস্ত বস্তুর নীচে নামার রহস্যই কিন্তু এক মাধ্যাকর্ষণের নিযম দিযে ব্যাখ্যা করা যায। পদার্থবিদ্যা ত তাই করছে। এমনিভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানই বিভিন্ন নিযম দিযে বহু খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ঘটনা ও বস্তুকে ব্যাখ্যা করার কাজে এগিযে চলেছে। জীববিদ্যায বংশপ্রভাবের নিযম, পদার্থবিদ্যায মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব, মনোবিজ্ঞানে আপেক্ষিকত্বের নিযম—এমন ধারার কত নিযমই ত বিভিন্ন বিজ্ঞানে আছে।[১]

১। বংশপ্রভাবের নিয়ম'এর ইংরাজী নাম The Law of Heredity, আমরা সাধারণতঃ পিতামাতার আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য তাদের পুত্রকন্যাদের মধ্যে দেখতে পাই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিতামাতার আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে তাদের পুত্রকন্যাদের আকৃতি ও প্রকৃতির সাদৃশ্য এক বংশপ্রভাবের নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয। বংশপ্রভাবের নিয়ম অনুসারে পূর্বপুরুষদের প্রভাব উত্তরপুরুষদের মধ্যে বর্তায। মনোবিজ্ঞানে আপেক্ষিকত্বের নিযম বলতে মনন (thinking), অনুভূতি (feeling) ও কৃতি (willing)—মনের এই তিন বৃত্তির পরস্পর সাপেক্ষতা বোঝায়। আমরা সাধারণতঃ যে ব্যক্তির মননশক্তি খুব প্রবল তার অনুভূতি ও কৃতি অপেক্ষাকৃত দুর্বলই দেখতে পাই। আবার অনুভূতির প্রবলতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনন ও কৃতির অপেক্ষাকৃত দুর্বলতা সূচনা করে। কৃতি যেখানে প্রবল সেখানে মনন ও অনুভূতির স্বল্পতা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়।

জগৎ ও জীবনের চরম ব্যাখ্যা হবে তখনই যখন কোন একটা বিশেষ নিয়ম বা তত্ত্ব দিয়ে সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা সম্ভব হবে। বৈজ্ঞানিক এই চরম ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা কখনই করেন না। তিনি জগৎ ও জীবনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন নিয়ম স্থাপন করেন। কিন্তু এই বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে আর একটা বৃহত্তর নিয়ম বা শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করেন না। সেজন্যই বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা যেন মাঝপথে এসেই থেমে পড়ে।

দর্শনের ব্যাখ্যা করার কায়দাই যেন আলাদা। দার্শনিক জগৎ ও জীবনকে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করে নেন না। তিনি একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জগৎ ও জীবনের পূর্ণচিত্র নিয়ে তার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। জড়বাদী দার্শনিক এক জড় তত্ত্ব দিয়ে সমস্ত জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। অধ্যাত্মবাদী এক অখণ্ড অধ্যাত্ম-তত্ত্ব দিয়ে সমস্ত কিছু ব্যাখ্যার প্রয়াস করেন। সেজন্যই দার্শনিকের যে ব্যাখ্যা সে যেন বৈজ্ঞানিকের ব্যাখ্যার চেয়ে গভীরতর ও দূরগামী। শুধু তাই নয়। বৈজ্ঞানিক ত জগৎ ও জীবনের একটা ব্যাখ্যা দিয়েই খালাস। কিন্তু ব্যাখ্যার স্বরূপ কি? কতটুকু ব্যাখ্যা সম্ভব? এমন কি কোন বস্তু আছে যার ব্যাখ্যা করাই যায় না? —এরকম প্রশ্ন নিয়ে বৈজ্ঞানিক কখনই আলোচনা করেন না। এসব প্রশ্ন কিন্তু দার্শনিকের আলোচনার বিষয়। তারপর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেক কথাই স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নেন। জড়, প্রাণ, মন, দেশ, কাল প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েই বৈজ্ঞানিক-ব্যাখ্যার কাজ শুরু হয়। দার্শনিক কিন্তু এসব ধরে নেওয়া তত্ত্বের সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। সুতরাং এদিক থেকেও দার্শনিকের কাজ বৈজ্ঞানিকের কাজের চেয়ে সুদূরপ্রসারী।[১]

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের ব্যাখ্যার মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভেদও লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সত্যতা পরীক্ষা

১। অত্যন্ত আধুনিককালে নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষবাদী (Logical Positivist) নামে একদল দার্শনিকের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরা বলেন, বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলো একত্র করা বা সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে কোন সামগ্রিক ধারণা প্রদান করা দর্শনের কাজ নয়; বিভিন্ন বিজ্ঞানে ব্যবহৃত ভাষার নৈয়ায়িক বিশ্লেষণই দর্শনের একমাত্র কাজ। সুতরাং এঁদের মতে, দর্শন বিজ্ঞানের ব্যাকরণ: বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ক খুবই নিবিড়, কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞান কখনই অভিন্ন নয়। উৎসাহী পাঠক এই প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনার জন্য কারনপ্ লিখিত 'Logical Syntax of Language' এবং 'Philosophy and Logical Syntax' গ্রন্থ দু'টি পাঠ করতে পারেন।

করে নির্ণয় করা যায়। দার্শনিক ব্যাখ্যার সত্যতা কিন্তু এভাবে কখনই নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যে দার্শনিক ব্যাখ্যা তর্ক-বিজ্ঞানেব কোন নীতি ভঙ্গ করে না অর্থাৎ যা যুক্তিযুক্ত আমরা মোটামুটি তাকেই সত্য বলে ধরে নেই। কোন একটা বিশেষ বিষয়ে একাধিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কখনই গ্রাহ্য নয়। একটা বিশেষ যুগে সব বৈজ্ঞানিকেবা একটা বিশেষ বিষয়েব একরকম ব্যাখ্যাই দেন। যদি অন্য কোন ব্যাখ্যা পবীক্ষায এর চেয়ে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় তখন আগের ব্যাখ্যা সর্বৈব মিথ্যা বলে পরিত্যাগ কবতে হয। দশনের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কিন্তু একথা কখনই বলা চলবে না। বিভিন্ন দাশনিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দাশনিক ব্যাখ্যাকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা যায়।[১] সেজন্যই অনেকে মনে কবেন বিজ্ঞানে যে অর্থে জ্ঞান পাওযা যায দশন সে অর্থে কখনই জ্ঞান দিতে পারে না। বিজ্ঞানেব একটা বিশেষ তত্ত্ব সর্বজনগ্রাহ্য হবেই হবে, নতুবা তাকে গ্রহণই কবা যাবে না। দর্শনে কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য কোন তত্ত্বই পাওযা যাবে না। অনেকেব মতে যা সর্বজনগ্রাহ্য তা-ই জ্ঞান। সে অর্থে বিজ্ঞানই জ্ঞান দেয়, দশন দেয না।

একটা বিশেষ অর্থে দশন আর বিজ্ঞান কিন্তু পবস্পব নির্ভরশীল। দর্শন যখন জড, প্রাণ ও মনের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে তখন এসব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলো দাশনিকেব জানা প্রয়োজন। আসলে দাশনিক জড, প্রাণ ও মনেব স্বরূপ আলোচনা কবতে গিয়ে এসব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলোর দাশনিক মূল্য বিচার করে থাকেন। সুতরাং এই দিক থেকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব না পেলে দাশনিক আলোচনাই হতে পারে না। এই অর্থে দর্শন বিজ্ঞানের ওপর নির্ভবশীল।

কিন্তু আর একদিক থেকে বিজ্ঞান আবার দর্শনের ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞান জড, প্রাণ, মন, দেশ, কাল প্রভৃতির অস্তিত্ব ধরে নিয়েই এদেব সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে। এদের সত্য-স্বরূপ নির্ণয়ের ভার দার্শনিকের ওপর। শুধু তাই নয়। বৈজ্ঞানিক কার্যকারণবাদ নিয়ে আলোচনা করেন

১। ডক্টর কালিদাস ভট্টাচার্য তাঁর 'Alternative Standpoints in Philosophy' নামক পুস্তকে জ্ঞানের ব্যাখ্যাতা হিসেবে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ (Realism) ও ভাববাদ (Idealism) উভয় মতবাদেরই যৌক্তিকতা প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছেন। উৎসাহী পাঠক ডক্টর ভট্টাচার্যের এই গ্রন্থ পাঠ করলে বিশেষ উপকৃত হবেন বলে মনে করি।

কিন্তু এর চরম তাৎপর্য নির্ণয় করেন দার্শনিক। জ্ঞানের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশ্বাস নিয়েই বৈজ্ঞানিক কাজ শুরু করেন। দার্শনিক এই বিশ্বাসের যৌক্তিকতা আলোচনা করেন।

বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের কতকগুলো মৌলিক তফাৎও আছে। বিজ্ঞান আঙ্কিক সূত্র (mathematical formula) দিযে জগৎকে ব্যাখ্যা করাব চেষ্টা করে। পদার্থ-বিজ্ঞানকে আজকেব দিনে সেরা বিজ্ঞান বলা হযে থাকে। উচ্চতব গণিতশাস্ত্র আব উচ্চতব পদার্থ-বিজ্ঞান আজ প্রায সার্থক হযে উঠেছে। পদার্থ-বিজ্ঞানীরা তাঁদের সিদ্ধান্তগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজকাল আঙ্কিক সূত্র দিযে প্রকাশ করেন। বিশ্বসংসারে কোন একটা বিশেষ বস্তুর স্থান ও মূল্য কি—এ আলোচনা কোন বৈজ্ঞানিকই সাধারণতঃ কখনও করেন না। বস্তুর স্বরূপ-বিশ্লেষণই বৈজ্ঞানিকের কাজ, তার মূল্য-নির্ণয নয। দার্শনিক মনে করেন, কোন একটা বস্তুর মূল্য-নির্ণয না করলে তাব পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা কখনই দেওযা হয না। সেজন্য বস্তুস্বরূপ ও বস্তুমূল্য-নির্ণয উভযই দার্শনিকেব কাজ। দর্শন জগৎ ও জীবনের চরম মূল্য নির্ধারণেব চেষ্টা করে।

বিজ্ঞান মানুষের বুদ্ধিকে তৃপ্ত করে। কিন্তু মানুষ শুধু বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবই নয। তাব অনুভূতি আছে, ইচ্ছারও প্রবলতা আছে। মানুষের সমগ্র মনের তৃপ্তিব জন্য তাব বুদ্ধি, আবেগ ও ইচ্ছাব পরিপূর্ণ তৃপ্তি প্রযোজন। বিজ্ঞান সত্যলাভেব চেষ্টা করে। তাতে মানবমনের আংশিক তৃপ্তি হয, কিন্তু পরিপূর্ণ তৃপ্তি হয না। দর্শন মানবমনেব পূর্ণ প্রশান্তি এনে দেয। বুদ্ধিব তৃপ্তি সত্যপ্রাপ্তিতে। অনুভূতির প্রশান্তি কিন্তু সুন্দব লাভে। যা কিছু সুন্দব অনুভূতি তাকেই পেতে চায। মানুষের কৃতি বা ইচ্ছা কল্যাণকর্মে আনন্দ পায। যা ভালো তা করেই ত মানুষের সুখ। দর্শন এই সত্য-শিব (বা কল্যাণ)-সুন্দর তিনেরই আলোচনা করে থাকে। তাই কেবলমাত্র সত্য-সাধক বিজ্ঞান অপূর্ণ; সত্য, শিব ও সুন্দরেব সাধক দর্শন সত্যিই পূর্ণ।[১]

১। দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করতে গিযে কেউ বলেছেন—বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলোর একীকৃত রূপই দর্শন (Philosophy is the synthesis of the sciences)। হার্বার্ট স্পেন্সার এই মতবাদে বিশ্বাসী। আমাদের মনে হয়, এই মতবাদ আদৌ যুক্তি-গ্রাহ্য নয়। বিভিন্ন বিজ্ঞানকে একীকৃত করতে হলে সমস্ত বিজ্ঞানেরই জ্ঞান থাকা আবশ্যক : কিন্তু সসীম ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন দার্শনিকের পক্ষেই এরকম বিস্তৃত জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি

দর্শন ও ধর্ম

দর্শন ও ধর্ম—এই দু'য়ের মূলে রয়েছে সত্যসন্ধান-প্রবৃত্তি। চরম সত্যকে জানবার চেষ্টাই দার্শনিক ও ধার্মিককে প্রণোদিত করে। কিন্তু এই সত্যসন্ধানের প্রণালী দর্শনে আর ধর্মে এক নয়। দার্শনিক যুক্তিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্যকে জানতে চেষ্টা করেন আর ধার্মিক অনুভূতির গভীরতায় সত্যকে লাভ করার জন্য আকুল হন। ধার্মিকের কাছে যুক্তি-তর্কের বিশেষ স্থান নাই। তিনি বলেন—'বিশ্বাসে মিলায় হরি তর্কে বহুদূর'। বিশ্বাস, অনুভূতি, অন্তরের আন্তরিকতা—এ-সবই হচ্ছে ধর্মের প্রাণ। দর্শনে কিন্তু যুক্তিপারম্পর্য, বিচার আর মোহমুক্ততাই মুখ্য কথা। মোহমুক্ত মনে দার্শনিককে সত্যের বিচার করতে হয়। ধর্মে প্রেম ভক্তি আর শ্রদ্ধা দিয়েই প্রেমের ঠাকুরকে জীবনের সত্য বলে পেতে হয়। যা যুক্তিগ্রাহ্য নয় দর্শনে তার কোন স্থান নেই। ধর্মের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্তির নির্দেশ মেনে চলে না।

তাঁর দর্শনে সমস্ত বিজ্ঞানকে একত্রিত করবেন, এমন উদ্ভট আশা পোষণ করা যায় না।

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলো প্রায়ই বদলায়। টলেমি সৌরজগৎ সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করতেন আজকের দিনে তা আর কেউ সত্য বলে মনে করে না। এমন ধারার মত-পরিবর্তন সব বিজ্ঞানেই আছে। এই পরিবর্তনশীল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলো একত্রিত করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। আজ সমস্ত বিজ্ঞান একত্রিত করে যা পাব, তা আর কাল হয়ত পাব না। এর ফলে দর্শনও বিজ্ঞানের মত পরিবর্তনশীল হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়। কালকের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যেমন অনেক সময় আজকের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেয়, তেমনি আজকের দর্শন কালকে নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে। তখন আজকের দর্শনের আর বিশেষ কোন মূল্যই থাকবে না। কিন্তু আমরা দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে, বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের মত কোন দার্শনিক সিদ্ধান্তই সম্পূর্ণ বর্জন করা যায় না। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিভিন্ন দর্শনকেই অনেক সময় সমর্থন করা যায়। সুতরাং দর্শনকে বিভিন্ন বিজ্ঞানের একত্রিত রূপ বলা যায় না।

দর্শন বিজ্ঞানের মত আংশিক দৃষ্টি দিয়ে পরিচালিত হয় না—একথা সত্য। বিজ্ঞান প্রকৃতিকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে নিয়ে তাদের আলোচনা করে, একথাও অস্বীকার করা যায় না। দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, একথাও ঠিক। কিন্তু প্রকৃতির বিভিন্ন অংশগুলোকে যান্ত্রিকভাবে একত্রিত করলেই প্রকৃতির কোন সামগ্রিক রূপ পাওয়া যায় না। এই সামগ্রিক রূপ দার্শনিকের অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করে। সুতরাং দর্শন কখনই বিভিন্ন বিজ্ঞানের একীকৃত প্রকাশ হতে পারে না।

দর্শনের কোন আনুষ্ঠানিক দিক নেই। দর্শন জ্ঞান-চর্চা, কিন্তু ধর্ম জীবন-চর্যা বিশেষ। অনুষ্ঠান বাদ দিলে ধর্মের অঙ্গহানি হয়। কিন্তু দার্শনিকের পক্ষে কোন অনুষ্ঠানই প্রয়োজনীয় নয়। ধর্মের প্রকাশ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক পূজাপার্বণের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। অনেক সময় দৈহিক পীড়ন, বিভিন্ন অঙ্গাভরণ, নৃত্য ও গীত ধর্মের অঙ্গ বলে গৃহীত হয়। দর্শনের সঙ্গে কিন্তু কোন পূজাপার্বণের সরাসরি কোন সম্পর্ক নাই। কোন অঙ্গাভরণ, নৃত্য বা গীত দর্শনের অঙ্গও নয়।

দার্শনিক একটা নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে সত্যকে জানতে চেষ্টা করেন। ধার্মিক সত্যকে শুধু জেনে খুশী নন, তিনি তাকে হৃদয়ের সমস্ত আকূতির মধ্যে একান্তভাবে আপনার করে পেতে চান। ধার্মিকের কাছে সত্য যেন 'আমার সত্য' হয়ে দেখা দেয়। দার্শনিকের সত্যের রূপ কিন্তু সার্বজনীন ও একান্তভাবে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ।

সাধারণভাবে ধর্মের একটা নৈতিক ভিত্তি থাকে। কতকগুলো নৈতিক নিয়ম প্রায় প্রত্যেক ধর্মেরই অঙ্গবিশেষ। পৃথিবীর দু'টো বিশিষ্ট ধর্ম—বৌদ্ধ আর জৈন ত মুখ্যতঃ নীতির ধর্মই বটে। বৌদ্ধেরা ও জৈনেরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে নৈতিক জীবনই ধার্মিক জীবন। বুদ্ধদেব ধর্মজীবনে অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুবর্তনের উপদেশ দিয়েছেন। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি এই ত অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এ ত কতকগুলো নীতি উপদেশমাত্র। বৌদ্ধধর্ম নীতি-উপদেশমূলকই বটে। জৈনেরা সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান আর সম্যক্ চরিত্র রূপায়ণের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং জৈনধর্মও যে নীতিমূলক তা অস্বীকার করা যাবে না। দর্শনে কিন্তু ধর্মের মত কোন নৈতিক ভিত্তি থাকে না। দর্শন করতে গেলেই যে কতকগুলো নীতির নিয়ম মেনে চলতে হবে তার কোন মানে নেই। কিন্তু ন্যায়ের নিয়ম (Laws of Logic) না মানলে কোন দর্শনই হবে না। ধর্ম অবশ্য সাধারণতঃ কোন ন্যায়ের নিয়মই মেনে চলে না। সুতরাং দর্শন আর ধর্ম কখনই এক হতে পারে না।

দর্শন ও কাব্য

কাব্য মুখ্যতঃ অনুভূতি ও রসের ব্যাপার। কবি হৃদয় দিয়ে যা অনুভব করেন তা-ই তিনি কাব্যের রসঘন ভাষায় আর একটি সহৃদয় লোকের কাছে পৌঁছে দিতে চান। অনুভূতি ও আবেগ কাব্যের উৎস; রসিক পাঠক তার বিচারক। যার রসবোধ নেই কবি তার জন্য কখনই কাব্য রচনা করেন না।

নিত্যকালের কবি নিত্যই প্রার্থনা করেন—অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ। যুক্তিসিদ্ধ মননশীলতা ও বুদ্ধির ঠাস বুননিতে দর্শনের উৎপত্তি। দার্শনিকের আবেদনও মানুষের হৃদয়ের দ্বারে নয়, বুদ্ধির দরবারে।

কবি অনুভব করেন আর তাঁর অনুভূতি মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করেন। কবির কবিত্ব যতখানি প্রকাশের মাধুর্যে ও স্বচ্ছতায় ততখানি কিন্তু ভাবের গভীরতায় নয়। দার্শনিকের পরিচয় তাঁর ভাব-প্রকাশের ক্ষমতায় নয়, চিন্তার মৌলিকতায় ও যুক্তির অনবদ্যতায়।

কবি জগৎ ও জীবনের স্পন্দন আপনার অনুভূতিতে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টায় যিনি যত সফল হন তিনিই তত সার্থক কবি। দার্শনিক বুদ্ধি দিয়ে জগৎ ও জীবনের জটিলতার রহস্যভেদ করার চেষ্টা করেন। এই কাজে যিনি যত এগিয়ে গেছেন, তিনি তত বড় দার্শনিক বলে খ্যাতি পেয়েছেন।

কবি কল্পনার রঙ্ বুলিয়ে জগৎকে নূতন করে সৃষ্টি করেন। যা সহজ, সাধারণ ও একান্তভাবেই একঘেয়ে কবি তার মধ্যে অলৌকিকতার রূপ ফুটিয়ে গেলেন। দার্শনিক পুরাতন জিনিসকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতে চেষ্টা করেন। 'তিনি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' জগৎকে কখনও রচনা করার চেষ্টা করেন না, বরং একান্ত নির্লিপ্তভাবে জগতের নিজস্ব রূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন।

কবি ভাষায় ছবি আঁকেন। বর্ণনার চেয়ে ব্যঞ্জনায়ই কবির কবিত্ব। জগতের একটা আলঙ্কারিক ও অতিপ্রাকৃত রূপ সাধারণতঃ কাব্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে। দর্শনে ছবির কোন স্থান নেই, ব্যঞ্জনা এখানে গঞ্জনা বিশেষ। বুদ্ধিতে জগতের যে সহজ রূপ প্রকাশিত হয়—তাই দার্শনিকের আলোচনার বিষয়।

কবি বিশ্বসংসারে সুন্দরকে খুঁজে বেড়ান। নর ও নারীতে, মাটিতে ও আকাশে সর্বত্রই তিনি সুন্দর দেখতে পান। তাঁর চোখে কালোরও আলো আছে। কবির দৃষ্টিতে সুন্দরই সত্য আর সত্যই সুন্দর। দার্শনিক যুক্তি দিয়ে সত্য, শিব ও সুন্দরকে সমন্বিত করার চেষ্টা করেন। সত্যস্বরূপের পরিপূর্ণ রূপ তাঁর কাছে শুধু সুন্দর নয়, শিবও বটে।

পেরী দার্শনিক-কবি আর কবি-দার্শনিকের মধ্যে একটা ভেদরেখা টেনেছেন। তাঁর মতে যে সমস্ত কবি তাঁদের কাব্যে দার্শনিক চিন্তার আমদানী করেছেন, তাঁরা সত্যিকারের দার্শনিক-কবি। মিল্টন, ডান্টে, গ্যেটে, ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ, ব্রাউনিং প্রভৃতি এই পথের পথিক। ডান্টে তাঁর 'ডিভাইন কমেডি'তে

জগতের উপাদান, মানুষের উৎপত্তি ও ভাগ্য, পাপের উদ্ভব ও নিবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার বিষয় সম্পূর্ণভাবেই দার্শনিকের। মিল্টনও পাপের উৎপত্তি আর ঈশ্বরের কৃপায় পাপের নিবৃত্তি নিয়ে কবিতা লিখেছেন। গ্যেটে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানবমুক্তির কথা বলেছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতিকে জীবন্ত নারীমূর্তিরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। মানুষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক কবিকে অভিভূত করেছে। ব্রাউনিং ঈশ্বরে চরম বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এই সব কবির কাব্যে দার্শনিক ভাবের ছড়াছড়ি আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের মতে—এঁরা কবি, দার্শনিক ন'ন। কাব্যে দার্শনিক ভাব থাকলেই কবি দাশনিক হন না, তাঁর দার্শনিক মেজাজ থাকা চাই। যুক্তিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যে দার্শনিক ভাব পাই, তা-ই সত্যিকারের দশন। কাব্যে যুক্তিতর্ক নেই। সুতরাং তা দর্শন নয়। আর যুক্তিতর্ক থাকলে কাব্য দর্শন হবে বটে, কিন্তু তা কাব্য হবে না।

প্লেটো আর হেগেলকে বলা হয় কবি-দার্শনিক। এঁরা এঁদের দার্শনিক-চিন্তা কাব্যের মত মনোরম ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এঁদের লেখা সত্যিই বড় মধুর। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে যে, প্লেটো আর হেগেলের কৃতিত্ব কিন্তু ভাষায় বা বর্ণনায় নয়, তাঁদের ভাবগাম্ভীর্যে। আর এই ভাব যুক্তিতর্ককেই বাহন করেছে। লেখায় তাঁদেব কাব্য-গুণ উপরি-পাওনামাত্র। সুতরাং দার্শনিক শুধু কবি হলে তাঁকে কিন্তু দার্শনিক বলব না। দার্শনিক-চিন্তার সঙ্গে যাঁর কাব্যগুণ থাকে তাঁকে দার্শনিক হিসেবে নয়, দর্শনের লেখক হিসেবে একটু শ্রদ্ধা করব বৈ কি। দার্শনিক হিসেবে খ্যাতি নির্ভর করবে সম্পূর্ণভাবেই দার্শনিক ভাবের ওপর, ভাব-প্রকাশের ক্ষমতার ওপর নয়।

দর্শনের প্রচলিত বিভিন্ন সংজ্ঞার্থের বিচার

জগৎ, জীবন ও সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা যে সব ধারণা নিয়ে কাজ কারবার করি তাদের যৌক্তিকতা বিচার ও মূল্যাবধারণই দর্শন। আমরা একথা বিশ্লেষণ করেছি এবং দর্শনের সংজ্ঞার্থরূপে একেই যথার্থ বলে গ্রহণ করেছি। এবার আমরা এই সংজ্ঞার্থের আলোতে দর্শনের প্রচলিত কয়েকটি সংজ্ঞার্থ-এর যাথার্থ্য বিচার করবো।

১। কাণ্ট বলেছেন, দর্শন জ্ঞানের বিচার ও বিজ্ঞান বোঝায় (Philosophy is the science and criticism of Cognition.)। এই সুরেই ফিক্‌টে বলেছেন, দর্শন জ্ঞানের বিজ্ঞান (Philosophy is the science of Knowledge.)। এই দু'টি সংজ্ঞার্থেই দর্শনকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-এর সমার্থক বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শনের একটি অঙ্গ মাত্র, এর আরও তিনটি অঙ্গ আছে। সুতরাং এ সংজ্ঞার্থ তর্কবিজ্ঞানের পরিভাষায় সংকীর্ণ (Too narrow)। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। দর্শন যে সাধারণ বিজ্ঞান থেকে ভিন্ন, একথা সুস্পষ্টভাবেই এ সংজ্ঞার্থে প্রকাশিত হয়েছে। কোন সাধারণ বিজ্ঞানেরই আলোচনার বিষয় জ্ঞান নয়, কিন্তু দর্শন জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে।

২। অত্যন্ত প্রাচীন কালে প্লেটো এবং আরিস্টটল দর্শনেব সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করেছিলেন। প্লেটো বলেন, শাশ্বত এবং বস্তু-স্বরূপ-এর জ্ঞানলাভ দর্শনের লক্ষ্য (Philosophy aims at the Knowledge of the eternal, of the essential nature of things.)। আরিস্টটল বলেন, দর্শন বস্তুর স্বরূপ এবং স্বরূপগত গুণের বিশ্লেষণকারী বিজ্ঞান (Philosophy is the science which investigates the nature of being as it is in itself and the attributes which belong to it in virtue of its own nature.)। এই দু'টি সংজ্ঞার্থেই দর্শন ও পরাবিজ্ঞান দর্শনের সমার্থক বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু, একথা ঠিক নয়। পরাবিজ্ঞান দর্শনের একটি শাখা বা অঙ্গ, দর্শনের আবও শাখা আছে। সুতরাং দর্শনের কোন একটি শাখাকে সম্পূর্ণ দর্শন বলে মনে করলে দর্শন সম্বন্ধে অত্যন্ত সংকীর্ণ (too narrow) ধারণা করা হয়। আমরা দর্শনের এ সংজ্ঞার্থ মানতে পারি না।

৩। কোঁতে বলেছেন—দর্শন বিজ্ঞানের বিজ্ঞান (Philosophy is the science of sciences.)। পলসন বলেন, দর্শন সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমষ্টি (Philosophy is the sumtotal of all scientific Knowledge.)। ভুণ্ট বলেন—ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের একটি সুসমঞ্জস সমগ্রতায় একীকরণই দর্শন (Philosophy is the unification of all Knowledge obtained by the special sciences in a consistent whole.)। এ সমস্ত সংজ্ঞার্থের মূল কথা—বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির একীকৃত রূপই দর্শন। আমরা পূর্বে দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে পাদটীকায়

এ মত আলোচনা করে খণ্ডন করেছি। পুনরুক্তি পরিহারের জন্য সে আলোচনা আর করছি না।

৪। মার্ভিন বলেন, দর্শন সত্যের প্রতি অনুরাগ বোঝায়। এ সত্য সমস্ত সত্যকে একটি বিরাট সমগ্রতার মধ্যে সুবিন্যস্ত ক'রে অঙ্গীভূত করে এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান সূচনা করে (Philosophy is love for 'the truth'—the complete body of Knowledge that includes in it all truths —all truths organised into one great system.)। এই সংজ্ঞার্থে দর্শনের ক্ষেত্রে সত্য লাভের গুরুত্ব যথার্থভাবে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু সত্যের প্রতি গুরুত্ব দিতে গিয়ে দর্শন যে সুন্দর ও কল্যাণ নিয়েও আলোচনা করে, একথা উপেক্ষা করা হয়েছে। এই সংজ্ঞার্থে পরিপূর্ণ জ্ঞান বলতে যদি বিভিন্ন বিজ্ঞানের জ্ঞানের একীকরণ বুঝিয়ে থাকে তবে তা গ্রহণ করা যাবে না। আমরা একথা আগেই আলোচনা করেছি। এ সংজ্ঞার্থে পরিপূর্ণ সত্যকে বিভিন্ন সত্যের সমাহার বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু, সত্যের সমাহার কি করে হতে পারে তা বোঝা মুশকিল। সত্যের যোগ বা বিয়োগ হ'তে পারে না।

৫। ওয়েবার বলেন, দর্শন প্রকৃতি সম্পর্কে সামগ্রিক মত এবং বস্তুর সঠিক ব্যাখ্যা দানের প্রচেষ্টা বোঝায় (Philosophy is the search for a comprehensive view of nature, an attempt at a universal explanation of things.)। এই সংজ্ঞার্থে জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যাদান যে দর্শনের কাজ, একথা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু, মূল্যাবধারণও যে দর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য কর্ম, একথা স্বীকৃত হয়নি। সুতরাং এ মতকেও আমরা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি

কাম্য বস্তু লাভ করার জন্য যে নিয়ম বা প্রণালী অবলম্বন করা যায় তারই নাম পদ্ধতি। দার্শনিক আলোচনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে শৈলী বা পথ অনুসরণ করা উচিত তাকেই বলে দার্শনিক পদ্ধতি। আমরা যদি দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করি তবে দেখব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দার্শনিক পদ্ধতি অনুবর্তন করেছেন। আমরা এই অধ্যায়ে এই সব বিভিন্ন দার্শনিক পদ্ধতি বিচার-বিশ্লেষণ করে দার্শনিক আলোচনার আদর্শ পদ্ধতি কী হওয়া উচিত তা নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

নির্বিচারবাদ (Dogmatism)

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা, জ্ঞানের প্রাগুপকরণ ও সীমা না জেনেই দার্শনিক আলোচনা শুরু করার নাম নির্বিচারবাদ। এই পথের পথিকেরা কতটুকু জানা যায় তা বিচার না করেই তত্ত্বজিজ্ঞাসা শুরু করে দেন। তাই এঁরা নির্বিচারবাদী দার্শনিক নামে পরিচিত। তত্ত্ব[১] আদৌ জানা সম্ভব কি না এই প্রশ্ন তাঁরা তোলেন না। কতগুলো ধারণাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে ধরে নিয়ে তার থেকে অন্য কতগুলো সিদ্ধান্ত এঁরা বের করতে চেষ্টা করেন। তাঁদের মতে এই নূতন সিদ্ধান্তগুলোও পূর্বের ধারণাগুলোর মতই সত্য। স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া ধারণা ও তা থেকে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে, তা আসলে সত্য কিনা—এ বিচার তাঁরা করেন না। আমাদের মনে হয়, চিন্তা শুরু করার আগে যেহেতু চিন্তার সীমা জানা যায় না, সেজন্য বোধ হয় ব্যর্থ চেষ্টা না করে নির্বিচারবাদী দার্শনিকেরা প্রথমেই তত্ত্বজিজ্ঞাসা শুরু করে দেন।

সমালোচনা :—নির্বিচারবাদী দার্শনিকদের পক্ষে যা-ই বলি না কেন, তাঁদের পদ্ধতির কতকগুলো ত্রুটি কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। বিচার না করেই যদি দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তবে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন সিদ্ধান্তে দর্শনের ইতিহাস পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। দর্শনের ইতিহাসে আমরা দুই দলের নির্বিচারবাদী দার্শনিকের দেখা পাই। একদলে আছেন বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা, আর একদলের সভ্য হচ্ছেন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকেরা। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকের বিচার না করেই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান অনির্দিষ্ট ও অসত্য ও বুদ্ধি দিয়ে চরম তত্ত্ব জানা যায়, তা ধরে নিয়েছেন। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকেরা সমস্ত জ্ঞান অভিজ্ঞতা

১। Reality

থেকে লাভ করা যায়, বুদ্ধি জ্ঞান ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়—এসব কথা ধরে নিয়েই দর্শন শুরু করেছেন। তার ফলে বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা সহজাত ধারণার[১] অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। তাঁরা মনে করেন, মানুষ জন্মাবার সময়েই কতগুলো ধারণা নিযে জন্মায়। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকেরা সহজাত ধারণা বলে কিছুই নেই এমন সিদ্ধান্তেই এসে পৌছেছেন। পরস্পরবিরোধী এই দু'টো সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন্‌টা ঠিক তা ত জ্ঞান-প্রক্রিযার যুক্তিসিদ্ধ বিচার না করলে জানাই যাবে না। সুতরাং নির্বিচারবাদী দাশনিকদের সিদ্ধান্ত নির্বিচারে গ্রহণ করা কখনই সম্ভব নয, কারণ পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত তাঁদের দশনে আমবা হামেশাই দেখতে পাই।

বিশেষতঃ জ্ঞানেব স্বরূপ সম্বন্ধে যদি সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে তবে কোন্ জ্ঞান সত্য আর কোন্‌টা জ্ঞানাভাস মাত্র তাও বোঝা যাবে না।

সবশেষে নির্বিচারে যে তত্ত্বকে চরম বলে গ্রহণ করা যায তাই যে চরম তা ত বিচার না করে নির্ণয করা যায না। আর তা যদি নির্ণয করা না যায় তবে নির্বিচারে গৃহীত দাশনিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সংশয আমাদের চিরকালই থেকে যাবে।

সংশয়বাদ (Scepticism)

নির্বিচাববাদী দার্শনিকেরা পরস্পর-বিবোধী সিদ্ধান্তে এসে পৌছান। এই রকম ধরণের পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের ফলে মানুষ প্রকৃত সত্যের রূপ জানতে না পেরে হতাশ হযে পড়ে। কখনও কখনও বা যা সত্য তা আবার মিথ্যাও হতে পাবে—এমন ধরণের অদ্ভুত ধারণার সৃষ্টি হয। এই রকম ভাবে নির্বিচারবাদের ত্রুটিবহুল সিদ্ধান্তের ফলে সংশযবাদের উদ্ভব হ'যে থাকে।

বিশ্বের চরম তত্ত্বের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনরূপ নিশ্চিত জ্ঞান সম্ভব নয, আর সমস্ত ধারণাই সন্দেহের বিষয—এই মতবাদেব নামই সংশযবাদ।

প্রাচীন গ্রীস দেশে সোফিস্টস্ নামে একদল সংশযবাদী দাশনিকের উদ্ভব হযেছিল। একই বিষযে পরস্পরবিরুদ্ধ ধাবণার অস্তিত্ব দেখে সোফিস্টরা, সর্বজন-গ্রাহ্য কোন সত্যই নাই—এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হযেছিলেন। তাঁরা বলতেন —'মানুষই সর্ববস্তুর নিযামক'।[২] একই জিনিস কারও কাছে সত্য, কারও কাছে মিথ্যা, কারও কাছে সুন্দর, কারও কাছে কুৎসিত; আবার কারও কাছে ভালো ও কারও কাছে মন্দ হতে পারে। যার কাছে যে বস্তু যেমন তার কাছে সে বস্তু তেমনি।

১। Innate Ideas
২। Man is the measure of everything

আধুনিক কালের দর্শনে ডেকার্টে এক ধরণের সংশয়বাদ পোষণ করেন। যা কিছু সংশয় করা যায় তাই পরিত্যাগ করা উচিত—এই তাঁর উপদেশ। দর্শনের ইতিহাসে ডেকার্টের এই মতবাদ 'পদ্ধতিগত সংশয়বাদ' নামে পরিচিত। তিনি সমস্ত কিছু সংশয় করে করে সংশয়াত্মাকে নিঃসংশয় তত্ত্ব বলে স্বীকার করেছেন। তিনি মনে করেন, সংশয় করতে গেলেই সংশয়াত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়, কারণ সংশয় করার কর্তা সংশয়াত্মা না থাকলে সংশয় করাই সম্ভব নয়। ডেকার্টে এই নিঃসংশয় তত্ত্ব থেকেই অন্য সমস্ত সিদ্ধান্ত টেনে এনেছেন এবং এমনি করেই তাঁর বিশিষ্ট দার্শনিক-চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে। তাঁর দর্শনে, সন্দেহ করার জন্যই সন্দেহ করা হয়নি। সন্দেহ করে করে নিঃসন্দিগ্ধকে পাওয়া যাবে—এই আশা নিয়েই সন্দেহ করা হয়েছে।

আধুনিক কালের দর্শনে আর একজন শক্তিমান সংশয়বাদী দার্শনিকের দেখা পাওয়া যায়। তিনি হচ্ছেন ব্রিটিশ দার্শনিক ডেভিড্ হিউম। তিনি মনে করেন, অভিজ্ঞতাই জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ। অভিজ্ঞতায় যা পাওয়া যায় না তা মানবার কোন অধিকার যুক্তিবাদী মানুষের নেই। আত্মা, ঈশ্বর, বস্তুর প্রকাশ্য গুণাতিরিক্ত বস্তুত্ব নামে কোন পৃথক্ সত্তা—কিছুই অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। সুতরাং এদের অস্তিত্ব স্বীকার করারও কোন অর্থ হয় না।

সমালোচনা ঃ—নির্বিচারবাদ ও সংশয়বাদ এক হিসেবে সমপর্যায়ভুক্ত। নির্বিচারবাদ নির্বিচারে জ্ঞানের সম্ভাবনা মেনে নেয় আর সংশয়বাদ নির্বিচারে জ্ঞানের অসম্ভাব্যতা স্বীকার করে। নির্বিচারবাদ মানুষের জ্ঞানের মধ্যে কোন সীমারেখা টানে না, সংশয়বাদ মতে মানুষের অজ্ঞতার কোন সীমা নেই মানুষ এই নেতিবাচক চিন্তাপদ্ধতিতে বেশী দিন তৃপ্ত থাকতে পারে না। বিশেষতঃ, সম্পূর্ণ নেতিবাচক চিন্তাপদ্ধতি সম্ভবও নয়। যদি কেউ বলেন—বস্তুস্বরূপ জানা যায় না,—বস্তুপ্রকাশ মাত্রই জানা যায়, তবে বস্তুস্বরূপের সামান্য জ্ঞান নিশ্চয়ই তিনি দাবী করেন, কারণ বস্তুপ্রকাশ ও বস্তুস্বরূপ আলাদা করতে গেলে বস্তুস্বরূপের কিছু না কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। সুতরাং সংশয়বাদের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন স্ব-বিরোধিতা (self-contradiction) রয়েছে।

বিচারবাদ (Criticism):

নির্বিচারবাদ ও সংশয়বাদের দ্বন্দ্ব বিচারবাদের সৃষ্টি করেছে। নির্বিচারবাদ অনুসারে তাত্ত্বিক জ্ঞান সম্ভব, আর সংশয়বাদীদের ধারণা—তাত্ত্বিক জ্ঞান

১। Methodological Scepticism

সম্ভব নয়। এখন এদের মতামতের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য জ্ঞানের সীমা, প্রাগুপকরণ প্রভৃতির সুস্পষ্ট জ্ঞান একান্তভাবেই প্রয়োজন। কতটুকু জানা যায় তা জানলেই তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব কিনা তা জানা যাবে। সুতরাং জার্মান দার্শনিক কাণ্ট নির্বিচারবাদ ও সংশয়বাদের দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য জ্ঞানের প্রাগুপকরণ প্রভৃতির সন্ধান শুরু করেন। দর্শনের ইতিহাসে কাণ্টের পদ্ধতির নামই বিচারবাদ।

কাণ্ট দেখাতে চেষ্টা করলেন যে, ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রত্যক্ষ ও বুদ্ধি দুই-ই জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন। জ্ঞানের দুই দিক—একটা তার বিষয়,আর একটা তার আকার। কাণ্টের মতে জ্ঞানেব বিষয় আমরা ইন্দ্রিযলব্ধ প্রত্যক্ষ থেকে পাই, আর তার আকার বুদ্ধিই দিয়ে থাকে। বিষয় আর আকার—এ দু'টো ছাড়া জ্ঞান হয় না। সুতরাং জ্ঞানোৎপত্তির জন্য ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রত্যক্ষ ও বুদ্ধি উভয়ই অপরিহার্য।

অতীন্দ্রিয় বিষয কখনই ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রত্যক্ষের বিষয় হ'তে পারে না। সুতরাং অতীন্দ্রিয় বিষয় জ্ঞানেরও বিষয় নয়।

বিচারবাদও সংশযবাদের মতই অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান-সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভবগম্য বস্তু সম্পর্কে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নাই—একথা বিচারবাদী দার্শনিক জোর গলায়ই বলেন।

সমালোচনা :—এই বিচারবাদের মূল কথা—জ্ঞানের প্রাগুপকরণ, জ্ঞানের সীমা, জ্ঞানের প্রকৃতি—এসব আলোচনা ক'রেই দার্শনিক আলোচনা শুরু করা উচিত। এ বিষযে আধুনিক কালের দার্শনিকদের মধ্যে মোটামুটি মতৈক্য আছে। কিন্তু বিচাববাদী দার্শনিক কাণ্ট যে বলেছেন অতীন্দ্রিয় বিষয় জানা যায় না—এ বিষয়ে অনেকেই তাঁর সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেন। হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকেরা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান সম্ভব বলেই অভিমত জানিয়ে দিয়েছেন।

দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি (Dialectical Method)

ডায়ালেক্‌টিক শব্দের সাধারণ অর্থ কোন বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা। কখনও কখনও কথোপকথন অর্থেও এই শব্দের ব্যবহার হয়। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ভাবাত্মক (Positive) ও নেতিবাচক (Negative)—দুরকমই হ'তে পারে। দর্শনের ইতিহাসে আমরা হেগেলকে প্রথম অর্থে আর কাণ্ট ও সক্রেটিসকে দ্বিতীয় অর্থে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখি।

নেতিবাচক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে খণ্ডনরীতিও বলা যেতে পারে। সক্রেটিস এই পদ্ধতি অনুসরণ করে সোফিস্টদের মতবাদ খণ্ডন করতেন। তিনি কথোপকথনের

মধ্য দিয়ে বিরোধী মতের অন্তর্বিরোধ প্রমাণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। দর্শনের ইতিহাসে এই পদ্ধতি সক্রেটিক পদ্ধতি নামে পরিচিত। কাণ্ট জগৎ, আত্মা ও ঈশ্বরের ধারণার মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখানর জন্য এই পদ্ধতিরই অনুবর্তন করেছিলেন।

জার্মান দার্শনিক হেগেল ভাবাত্মক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রবর্তক। তাঁর মতে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি আশ্রয় করেই চরম সত্যলাভ করা যায়। পরস্পরবিরোধী ধারণাগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার নামই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া। বাদ (Thesis), প্রতিবাদ (Anti-thesis) ও সম্বাদ (Synthesis)—এই তিন মিলেই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ত্রয়ী (triad) রচিত হয়েছে। কিন্তু সমন্বয়ে এসে গেলেই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার গতি রুদ্ধ হ'য়ে যায় না। প্রথম বারের সমন্বয় আবার দ্বিতীয় বারে বাদ আকারে দেখা দেয়। এই বাদের আবার প্রতিবাদ সৃষ্টি হয়। এইভাবে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া চরমতত্ত্ব অদ্বয় চিন্তা বা ব্রহ্মে (Absolute Thought) না পৌছান পর্যন্ত চলতেই থাকে।

সাধারণতঃ লোকের ধারণা যে দুটো বিপরীত মতের মধ্যে একটাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। হেগেল এসে সাধারণ লোকের এই ধারণা বদলে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে বিরোধ সমন্বয়েরই পূর্বাভাস মাত্র। 'দ্বন্দ্ব' শব্দে বিরোধ ও মিলন দুই-ই আমরা বুঝে থাকি। সুতরাং ডায়ালেকটিক শব্দের নিহিতার্থ দ্বন্দ্ব শব্দের মধ্য দিয়েই সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয়।

হেগেল মনে করেন—জ্ঞান ও জ্ঞেয়বস্তু উভয়েই স্ব-প্রকাশ চিন্তার (Self-conscious Absolute Thought) বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। হেগেলীয় দর্শনে এই স্ব-প্রকাশ শুদ্ধ চিন্তাই চরম তত্ত্ব ও সত্য। এই তত্ত্ব বিভিন্ন নিম্নতর স্তরের মধ্য দিয়ে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে হতে পরিপূর্ণ পরিপূর্তি লাভ করে। যেহেতু জ্ঞান ও জ্ঞেয়বস্তু উভয়েই চরমতত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, সেজন্য জ্ঞান ও জ্ঞেয়বস্তুও এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি মেনে চলে।

দর্শনের ইতিহাস আলোচনায় হেগেল এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ করেছেন। বিভিন্ন বিরোধী দার্শনিক মতবাদের সমন্বয় কী করে সুষ্ঠুতর ও উন্নততর দার্শনিক মতবাদ গড়ে ওঠে—হেগেল তা দর্শনের ইতিহাস থেকে নানা উদাহরণ দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

সমালোচনা :—বিরুদ্ধ ধারণার সমন্বয়ে অনেক সময় উন্নততর ধারণা লাভ করা যায়—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্বত্রই ও সর্বক্ষেত্রে বিরুদ্ধ ধারণার

সমন্বয় সম্ভব কিনা তা ভেবে দেখতে হবে। অধ্যাত্মবাদীদের মতে অধ্যাত্মতত্ত্বই চরম সত্য আর জড়বাদীদের মতে জড় বস্তুই চরম সত্য। প্রথম দলের ধারণা, জড় বস্তু অধ্যাত্ম তত্ত্বেরই প্রচ্ছন্ন রূপ মাত্র, আর দ্বিতীয় দলের মতে আত্মা প্রভৃতি অধ্যাত্ম-তত্ত্ব জড় বস্তুর প্রকারভেদ মাত্র। এই দুই বিরুদ্ধ মতবাদের কোন যুক্তিগ্রাহ্য সমন্বয় সম্ভব বলে আমাদের মনে হয় না।

সিদ্ধান্ত ঃ—দার্শনিক আলোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি বিচার করে দেখা গেল। কোনটাই যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হচ্ছে না। সর্বশেষে আমরা বুদ্ধি ও বোধির[১] দ্বন্দ্ব আলোচনা করে আদর্শ দাশনিক বিচার-পদ্ধতি কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে আমাদের মতামত দেবার চেষ্টা করব।

দর্শনের ইতিহাসে বুদ্ধি ও বোধির দ্বন্দ্ব বহুকাল ধরে চলে এসেছে। একদল দাশনিক মনে করেন, বুদ্ধি দিয়ে দার্শনিক আলোচনার সর্বশেষ বস্তু চরম তত্ত্ব জানা যায়। এঁদের নাম বুদ্ধিবাদী দার্শনিক। আর একদল দার্শনিক আছেন যাদের মতে চরম তত্ত্ব বুদ্ধির নাগালের বাইরে। বোধির গভীর প্রশান্তিতে চরম তত্ত্বের প্রতীতি হয় এই তাঁদের ধারণা। এই দুই দলের বক্তব্য একটু বিশদভাবে আলোচনা করে দেখা যাক্।

হার্বার্ট স্পেন্সার মনে করেন, বিভিন্ন বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রগুলোর সমন্বয় সাধন করে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক ধারণা গ্রহণ করাই দার্শনিকের কাজ। বিজ্ঞানী অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন কল্পনা (hypothesis) করে থাকেন। আবার সেই কল্পনার সত্যতা অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়েই নির্ণয় করা বিজ্ঞানীর কাজ। বিজ্ঞানালোচনার এই বিভিন্ন পদক্ষেপে যুক্তিতর্ক বিচার-বিশ্লেষণই মুখ্যস্থান গ্রহণ করে থাকে। দর্শন যেহেতু বিজ্ঞানেরই উন্নততর স্তর মাত্র, সুতরাং বিজ্ঞানের যুক্তি-তর্ক বিচার-বিশ্লেষণ, অভিজ্ঞতা ও কল্পনাত্মক পদ্ধতিই দর্শনের আলোচনা-পদ্ধতি হবে। দার্শনিক বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সারের এই মত।

হেগেল প্রভৃতি বুদ্ধিবাদী দার্শনিকের মতে চরম তত্ত্ব মানুষের বুদ্ধিগ্রাহ্য। সুতরাং চরমতত্ত্ব মানতে গেলে বুদ্ধিই মানুষের একমাত্র সহায় হবে।

দার্শনিক বার্গসঁ দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে চরম তত্ত্ব বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। সুতরাং বুদ্ধিবাদ কখনই দার্শনিক বিচার-পদ্ধতি হতে পারে না। বার্গসঁর মতে চরম তত্ত্ব স্থিতিশীল

১। Intellect and Intuition

নয়, গতিশীল। তিনি প্রাণ-প্রবাহ (Elan vital)-কে চরম তত্ত্ব বলে মনে করেন। সেই প্রাণ-প্রবাহ অখণ্ড ও অবিভাজ্য। কখনও কখনও তিনি এই প্রাণ-প্রবাহকে নিত্যবহমান কালপ্রবাহ বলেও অভিহিত করেছেন। কালপ্রবাহ কখনও রুদ্ধ হয় না, অবিরাম বয়েই চলে। বার্গসঁর মতে অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ এমন করে কালকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় না। কালপ্রবাহে কোথায়ও ছেদ নেই, বিরাম নেই। এখানে অতীত বর্তমানে এসেই আবার ভবিষ্যতের পানে ছুটে চলেছে। অবিশ্রান্ত চলাই হচ্ছে এই প্রাণ-প্রবাহের বাণী সুতরাং গতি আর চলাই হচ্ছে নিখিল বিশ্বের চিরন্তন সত্য।

বার্গসঁ মনে করেন, বুদ্ধি দিয়ে এই সত্যকে কখনই ধরা যায় না। বুদ্ধি দিয়ে আমরা যে জ্ঞান পাই তা বিধান বা বচনাত্মক (Judgmental)। বচন ছাড়া বুদ্ধি দিয়ে কোন জ্ঞানই হতে পাবে না। প্রত্যেক বচনেরই দুটো অংশ থাকে—উদ্দেশ্য ও বিধেয়। 'রাম ভাল ছেলে' একটি বচন। এখানে 'রাম' উদ্দেশ্য, আর 'ভাল ছেলে' বিধেয়। বুদ্ধি দিয়ে যে জ্ঞানই হোক্ না কেন তা উদ্দেশ্য-বিধেয়াত্মক হবে। অর্থাৎ বুদ্ধি দিয়ে জ্ঞান লাভ কবতে গেলেই উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের বিভেদ সৃষ্টি করতে হবে। আমরা আগেই দেখেছি, বার্গসঁর মতে চরম সত্তা অবিভাজ্য। সুতরাং এই চরম সত্তায় বিভেদ সম্ভব নয়। তাই বুদ্ধি দিয়ে এই চরম সত্তা কখনই জানা যাবে না।

দ্বিতীয়তঃ—প্রত্যেক বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় দুই-ই সামান্য ধারণা (Concepts)। বিভিন্ন বস্তু দেখেই আমরা তাদের সম্বন্ধে একটা সামান্য ধারণা করে থাকি। 'মানুষ' একটা সামান্য ধারণা। এই ধারণায় বিভিন্ন মানুষের বৈচিত্র্যের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অর্থাৎ বিভিন্ন মানুষের জীবনের কোন স্পর্শ 'মানুষ' এই শুদ্ধ ধারণায় নাই। সুতরাং সামান্য ধারণা কোন কিছুরই প্রাণের পরিচয় দিতে পারে না। আমরা দেখেছি, বুদ্ধি দিয়ে যে জ্ঞান হয় তা বচন ছাড়া হ না, আবার বচন সামান্য ধারণার যোগফল মাত্র। সুতরাং বুদ্ধি দিয়ে যে জ্ঞান হয় তাতে সত্তার প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ—গতিশীল কোন বস্তুকেই গতিশীল হিসেবে বুদ্ধি জানতে পারে না। বুদ্ধি যখনই কোন বস্তু জানে তখন তা স্থিতিশীল হয়ে যায়। বার্গসঁর মতে চরম তত্ত্ব গতিশীল। বুদ্ধি কখনও এই গতিশীল তত্ত্বকে জানতে পারে না।

যেহেতু বুদ্ধি দিয়ে গতিশীল চরম তত্ত্ব জানা যায় না সেজন্য বার্গসঁ তত্ত্ব-জ্ঞানের জন্য নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে একমাত্র বোধিতে এই তত্ত্বের প্রকাশ পরিপূর্ণ ও ভ্রমশূন্য হয়। বোধি বলতে তিনি একরকমের বুদ্ধিসঞ্জাত সমবেদনা (intellectual sympathy) বোঝেন। বোধি দিয়ে চরম সত্তার অন্তরে প্রবেশ করে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার মহিমা উপলব্ধি করা যায়। বোধি অনেকটা অনুভূতির ব্যাপার। এই অনুভূতি দিয়েই জ্ঞাতা প্রাণ-প্রবাহের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার অন্তরের পরিচয় পেতে পাবে।

বার্গসঁর এই বোধিবাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি **আপত্তি** উত্থাপন করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ—বোধি বা অনুভূতি ব্যক্তিগত ব্যাপার। বিভিন্ন লোক বোধি থেকে বিভিন্ন জ্ঞান লাভ করতে পারে। এই সব জ্ঞানের সত্যাসত্য নির্ণয় বোধি দ্বারা সম্ভব নয়। বুদ্ধি দিয়েই আমরা এদের গুণাগুণ বিচার করতে পারি। সুতরাং শুধু বোধি আমাদের যুক্তিবাদী মনের তৃপ্তি দিতে পারে না। বিশেষতঃ বোধিবাদ যদি দাশনিক আলোচনার পদ্ধতি হয় তবে দর্শনশাস্ত্র কখনই সকলের আলোচনার বিষয় হতে পারে না। যেহেতু বোধি ব্যক্তিগত ব্যাপার সেজন্য সকলে এই ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কী করে আলোচনা করবে?

দ্বিতীয়তঃ—বোধিতে যা জানা গেল তা যদি ভাষায় প্রকাশ না করা হয় তবে ত কোন দার্শনিক আলোচনাই হতে পারে না। জ্ঞান ভাষায় প্রকাশ করতে গেলেই বচনের আশ্রয় নিতে হয়। বচনের আশ্রয় নিয়ে যে জ্ঞান হয় তা বুদ্ধিজাত জ্ঞান। সুতরাং বুদ্ধির সাহায্য না নিলে কোন দার্শনিক আলোচনাই সম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ—বোধিবাদ যদি দাশনিক আলোচনার পদ্ধতি হয় তবে বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের কোন সম্পর্কই থাকবে না। বিজ্ঞান বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপার। দার্শনিক আলোচনা যদি বুদ্ধি দিয়ে না-ই চলে তবে বিজ্ঞানের সঙ্গে তার আর কী সম্পর্ক থাকবে? কিন্তু আমরা জানি, বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ক অতি নিবিড়। সুতরাং এই বোধিবাদ দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি হতে পারে না।

বোধিবাদ দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি না হলেও দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতিতে বোধির স্থান আছে। বোধি বলতে যদি আমরা কল্পনাত্মক অন্তর্দৃষ্টি (imaginative insight) বুঝি তবে দার্শনিক আলোচনার গোড়াতেই এই বোধির দরকার। সত্য প্রথম অন্তর্দৃষ্টিতেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পরে দার্শনিক

যুক্তিতর্ক দিয়ে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। বিজ্ঞানের সমস্ত বড় বড় আবিষ্কারের পেছনেই প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের অন্তর্দৃষ্টির খেলা দেখতে পাওয়া যায়। অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে আপেল ফল পডতে দেখে নিউটন আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কাব করতে পারতেন না। আপেল ফল মাটিতে ত চিরকালই পড়ে। কিন্তু সকলেরই মনে এতে ত কোন প্রশ্ন জাগে না। আব এই সাধারণ ঘটনার পেছনে কোন সত্যের পরিচয়ও ত সাধারণ লোক পায় না। বিশেষ বিশেষ লোকের অন্তর্দৃষ্টিতেই সাধারণ বস্তুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন সত্য ভাস্বর হয়ে ওঠে। দাশনিক জগৎ ও জীবনে নিহিত চরম তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। কোন একটি বিশেষ ক্ষণের প্রশান্ত গভীরতাতেই দার্শনিকের অন্তর্দৃষ্টিতে এই তত্ত্বের রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে। পরে দার্শনিক যুক্তিতর্ক বিচার-বিশ্লেষণ করে এই তত্ত্বের সর্বজনবোধ্য একটা রূপ দিতে পারেন। সুতরাং দার্শনিক পদ্ধতিতে বুদ্ধি ও বোধি উভয়েরই স্থান আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বচন ও অনুমান

(Judgment and Inference)

দর্শন মূলতঃ চিন্তার ব্যাপার। যুক্তিতর্ক বিচার-বিশ্লেষণ করে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আমাদের যে সমস্ত ধারণা আছে তাদের সত্যাসত্য নির্ণয়ই দার্শনিকের কাজ। বচন ছাড়া চিন্তাই করা যায় না। চিন্তার অনুমানেরও যথেষ্ট প্রাধান্য আছে। সুতরাং দর্শনে বচন ও অনুমান নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। আমরা এই অধ্যায়ে সে আলোচনাই করব।

বচন ও বাক্য

(Judgment and Sentence)

যে শব্দ বা শব্দসমষ্টির সাহায্যে মনের ভাব পরিষ্কার করে প্রকাশ করা যায় তারই নাম বাক্য। ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে একটি বাক্যের দু'টি অংশ থাকে—উদ্দেশ্য আর বিধেয়। যার সম্বন্ধে বাক্যে কিছু বলা হয় তার নাম উদ্দেশ্য আর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তার নাম বিধেয়। 'অসিত দার্জিলিং বেড়াতে গেছে'—এই বাক্যে 'অসিত' উদ্দেশ্য আর 'দার্জিলিং বেড়াতে গেছে' বিধেয়।

তর্কবিজ্ঞানের বচনের কিন্তু তিনটি অংশ থাকে। এই তিন অংশের তাৎপর্য বুঝতে গেলে বচনের প্রকৃতি জানা দরকার। আমরা বাক্য নানাভাবেই ব্যবহার করি। কোন কিছু সম্বন্ধে বলতে গেলে, কোন প্রশ্ন করতে গেলে, কোন বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করলে, কাউকে আদেশ করতে গেলে অথবা বিস্ময় প্রকাশ করতে হলে আমরা বাক্যের সাহায্য গ্রহণ করি। এই সমস্ত বাক্যকেই তর্কবিজ্ঞানে বচন বলে না। একমাত্র কোন কিছু সম্বন্ধে বলতে হলে আমরা যে বাক্য ব্যবহার করি তার নাম বচন। 'যদু ভাল ছেলে' এটি বাক্য ও বচন উভয়ই বটে। এখানে যদু সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। কিন্তু যদি বলা হয়—'যদু, এ কাজটা কর'—তবে এটা বাক্য হবে বটে, কিন্তু বচন হবে না। এখানে আদেশ করা হয়েছে, কিন্তু কোন কিছু সম্বন্ধে কোন ঘোষণা (assertion) করা হয় নি। কোন কিছু সম্বন্ধে ঘোষণা করলেই বচন হয়, অন্যত্র নয়। বচনে উদ্দেশ্য ও

বিধেয়াংশ ছাড়াও একটি সংযোজক (copula) থাকে। এই সংযোজকই বচনের তৃতীয়াংশ। 'যদু ভাল ছেলে' এই বচনে 'যদু' উদ্দেশ্য, 'ভাল ছেলে' বিধেয়, আর 'হয়' (অনুক্ত) সংযোজক। সাধারণতঃ বচনের সংযোজকে 'হয়' 'আছে' বা এই জাতীয় অস্তিত্ববাচক ক্রিয়াপদের[১] বর্তমান কালের রূপ ব্যবহৃত হয়। সংযোজক কখনও অতীত বা ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। শুধু তাই নয়। করা, খাওয়া, যাওয়া—এই জাতীয় কোন ক্রিয়াপদই সংযোজকের কাজ কবতে পারে না। সংযোজক সব সময়েই অস্তিত্ববাচক ক্রিয়াপদের (verb 'to be') বর্তমান কালের কোন না কোন রূপ হবে।[২]

অতীত বা ভবিষ্যৎ কালের কোন ঘোষণা তর্ক-বিজ্ঞানের বচনাকারে প্রকাশ কবতে হলে তা বর্তমান কালের ক্রিয়া সংযোগে প্রকাশ করতে হয়। উদাহরণ দিলে কথাটা আরও ভাল করে বোঝা যেতে পাবে। 'দশরথ অযোধ্যার রাজা ছিলেন'—এই বাক্য তর্ক-বিজ্ঞানের বচনাকাবে প্রকাশ করতে হলে বলতে হবে—'দশরথ হন একজন ব্যক্তি যিনি অযোধ্যাব বাজা ছিলেন।' এখানে 'হন' এই বর্তমান কালের ক্রিয়া সংযোগেই 'দশবথ অযোধ্যাব রাজা ছিলেন' এই বাক্যকে বচনাকারে প্রকাশ করা যেতে পারে। অন্য আর একটি উদাহরণ দিয়ে ভবিষ্যৎকালের ঘোষণার বচনের রূপ দেখান যেতে পারে। 'শীঘ্রই বৃষ্টি হবে'—ভবিষ্যৎকালের ঘোষণাসূচক একটি বাক্য। একে বচনে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হবে—'বৃষ্টি হয় এমন জিনিস যা শীঘ্র হবে'। এখানে 'হয়' এই বর্তমান কালের ক্রিয়া সংযোগ ঘটিয়েছে।

কোন বাক্যে যদি অস্তিত্ববাচক ক্রিয়াপদ ছাডা অন্য কোন ক্রিয়াপদ থাকে, তবে তা বচনাকাবে প্রকাশের সময় অস্তিত্ববাচক ক্রিয়া সংযোগে প্রকাশ করতে হয়। উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। 'যদু যায়'—এই বাক্য একটি

১। Verb 'To be'

২। আমরা এখানে বচনের প্রকৃতি তর্কবিজ্ঞানী অ্যারিস্টটল-নির্দিষ্ট পথে নির্ণয় করেছি। আধুনিক কালে অনেক তর্কবিজ্ঞানী সমস্ত বচনের ক্ষেত্রেই সংযোজকের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। জনসন, স্টেব্লিং, মেলন প্রভৃতি এই দলের লোক। তাঁরা বলেন,

যেখানে দ্রব্যের সঙ্গে গুণের সংযোগ প্রকাশ করা হয় বা কোন একটি শ্রেণীকে বৃহত্তর শ্রেণীর অন্তর্গত করা হয় সেখানেই সংযোজকের প্রয়োজনীয়তা, অন্যত্র সংযোজক নিষ্প্রয়োজন। 'তিনি আমাকে বই দিয়েছেন' বাক্যটিকে 'তিনি হন একজন ব্যক্তি যিনি আমাকে বই দিয়েছেন' এইরূপ বচনে রূপান্তর অনাবশ্যক এবং অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

ঘোষণা প্রকাশ করে। কিন্তু ঘোষণা প্রকাশ করে বলেই একে এই অবস্থায় বচন বলা যাবে না। 'যদু যায়'—এই বাক্যকে বচনাকারে প্রকাশ করতে হলে বলতে হবে—'যদু হয় একটি বালক বা মানুষ যে যায়'। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, যে ভাবেই হোক্ না কেন প্রত্যেক বচনেই অস্তিত্ববাচক ক্রিয়াপদের বর্তমান কালের রূপ সংযোজক হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। যদি তা না করা হয়, তবে কোন বচন হবে না।

ওপবের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে বচনকে আমরা ঘোষকবাক্য বলতে পাবি। কারণ, বচনে সর্বত্র কোন না কোন বিষয়ে ঘোষণাই থাকে। ঘোষণা কোন কিছুর অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব দুই-ই বোঝাতে পাবে। আমরা যখন বলি 'ফুলটি লাল' তখন বচনটি ফুলে লালিমাব অস্তিত্বই প্রকাশ করে। আবার যখন বলি 'আমটি মিষ্টি নয়' তখন বচনটি আমে মিষ্টতার অভাবই বোঝায়।

বচন ও বাক্যেব পার্থক্য প্রসঙ্গে আবও কয়েকটি কথা খুবই লক্ষণীয়। বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় শব্দ বা শব্দসমষ্টি। এই শব্দ বা শব্দসমষ্টির কোন বিশেষ নাম নেই। কিন্তু বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় যে শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি তার বিশেষ নাম আছে। এদের পদ (Term) বলে। বাক্যের ক্ষেত্রে মুখ্যপ্রশ্ন—বাক্যটি ব্যাকরণসম্মত, না, ব্যাকরণসম্মত নয় ? কিন্তু, বচনের ক্ষেত্রে মুখ্যপ্রশ্ন—বচনটি কি সত্য না মিথ্যা ? বাক্যের ক্ষেত্রে সত্য মিথ্যার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ, বাক্য প্রশ্ন, আদেশ, বিস্ময়, ইচ্ছা প্রভৃতি অনেক কিছুই প্রকাশ করে; কিন্তু প্রশ্নজ্ঞাপক, আদেশসূচক, বিস্ময়প্রকাশক বা ইচ্ছাজ্ঞাপক বাক্যকে সত্য বা মিথ্যা বলার কোন প্রসঙ্গই নেই। 'রাম কি ভাল ছেলে?' এই বাক্যটিকে সত্য, বা মিথ্যা কিছুই বলা যায় না। তবে এই বাক্য ব্যাকরণের নিয়ম মেনেছে কি মানেনি, এই প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই করা যায়। একমাত্র ঘোষকবাক্য অর্থাৎ বচনের ক্ষেত্রেই সত্য বা মিথ্যার প্রশ্ন উঠতে পারে। আমরা যখন বলি—'রাম ভাল ছেলে', তখনই এই বাক্যটি সত্য না মিথ্যা এই প্রশ্ন সঙ্গতভাবে ওঠে। কারণ, রাম বস্তুতঃ ভাল ছেলে হ'তেও পারে আবার নাও পারে। যদি সে বস্তুতঃই ভাল ছেলে হয়, তবে বচনটি সত্য, আর যদি সে বস্তুতঃ ভাল ছেলে না হয়, তবে বচনটি মিথ্যা।

বচনই জ্ঞানের একক

(Judgment is the unit of Knowledge.)

জার্মান দার্শনিক কান্টের মতে বচন জ্ঞানের একক।

সামান্যতম জ্ঞান হতে গেলেই বচনের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কথাটা ভেবে দেখা যাক্।

জ্ঞান মানেই কোন না কোন বিষয়ের জ্ঞান। সাধারণতঃ বিষয় ছাড়া কোন জ্ঞানই হয় না। আবার বিষয়ের জ্ঞান বলতে বোঝায় বিষয় সম্বন্ধে সচেতনতা। কোন বিষয় সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার মানেই বিষয়টি এমন বা বিষয়টি এমন নয়, এই বোধ লাভ করা। এই বোধ ত আসলে বচনেরই বোধ। কারণ, কোন বিষয় এমন বা এমন নয় একমাত্র বচনই বোঝাতে পারে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, বচন ছাড়া অর্থাৎ বিষয়টি এমন বা এমন নয় এই বোধ ছাড়া জ্ঞান হ'তেই পারে না। অর্থাৎ বচনকেই জ্ঞানের একক বলতে হয়।

অনেকে বলেন, জ্ঞান সত্য বা মিথ্যা একটা কিছু হবেই। অর্থাৎ সত্যও নয় আবার মিথ্যাও নয় এমন জ্ঞান হতেই পারে না। আবার সত্য বা মিথ্যা এই বিশ্লেষণ একমাত্র বচন সম্পর্কেই সার্থক ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলে সেই শব্দ সত্য না মিথ্যা এই প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু, যখন কোন কিছু এমন বা এমন নয় বলা হয়, অর্থাৎ বচন ব্যবহার করা হয় তখন তা সত্য না মিথ্যা এই প্রশ্ন সঙ্গত ভাবেই ওঠে। এই দিক থেকে বিচার করলেও বচনকেই জ্ঞানের একক বা বচনই জ্ঞান, একথা মানতে হয়।

কোন কোন দার্শনিক প্রাক্-বাচনিক জ্ঞান বা Pre-judgmental knowledge স্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেন, বচন ছাড়াও এমন এক প্রকার জ্ঞান সম্ভব যেখানে উদ্দেশ্য-বিধেয়ের তফাৎ নেই। এই জ্ঞান বোধি বা intuition পর্যায়ভুক্ত। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বোধি-প্রকৃতির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়েছি। আমাদের মনে হয়, বোধি কোন জ্ঞান নয়। কারণ, বোধি বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকমের। সার্বজনীন বোধি সাধারণতঃ হয় না। জ্ঞান সার্বজনীন। সুতরাং প্রাক্-বাচনিক জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। বলেই যে জ্ঞানের একক, একথা অন্যভাবেই বোঝান যায়

মানুষের জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকাশ নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তবে দেখব প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা, সামান্য ধারণা, বচন আর অনুমান[১] ছাড়া কোন জ্ঞান হতে পারে না। জ্ঞানের এই প্রক্রিয়াগুলি যদি আবার আলোচনা করি তবে বোঝা যাবে বচন ছাড়া কোন প্রক্রিয়াই হয় না। সুতরাং বচনকেই জ্ঞানের একক বলতে হয়। আমরা এখন জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকার[২] আলোচনা করে একথার সত্যতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করব।

(ক) বচন ও প্রত্যক্ষ (Judgment and Perception)

বিভিন্ন ইন্দ্রিযের মধ্য দিযে বহির্বিশ্ব থেকে আমরা সংবেদন[৩] লাভ করি। শুধু সংবেদন কোন জ্ঞান দিতে পারে না। কারণ সংবেদনে আমাদের ইন্দ্রিয সংক্ষুব্ধ হয বটে, কিন্তু সংবেদ্য বস্তু সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা হয না। সংবেদ্য বস্তুব সামান্যতম ধারণা মনে উৎপন্ন হওযার সঙ্গে সঙ্গেই সংবেদন প্রত্যক্ষের আকাব ধারণ করে। কলেজে যখন ঘণ্টা বাজে, তখন আমাদের কর্ণেন্দ্রিয় প্রথম সংক্ষুব্ধ হয, কিছু একটা আছে এমন মনে হয। তারপর যখন বুঝি যে ঘণ্টা বাজলো, তখন সংবেদন প্রত্যক্ষে পরিণত হযে গেল। এরকম করে প্রত্যক্ষে সংবেদনের প্রকৃতি সম্বন্ধে সবদাই কিছু না কিছু বলা হয। সুতরাং প্রত্যক্ষের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঘোষণা থাকে। আগেই বলেছি, কোন কিছু সম্বন্ধে ঘোষণা থাকলেই বচন হয। সুতবাং বচন ছাড়া প্রত্যক্ষ হয না।

(খ) বচন ও স্মৃতি (Judgment and Memory)

স্মৃতি প্রত্যক্ষেবই পুনর্ভাবনা মাত্র। আজ আকাশের চাঁদ দেখা গেল। এটা আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান। দশ দিন বাদে আমবা এই প্রত্যক্ষীকৃত চাঁদের কথা আবার ভাবতে পারি। তখন তার নাম হবে স্মৃতি। আগেই দেখেছি, বচন ছাড়া প্রত্যক্ষ হয না। স্মৃতি যদি প্রত্যক্ষের পুনর্ভাবনামাত্র হয, তবে বচন ছাড়া যে স্মৃতিও হবে না তা সহজেই বোঝা যায়।

(গ) বচন ও কল্পনা (Judgment and Imagination)

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমযে প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুর একত্র সমাবেশ করে নূতন কিছু সৃষ্ট কবার নাম কল্পনা। আমবা সুন্দরী নারীও দেখেছি, আবার আকাশে ওড়া পাখিও দেখেছি। এখন পাখির পাখা যদি সুন্দরী নারীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া

১। প্রত্যক্ষ = Perception, স্মৃতি = Memory, কল্পনা = Imagination, সামান্য ধারণা = Concept, বচন = Judgment, অনুমান = Inference

২। Forms

৩। Sensation

যায় তবে যা পাব তা শুধু পাখি বা শুধু মানবী নয়, সে এক নূতন সৃষ্ট সুন্দরী। তার নাম পরী। পরী মানবী নয়, কল্পনা। এই কল্পনার ক্ষেত্রে বচনের যে প্রয়োগ হয়েছে তা না বুঝিয়ে বললেও চলবে। প্রথম যখন পাখি দেখেছিলাম, তখন সেই প্রত্যক্ষে বচন ছিল। পরে যখন সুন্দরী নারী দেখলাম তাতেও ত বচন আছে; কারণ বচন ছাড়া যে কোন প্রত্যক্ষই হয় না তা ত আমরা আগেই বলেছি। আর এই দুই প্রত্যক্ষ মিলে যখন কল্পনা হল তখন তাতেও যে বচন থাকবে, এ আর বেশী কথা কি!

(ঘ) বচন ও সামান্য ধারণা (Judgment and Concept)

'সবুজ ঘাস'—একটি বচন। এই বচনে 'সবুজ' ও 'ঘাস' দুইটি সামান্য ধারণা। বিভিন্ন সবুজ জিনিস দেখে তাদের সাধারণ রঙকে আমরা 'সবুজ' নাম দিয়ে থাকি। ঠিক এমনি করে নানা জাতীয় ঘাস দেখে তাদের সাধারণ গুণগুলোকে একত্র করে নাম দিই 'ঘাস'। 'সবুজ ঘাস' এই বিশেষ বচনটির ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, 'ঘাস' ও 'সবুজ' এই দু'টি সামান্য ধারণা আমরা প্রথম পেয়েছি; তারপর ধারণা দু'টিকে একত্র করে 'সবুজ ঘাস' এই বচনটি পাওয়া গেছে। সেজন্য সাধারণভাবে মনে হয়, সামান্য ধারণা না হলে কোন বচনই হয় না। অর্থাৎ বচনের আগেই সামান্য ধারণার উৎপত্তি হয়ে থাকে।

কিন্তু একথা ঠিক নয়। আমরা যদি সামান্য ধারণা-গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া আলোচনা করি তবে দেখব প্রতি পদক্ষেপেই বচন আবশ্যক। যে কোন সামান্য ধারণা গঠন করতে গেলেই প্রত্যক্ষীকরণ, বিশ্লেষণ, পারস্পরিক তুলনা, সামান্যীকরণ ও নামকরণ[১] এসব বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ধরা যাক্—'মানুষ' এই সামান্য ধারণা গঠন করতে হ'বে। এই ক্ষেত্রে প্রথমতঃ রাম, শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতি বিভিন্ন মানুষকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। বচন ছাড়া ত প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং এই প্রত্যক্ষীকরণের স্তরে বচন অপরিহার্য। তারপর রাম, শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতির বিভিন্ন গুণাবলী বিশ্লেষণ করতে হবে। রাম লম্বা ও ফর্সা, তার পশুত্ব ও যুক্তিবোধ[২] আছে। শ্যাম বেঁটে ও কালো, তার পশুত্ব ও যুক্তিবোধ আছে। এমনি করে নানা বচনের সৃষ্টি হবে। তারপর এদের গুণগুলোর পারস্পরিক তুলনা করতে হবে। দেখতে হবে 'রামের এই গুণ' আর 'শ্যামের এসব গুণ'—এদের মধ্যে মিল কোথায়? দেখলাম—

১। প্রত্যক্ষীকরণ—Observation, বিশ্লেষণ—Analysis, পারস্পরিক তুলনা—Comparison, সামান্যীকরণ—Generalisation, নামকরণ—Naming

২। Rationality

'এদের সকলের মধ্যেই পশুত্ব ও যুক্তিবোধ আছে'। এই ত সামান্যীকরণ। এখানে যে বচনের ব্যবহার হয়েছে তা ত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। সর্বশেষ পশুত্ব ও যুক্তিবোধবিশিষ্ট সবাইকে 'এরা মানুষ'—এই নামে পরিচয় দিতে হবে। এখানেও বচন আছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে বচনের ব্যবহার ছাড়া সামান্য ধারণা কখনই পাওয়া যায় না। কাজেই বচনের আগে সামান্য ধারণা কখনই হতে পারে না। অর্থাৎ বচন না থাকলে সামান্য ধারণা হয় না। অন্যভাবে বলা যায় যে, কোন সামান্য ধারণা শুধু ত অর্থহীন শব্দ মাত্র নয়, অর্থযুক্ত শব্দ। এই অর্থ কতকগুলি বচনেই নিহিত। 'সবুজ ঘাস' এই বচনে 'সবুজ' ও 'ঘাস' এই দুইটি সামান্য ধারণারই তাৎপর্য কতকগুলি বচন-নির্ভর। 'সবুজ একটি রঙ্', 'এই রঙ্ নীল প্রভৃতি রঙ্ থেকে ভিন্ন' এই জাতীয় কতগুলো বচনেই 'সবুজ' ধারণার তাৎপয বোঝা যায়। 'ঘাস' সম্বন্ধেও একই কথা। 'ঘাসেব জন্ম মাটিতে', 'ঘাস সহজেই হয়' ইত্যাদি বচনেই 'ঘাস'-এর তাৎপয নিহিত। এমনি করে দেখান যায় কোন সামান্য ধারণাই বচন-ভিন্ন বোধগম্য হয় না। সুতরাং সামান্য ধারণা কখনই বচন ছাড়া হয় না।

(ঙ) বচন ও অনুমান (Judgment and Inference)

বচন ও অনুমানে পার্থক্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এ পার্থক্য সহজে ধরা পড়ে না। কখনও কখনও একটি বচনেই অনুমান-প্রক্রিয়া লুকিয়ে থাকে। যখন আকাশে মেঘ দেখে বলি 'বৃষ্টি হবে', তখন আমার বক্তব্যকে বচন বা অনুমান উভয়ই বলা যেতে পারে। সুতরাং অনেক সময়ই যে বচন থেকে অনুমানকে আলাদা করা মুশকিল হয়—একথা অস্বীকার করা দায়।

এখানে প্রশ্ন উঠবে—অনুমান কি ? আর তার প্রকৃতিই বা কি ? আমাদের মনে হয় এক বা একাধিক ঘোষণার ওপর ভিত্তি করে যে ঘোষণা করা হয় তাবই নাম অনুমান। সমস্ত মনুষ্য হয় মরণশীল, রাম মনুষ্য, সুতরাং রাম মরণশীল—একটি অনুমান। এখানে 'রাম মরণশীল'—এই বচনটি, 'সমস্ত মনুষ্য হয় মরণশীল' ও 'রাম মনুষ্য'—এই দু'টি বচনের ওপর ভিত্তি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অনুমানের এই ধারণা থেকে আমরা অনুমানেব প্রকৃতি নিরূপণ করতে পারি। প্রত্যেক অনুমানেরই নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার।

প্রথমতঃ, প্রত্যেক অনুমানে এক বা একাধিক প্রদত্ত বচন বা প্রতিজ্ঞা থাকবে। একটি প্রতিজ্ঞার ওপর নির্ভর করে যে অনুমান হয় তার নাম অমাধ্যম

অনুমান।[১] 'সকল মানুষ মরণশীল, সুতরাং কতগুলো মরণশীল প্রাণী মানুষ'—এই জাতীয় অনুমান। আর একাধিক প্রতিজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে যে অনুমান হয় তার নাম সমাধ্যম অনুমান।[২] 'সকল মানুষ মরণশীল, রাম মানুষ, সুতরাং রাম মরণশীল'—এই অনুমানের উদাহরণ। অবশ্য সমাধ্যম অনুমানে সব সময়েই যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা উক্ত হবে তার কোন মানে নাই।

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিজ্ঞা থেকে অনুমানে যে বচনটি গৃহীত হয় তার নাম সিদ্ধান্ত। 'সকল মানুষ মরণশীল, সুতরাং কতগুলো মরণশীল প্রাণী মানুষ'—এই অনুমানে 'কতগুলো মরণশীল প্রাণী মানুষ' এই বচনটি সিদ্ধান্ত।

তৃতীয়তঃ, সিদ্ধান্ত প্রতিজ্ঞার পুনরুক্তি মাত্র নয়। নূতন কথা সিদ্ধান্তে না পাওয়া গেলে অনুমান সার্থক হয় না। অবশ্য এই নূতন কথা ব্যক্তি-বিশেষের কাছে নূতন কথা হতে পারে, আবার তা বস্তুগত সর্বজনগ্রাহ্য নূতন কথাও হতে পারে। যখন আমরা বলি—'সকল মানুষ মরণশীল, রাম মানুষ, সুতরাং রাম মরণশীল,' তখন অনেকে[৩] বলেন এখানে 'রাম মরণশীল' বলার মধ্যে ত কোন নূতন কথা নেই। 'সকল মানুষ মবণশাল' বলাব মধ্যেই রাম মানুষ হিসেবে যে মরণশীল তা বলা হয়েছে। অন্যেরা (যেমন Keynes) বলবেন, বস্তুতঃ (objectively) হবত তা ই; কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের কাছে 'রামের মরণশীলতা' একটা নূতন কথাই ত বটে, কারণ 'রাম মানুষ' একথা জানার পরই ত তিনি রাম যে মরণশীল তা বুঝতে পারেন। 'সকল মানুষ মরণশীল' বললেই হয়ত বস্তুতঃ বামের মরণশীলতার ইঙ্গিত তাতে থাকে, কিন্তু এই ইঙ্গিত ব্যক্তিবিশেষের কাছে বোধগম্য ত নাও হতে পাবে। তার কাছে 'রামের মরণশীলতা' যে এক নূতন খবর তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অবশ্য অন্য কতগুলো সিদ্ধান্তেবস্তুগতনূতনত্বই পাওয়াযায়। যেমন ধরুন—রাম মরণশীল, শ্যাম মরণশীল, যদু মরণশীল প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করে যখন আমরা সিদ্ধান্ত করি—

১। Immediate Inference

২। Mediate Inference

৩। Mill মনে করেন, এই জাতীয় সিদ্ধান্তে কোন নূতন কথাই বলা হয় না। এখানে প্রতিজ্ঞায় যা বলা হয় সিদ্ধান্তে তারই সমর্থন পাওযা যায় মাত্র। এক কথায় এই জাতীয় অনুমানে সিদ্ধান্ত প্রতিজ্ঞাকে সমর্থন করে; কিন্তু কোন নূতন কথা বলে না। 'রাম মরণশীল' বললে সকল 'মানুষ মরণশীল' এই প্রতিজ্ঞাটি সমর্থিত হয়। অর্থাৎ 'রাম মরণশীল' বললে 'সমস্ত মানুষ যে মরণশীল' এ কথার সত্যতা আরও ভালভাবে বোঝা যায়। কিন্তু 'রাম মরণশীল' এ কথা 'সকল মানুষ মরণশীল' এ কথায় অতিরিক্ত কোন নূতন কথা নয়।

'সকল মানুষই মরণশীল', তখন এই সিদ্ধান্তে বস্তুগত নূতনত্বের কথা কেউই অস্বীকার করবেন না। 'সকল মানুষ মরণশীল' বললে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানুষের মরণশীলতা বোঝায়। কিন্তু আমাদের প্রতিজ্ঞায় আমরা এত মানুষের মরণশীলতা কখনই প্রত্যক্ষ করতে পারি না। সুতরাং এখানে সিদ্ধান্তে যে বস্তুগত নূতন কথা আছে, তা মানতেই হবে।

চতুর্থতঃ, অনুমানে প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ (necessary connection) আছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সিদ্ধান্ত মাত্রেই নির্ভুল। এর আসল অর্থ হচ্ছে—প্রতিজ্ঞাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে বাধ্যবাধকভাবে সিদ্ধান্ত দেখা দেয়। আমরা যে কোন প্রতিজ্ঞা থেকে খেয়ালখুশীমত যে কোন সিদ্ধান্ত করতে পারি না। 'কোন কুকুরই পাখি নয়' আর 'সকল কুকুরই পশু'—এই দুটো প্রতিজ্ঞা থেকে 'কোন পশুই পাখি নয়' বা 'কোন কোন পশু পাখি নয়'—এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। এখানে প্রথম সিদ্ধান্তটি ভুল ও দ্বিতীয়টি শুদ্ধ। কিন্তু তা বলে পূর্বোদ্ধৃত প্রতিজ্ঞা দুটো থেকে 'কুকুর মানুষ নয়' এমন ধরণের সিদ্ধান্ত কখনই করা যাবে না। যদি এমন সিদ্ধান্ত কেউ করে তবে লোকে তাকে পাগল বলবে। এই সিদ্ধান্ত যে করা যায় না তার কারণ এই সিদ্ধান্ত পূর্বোদ্ধৃত প্রতিজ্ঞা দুটো থেকে বাধ্যবাধকভাবে কখনই পাওয়া যায় না। যে সিদ্ধান্ত বাধ্যবাধকভাবে প্রতিজ্ঞা থেকে পাওয়া যায় না তা সিদ্ধান্ত পদবাচ্যই নয়।

অনুমান সম্বন্ধে এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বচন ছাড়া কোন অনুমানই হতে পারে না। প্রত্যেক অনুমানেই এক বা একাধিক বচন থাকে। শুধু তাই নয়। অনুমান-প্রক্রিয়ায় আর বচন-প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। যখন আমরা নদীর ঘোলা জল দেখে বলি—'খানিকটা আগে বৃষ্টি হয়েছে' তখন এটা বচন প্রক্রিয়া (Judging), না অনুমান প্রক্রিয়া (Inference) তা বলা মুস্কিল। আমাদের মনে হয়, এটা বচন- ও অনুমান-প্রক্রিয়া উভয়ই। বচন-প্রক্রিয়ায় কোন কিছু সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। রামকে দেখে যখন বলি—রাম লম্বা—তখন যে বচন-প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেওয়া হয় তা সবাই স্বীকার করবেন। আর এই প্রক্রিয়া যে রাম নামক এক ব্যক্তির ব্যাখ্যা দিচ্ছে তা কি অস্বীকার করা যাবে? অনুমান-প্রক্রিয়াও আসলে ব্যাখ্যা-প্রক্রিয়া। যখন 'সকল মানুষ মরণশীল' ও 'রাম মানুষ' বলে 'রামকে মরণশীল' বলা হয়, তখন রামের মরণশীলতার একটা ব্যাখ্যাই দেওয়া হয়। রাম মরণশীল কেন?—এ

প্রশ্নের উত্তর বা ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হয়—যেহেতু সকল মানুষ মরণশীল ও রাম মানুষ, সে-জন্যই সে মরণশীল। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে বচন-প্রক্রিয়ার মত অনুমান-প্রক্রিয়াও ব্যাখ্যা-প্রক্রিয়া। তবে অনুমান-প্রক্রিয়ার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বচন-প্রক্রিয়ার চেয়ে ব্যাখ্যা-প্রক্রিয়ার জটিলতা বৃদ্ধি পায়। বচন-প্রক্রিয়ায় 'রাম মরণশীল' বলেই রামের ব্যাখ্যা-প্রক্রিয়া শেষ করে দেওয়া হয়। কিন্তু অনুমান-প্রক্রিয়ায় সকল মানুষের মরণশীলতা ও রামের মানবতার ওপর ভিত্তি করে রামের মরণশীলতার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং অনুমান-প্রক্রিয়াকে জটিলতর বচন-প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। আর যদি তাই হয় তবে অনুমান যে বচন ছাড়া কখনই হবে না, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। কেহ কেহ বলেন, বচন যখনই তাহার কারণ বা হেতু সম্পর্কে সচেতন হয় তখনই অনুমান গড়ে ওঠে। 'রাম মরণশীল' একটি বচন। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—রাম মবণশীল কেন? তবে বলতে হ'বে সমস্ত মানুষ মরণশীল, রাম মানুষ, সুতরাং রাম মরণশীল। অর্থাৎ বচনের কারণ বা হেতু সম্বন্ধে সচেতন হলেই অনুমান হয়। এই দিক থেকেও বচন ও অনুমানের সম্পর্ক যে নিবিড় তা বোঝা যায়।

ওপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জ্ঞানের কোন প্রকারই (প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা, সামান্য ধাবণা, বচন ও অনুমান) বচন ছাড়া হয় না। সুতরাং বচনকেই জ্ঞানের সরলতম প্রকাশ বা একক বলা যেতে পারে।

অনুমানের প্রকারভেদ ও তাদের সম্পর্ক

অনুমান সাধারণভাবে দু'রকম হ'তে পারে—আবোহানুমান (Induction) ও অবরোহানুমান (Deduction)।

বিশেষ প্রতিজ্ঞা থেকে সামান্য সিদ্ধান্তে বা ঐকিক প্রতিজ্ঞা থেকে ঐকিক সিদ্ধান্তে অথবা স্বল্পতব সামান্য প্রতিজ্ঞা থেকে অধিকতর সামান্য সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গেলে যে অনুমান-প্রক্রিয়ার দবকার তার নাম আরোহানুমান।

দৃষ্টান্ত :—

(ক) বিশেষ প্রতিজ্ঞা থেকে সামান্য সিদ্ধান্ত

(Universal Conclusion from Particular Premises)

অসিত মরণশীল
অমর মরণশীল
অমল মরণশীল
সব মানুষই মরণশীল।

(খ) ঐকিক প্রতিজ্ঞা থেকে ঐকিক সিদ্ধান্ত

(A Singular Conclusion from a Singular Premise)

মাধুরীর জ্বর কুইনাইনে সেরেছে
∴ শ্যামলীর জ্বরও তাতেই সারবে

(গ) স্বল্পতর সামান্য প্রতিজ্ঞা থেকে অধিকতর সামান্য সিদ্ধান্ত

(A more Universal Conclusion from less Universal Premises)

সকল বাঙ্গালী মরণশীল
সকল উৎকলবাসী মরণশীল
∴ সকল মানুষ মরণশীল।

এই সমস্ত আরোহানুমানের লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে, প্রতিজ্ঞা থেকে সিদ্ধান্তে যেতে খানিকটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। সমস্ত প্রতিজ্ঞাই অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে ঘোষণা করা হয়েছে। সিদ্ধান্তে যা বলা হচ্ছে—অভিজ্ঞতায় তৎক্ষণাৎ তা পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষতঃ প্রতিজ্ঞা থেকে সিদ্ধান্তে যাত্রা সব সময় নিরাপদ বলেও মনে হচ্ছে না। 'ক' উদাহরণে অসিত, অমর ও অমলের মরণশীলতার ওপর নির্ভর করে—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের সকল মানুষের মরণশীলতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। সকল মানুষের মরণশীলতা প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব। সুতরাং মাত্র তিন জন লোকের মরণশীলতা থেকে সব মানুষের মরণশীলতার কথা বলতে মনে একটু অনিশ্চয়তা আছে বৈ কি। এরকমভাবে দেখান যেতে পারে যে 'খ' ও 'গ' উদাহরণেও প্রতিজ্ঞা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে একটু অনিশ্চয়তা থাকে।

এই ত গেল আরোহানুমানের কথা। অন্যদিকে সামান্য প্রতিজ্ঞা থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে বা অধিকতর সামান্য প্রতিজ্ঞা থেকে স্বল্পতর সামান্য সিদ্ধান্তে পৌঁছতে যে অনুমান দরকার তার নাম—অবরোহানুমান।

উদাহরণ ঃ—

(ক) সামান্য প্রতিজ্ঞা থেকে বিশেষ সিদ্ধান্ত

(A Particular Conclusion from a Universal Premise)

সকল মানুষ মরণশীল
কোন কোন মানুষ কবি
কোন কোন কবি মরণশীল

(খ) অধিকতর সামান্য প্রতিজ্ঞা থেকে স্বল্পতর সামান্য সিদ্ধান্ত

(A less Universal Conclusion from a more Universal Premise)

সকল মানুষ মরণশীল
সকল বাঙ্গালী মানুষ
সকল বাঙ্গালী মরণশীল

অবরোহানুমানের সিদ্ধান্তে কোন অনিশ্চয়তা থাকে না। সিদ্ধান্ত তর্ক-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে প্রতিজ্ঞা থেকে সুনিশ্চিতভাবে দেখা দেয়।

অবরোহানুমান আবার দু'রকম হতে পারে—অমাধ্যম (Immediate) ও সমাধ্যম (Mediate)। অমাধ্যম অবরোহানুমানে একটি প্রতিজ্ঞা থেকেই সরাসরি সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। 'সকল কবিই মানুষ, সুতরাং কতিপয় মানুষ কবি'—এই অনুমানটি অমাধ্যম অবরোহানুমান। এখানে 'কতিপয় মানুষ কবি' এই সিদ্ধান্ত 'সকল কবিই মানুষ' এই প্রতিজ্ঞাটি থেকে সরাসরি পাওয়া গেছে। আবার যখন অবরোহানুমানে একাধিক প্রতিজ্ঞা থেকে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তখন তার নাম সমাধ্যম অবরোহানুমান। যখন বলি—'সকল মানুষ মরণশীল', 'রাম মানুষ', সুতরাং 'রাম মরণশীল', তখন 'রাম মরণশীল' এই সিদ্ধান্ত 'সকল মানুষ মরণশীল' ও 'রাম মানুষ' এই দু'টি প্রতিজ্ঞার মিলিত সাহায্যের পর ভিত্তি করেই করা হয়ে থাকে। সুতরাং এই অবরোহানুমানটি অমাধ্যম নয়, সমাধ্যম।

অবরোহ ও আরোহানুমানের প্রকৃতি বোঝা গেল। এদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা উদ্ধৃত উদাহরণগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। অবরোহানুমানের সিদ্ধান্ত কখনই প্রতিজ্ঞা থেকে অধিকতর ব্যাপক হয় না। কিন্তু আরোহানুমানের সিদ্ধান্ত কখনই প্রতিজ্ঞা থেকে কম ব্যাপক হয় না। অবরোহানুমানে প্রতিজ্ঞা থেকে সিদ্ধান্তে যাওয়ার পথে কোন অনিশ্চয়তা বা বিপদ নাই, কিন্তু আরোহানুমানে সর্বদাই একটু অনিশ্চয়তা ও বিপদের ভয় থাকে। সুতরাং অবরোহ ও আরোহ দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া।

কেউ কেউ আরোহ ও অবরোহানুমানের মধ্যে একটিকে আর একটির চেয়ে প্রয়োজনীয় ও মৌলিক বলে মনে করেন। কিন্তু আমাদের ধারণা, উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা ও মৌলিকতা সমান। বিশেষের সঙ্গে সামান্যের সংযোগই[১] সকল ব্যাখ্যার কাজ। এই সংযোগ বিশেষকে সামান্যের অধীনে এনেও দেখান

১। **Relation between the Universal and the Particular.**

যায়, আবার বিশেষ থেকে সামান্যের আগমন দেখিয়েও দেখান যায়। প্রথম প্রক্রিয়া অবরোহানুমানে আর দ্বিতীয় প্রক্রিয়া আরোহানুমানে গৃহীত হ'য়ে থাকে। সুতরাং অবরোহ ও আরোহানুমান দুই-ই ব্যাখ্যার স্বয়ংসম্পূর্ণ দুই প্রক্রিয়া। একটি আর একটির চেয়ে কম মৌলিক বা কম প্রযোজনীয় এমন কথা কখনই বলা যায় না।

বচনের বৈশিষ্ট্য

The Characteristics of a Judgment)

বচন কাকে বলে তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এখন বচনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করব।

প্রথমতঃ, যে কোন বচনেই কোন না কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা হয। এই বক্তব্য সত্যও হ'তে পারে, আবার মিথ্যাও হ'তে পারে। সুতরাং বচন সত্য বা মিথ্যা এ দুটোব একটা হবেই। 'সকল মানুষ কবি' এটা যেমন একটি বচন, আবার 'সকল মানুষই মরণশীল' এটা তেমনি আর একটি বচন। এদের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে এই যে, প্রথম বচনটি মিথ্যা আর দ্বিতীযটি সত্য।

দ্বিতীযতঃ, যে কোন বচনই সার্বজনিকত্ব (Universality) দাবী করতে পারে। এর অর্থ এই নয যে, সব বচনই সামান্য বচন (Universal Judgment) বলে পরিচিত হ'তে পাবে। 'সকল মানুষ মরণশীল'—একটি সামান্য বচন। এখানে উদ্দেশ্যপদ 'মানুষ' কাউকে বাদ না দিযে সব মানুষকেই বোঝাচ্ছে। এমনি করে যে বচনের উদ্দেশ্যপদ সেই পদ নির্দিষ্ট সবাইকে বোঝায় তার নাম দেওয়া হয সামান্য বচন। এই অর্থে সব বচন কখনই সার্বজনিকত্ব দাবী করতে পারে না। কিন্তু বচনের সত্যতা যে সবাই স্বীকার করবে এমন আশা বা দাবী সব বচনের পেছনেই আছে। এই অর্থে সব বচনই সার্বজনিকত্ব দাবী করতে পারে। যখন আমরা বলি 'ফুলটি লাল' তখন আমরা এ আশাও করি যে সকলের কাছেই ফুলটি লাল বলে মনে হবে। এ আশা হয়ত সব জায়গায় সফল হবে না, কিন্তু প্রত্যেক বচনেরই এরকম দাবী কবার অধিকার আছে। যদি তা না থাকত তবে বচন আর নিছক কল্পনায় কোন তফাৎ থাকত না। যদি একজনের বচন আর একজনের স্বীকৃতি পাবার দাবী না করতে পারে, তবে পারস্পরিক আলোচনায় কোন জ্ঞানই লাভ হবে না। শুধুই তাই নয়। এই অবস্থায় পারস্পরিক আলোচনাই নিরর্থক হ'য়ে যাবে। আর তার ফলে লোকব্যবহার অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াবে।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক বচনই নিশ্চয়াত্মক (necessary)। এই 'নিশ্চয়াত্মক' শব্দ সম্বন্ধে ভুল ধারণা থাকার খুবই সম্ভাবনা আছে। সাধারণ লোকের ধারণা—নিশ্চয়াত্মক বচন নিশ্চয় করে কিছু বলে। এই অর্থে 'সে নিশ্চয়ই পড়াশোনা করে' একটি নিশ্চয়াত্মক বচন। সব বচন কখনই এই অর্থে নিশ্চয়াত্মক হ'তে পারে না।

'নিশ্চয়াত্মক' শব্দের আর একটি অর্থ আছে। সেই অর্থেই সব বচন নিশ্চয়াত্মক। কোন বচন রচনায় কোন ব্যক্তিরই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। এই অর্থে বচন নিশ্চয়াত্মক। যে বস্তু সম্বন্ধে বচন রচনা করা হয় তার প্রকৃতি বচনের রূপ নির্ণয় করে। যার যা খুশী সে তাই কোন বস্তু সম্বন্ধে বলতে পারে না। যখন বলি—'ছেলেটি লম্বা' তখন ছেলেটির আকৃতি আমাকে তাকে লম্বা বলতে বাধ্য করে। আমি ইচ্ছে করলেই তাকে বেঁটে বলতে পারি না।

কেউ কেউ মনে করেন[১], কোন বচনই নিজে নিজে নিশ্চয়তা দাবী করতে পারে না। তাঁদের মতে অন্য বচনের সঙ্গে সম্পর্কিত হ'য়েই সব বচন নিশ্চয়তা দাবী করে, সুতরাং বচনের নিশ্চয়তা অমাধ্যম নয়, সমাধ্যম। যেমন ধরুন 'বইটি ভাল নয়' এই বচনের নিশ্চয়তা অন্য দুটি বচন যেমন—'কোন বইতে বক্তব্য বিষয় খারাপ ও লেখা খারাপ হ'লে বই ভাল হয় না' ও 'এ বইটির বক্তব্য ও লেখা দুই-ই খারাপ'-এর ওপর নির্ভর করছে।

এ বিষয়ে কিন্‌সের (Keynes) বক্তব্য আমাদের যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়। তিনি বলেন—বচনের নিশ্চয়তা সমাধ্যম নয়, অমাধ্যমই বটে। কোন বচন যদি নিজে নিজে নিশ্চয়তাশূন্য হয়, তবে যে কোন বচনই তার সমর্থনে আনা হোক্ না কেন তাতে তার নিশ্চয়তা উৎপন্ন হবে না। যাতে যা নেই তাতে তা কখনই হয় না। সুতরাং কোন বচনের নিশ্চয়তা সেই বচনের মধ্যেই আছে।

চতুর্থতঃ, প্রত্যেক বচনই বিশ্লেষণ (Analysis) ও সংশ্লেষণ (Synthesis)—এই দুই প্রক্রিয়ায় জড়িত। অর্থাৎ বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ছাড়া কোন বচনই হয় না। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্। 'ফুলটি সুন্দর' এই বচন রচনা করতে গেলে প্রথমতঃ ফুল ও সৌন্দর্য—এই দুই বস্তু আলাদা আলাদা বুঝতে হবে। অর্থাৎ ফুল কি আর সৌন্দর্য কি তা আগে না জানলে 'ফুলটি সুন্দর' এমন কথা কখনই বলা যাবে না। এরকম করে কোন কিছু জানার

১। 'Necessity is always mediate and not immediate.'—*Creighton*

নাম বিশ্লেষণ। আবার আলাদা করে ফুল আর সৌন্দর্য জেনেই আমাদের মন খুশী হয় না। আমরা দুটো ধারণাকে একত্র মিলিয়ে দিয়ে বলি—'ফুল সুন্দর'। এই প্রক্রিয়ার নাম সংশ্লেষণ। এরকম করে সমস্ত বচনেই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ—এই দুই প্রক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

পঞ্চমতঃ, বচনমাত্রই নিবাচনাত্মক (Selective)। কোন একটা বস্তু যখন দেখি তখন তার কোন একটা বিশেষ গুণ বা দিক্ নিয়েই আমরা বচন রচনা করে থাকি। একই সঙ্গে কোন বস্তুর সমস্ত গুণ বা দিক্ নিয়ে আমরা বচন রচনা করি না। যখন আমরা একটি গোলাপ ফুল দেখি তখন তার বর্ণ, গন্ধ, আয়তন সব গুণ নিয়েই এক সঙ্গে কোন বচন রচনা করি না। অনেকগুলো গুণের মধ্যে কোন একটা গুণ বেছে নিয়ে তার সম্বন্ধেই বচন রচনা করে থাকি। কখনও হয়ত বলি 'গোলাপটি লাল', আবার হয়ত কখনও বলি 'গোলাপটির খুব মিষ্টি গন্ধ'। সেজন্যই বলা হয় বচন মাত্রই নির্বাচনাত্মক।

ষষ্ঠতঃ, বচনমাত্রই এক জ্ঞান-মণ্ডলী[১] রচনা করে। যখন আমরা বলি 'হরিণটি সুন্দর', তখন 'হরিণ একটি পশু', 'হরিণ সাধারণতঃ বনে থাকে', 'হরিণের গায়ের চামড়া সুন্দর চিত্রিত', 'হরিণের চোখ দেখবার মত'—এই জাতীয় নানা বচন মনে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে হরিণকে ঘিরে একটি জ্ঞান-মণ্ডলী গ'ড়ে ওঠে। এই রকম করে প্রত্যেক বচনই জ্ঞান-মণ্ডলী রচনা ক'রে থাকে। কথাটি অন্য ভাবেও বোঝা যায়। যে কোন বচনই অন্য অনেক বচনের ওপর নির্ভর করে গ'ড়ে ওঠে এবং অনেক বচনের সৃষ্টিও করে। এই ভাবেই একটি বচন জ্ঞান-মণ্ডলী রচনা করে। 'ফুলটি লাল' এই বচন ফুল এবং লাল রঙ বিষয়ে বিভিন্ন বচনের ভিত্তিতেই করা সম্ভব। যে ফুল এবং লাল রঙ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা রাখে না সে কখনই 'ফুলটি লাল' এই বচন রচনা করতে পারে না। 'ফুলটি লাল' এই বচন আবার 'ফুলটি সুন্দর', 'ফুলটি টকটকে লাল' এই জাতীয় বচন সৃষ্টি করে।

বচনের শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Judgment)

বিভিন্ন দিক থেকে বচনের নানা রকম শ্রেণীবিভাগ হ'তে পারে। চিন্তার অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে গুণ-বিষয়ক বচন, পরিমাণ-বিষয়ক বচন, কার্যকারণসম্বন্ধ-বিষয়ক বচন ও উদ্দেশ্য-বিষয়ক বচন পাওয়া যেতে পারে। অন্য দিক্ থেকে

১। System of Knowledge

বিচারে ভাবাত্মক ও নিষেধাত্মক বচন, তথ্য-বিষয়ক বচন ও মূল্যজ্ঞাপক বচনও পাওয়া সম্ভব। আমরা এখন এসব বিভিন্ন প্রকারের বচনের একটু বিশদ আলোচনা করব।

(ক) অভিজ্ঞতার অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে বচনের শ্রেণীবিভাগ

মানুষের বুদ্ধি যতই বাড়ে তার চিন্তার মধ্যে ততই জটিলতা দেখা দেয়। শিশুর চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত সরল। কৈশোরে মানুষের চিন্তা আর একটু জটিলতার রূপ ধারণ করে। যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে মানুষের চিন্তা ক্রমশঃ জটিলতম আকার নিতে থাকে।

বস্তুর গুণই সর্বপ্রথম মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিশু 'ফুলটি লাল', 'আকাশ নীল', 'গাছের পাতা সবুজ' এই জাতীয় বচনই প্রথম রচনা করতে পারে। বস্তুর রঙ, গন্ধ, স্পর্শ শিশুকে সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করে। সেজন্য শিশুর বচনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বস্তুর এই জাতীয় গুণ নিয়েই রচিত হয়ে থাকে। এই সব বচনের নাম '**গুণ-বিষয়ক বচন**' (**Judgment of Quality**)।

মানবশিশু যতই কৈশোরের দিকে এগুতে থাকে ততই তার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। তখন পরিমাণ সম্বন্ধে তার ধারণা পরিষ্কার হতে থাকে। সে তখন 'হাস্নুহানার গন্ধ গোলাপের গন্ধের চেয়ে তীব্র', 'দুধের ফেনার মত সাদা জিনিস পাওয়া মুস্কিল'—এই জাতীয় তুলনামূলক "**পরিমাণ-বিষয়ক বচন**" (**Judgment of Quantity**) রচনা করতে শুরু করে। হাস্নুহানার গন্ধের তীব্রতার পরিমাণ যে গোলাপের গন্ধের তীব্রতার চেয়ে বেশী, দুধের ফেনা যে অনেক বস্তুর চেয়েই বেশী সাদা—এসব বোধ তখন শিশুর মনে জাগ্রত হয়।

কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে অথবা যৌবনে মানুষের বুদ্ধি আরও পরিপক্ব হয়। তখন সে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কার্যকারণসম্পর্ক উপলব্ধি করে। দুধ থেকে দই হয়, তিল থেকে তৈল হয়, সুতা থেকে কাপড় হয়—এই জাতীয় নানা অভিজ্ঞতা থেকে কিশোর ও যুবক ক্রমশঃই বুঝতে শেখে যে, সমস্ত কার্যেরই একটা না একটা কারণ আছে। এরকম করে কার্যকারণ সম্পর্কে যখন মানুষের ধারণা হয়ে যায়, তখন সে '**কার্যকারণ-বিষয়ক নানা বচনই**' (**Judgment of Causal Connection**) রচনা করে থাকে। সেই সময় তাকে, 'চিরুনী প্লাস্টিক ও হাড় উভয়েরই হতে পারে', 'শৈশবের শিক্ষা মানুষের ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তোলে'—এই জাতীয় কার্যকারণ-বিষয়ক নানা বচন রচনা করতে দেখা যায়।

কার্যকারণসম্পর্কের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বা পর পরই মানুষ বস্তুর সমগ্রতা, উদ্দেশ্য, অংশ-অংশী-সম্পর্ক প্রভৃতি জটিল জিনিস বুঝতে শেখে। তখন সে জাগতিক সৌন্দর্য ও বিভিন্ন বস্তুর সুষ্ঠু সমাবেশ দেখে জগতের পেছনে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে বলে মনে করে। তখন সে বলতে শেখে 'জগৎ উদ্দেশ্যহীন নয়', 'পালক পাখিকে রোদ, বৃষ্টি ও ঝড় থেকে রক্ষা করে' অথবা 'প্রজাপতিকে আকৃষ্ট করার জন্যই ফুলের রঙ হয়'। এই সমস্ত বচনই **'উদ্দেশ্য-বিষয়ক' (Judgment of Purpose)**[১], কারণ জগতের উদ্দেশ্য, পাখির পালকের উদ্দেশ্য ও প্রজাপতির রঙের উদ্দেশ্যের কথাই যথাক্রমে ওপরের বচনগুলিতে বলা হয়েছে। গাছের শাখার সঙ্গে কাণ্ডের যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক একথাও মানুষ তখন বুঝতে শেখে। মানবদেহের যে কোন অংশ কেটে নিলে যে আর জোড়া দেওয়া যায় না এই বোধও তার জাগ্রত হয়। উদ্দেশ্য-বিষয়ক বচন এই সমস্ত বিষয়েও প্রকাশ করে। মানুষেব বুদ্ধি সম্যক্ পরিপক্ক হলেই এই জাতীয় বচন রচনা সম্ভব। শিশু এরকম কথা ভাবতেও পারে না।

(খ) ভাবাত্মক ও নিষেধাত্মক বচন (Positive and Negative Judgments)

বচন উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক প্রকাশ করে। এই সম্পর্ক ভাবাত্মক ও নিষেধাত্মক দু'রকম হ'তে পারে। 'রাম ভাল ছেলে'—এই বচনে 'রাম' উদ্দেশ্য ও 'ভাল ছেলে' বিধেয় এবং এখানে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে একটি ভাবাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। এই বচনের নাম—**ভাবাত্মক বচন (Positive Judgment)**। আবার যখন বলি 'ফুলটির গন্ধ নাই' তখন 'ফুল' ও 'গন্ধ' এই উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে একটা নিষেধাত্মক সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়। এই বচনের নাম **নিষেধাত্মক বচন (Negative Judgment)**। সোজা কথায় যখন উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে মিল দেখি, তখন ভাবাত্মক বচন সৃষ্টি হয়, আর যখন উদ্দেশ্য ও বিধেয়ে গরমিল থাকে তখন নিষেধাত্মক বচন রচিত হয়ে থাকে।

(গ) তথ্য-বিষয়ক বচন ও মূল্য-জ্ঞাপক বচন (Judgment of Fact and Judgment of Value)

তথ্য-বিষয়ক বচন ও মূল্য-জ্ঞাপক বচন বুঝতে গেলে প্রথমেই তথ্য ও মূল্যের[২] স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে হবে। জগতে যা আছে, ঘটে বা প্রকাশিত

১। উদ্দেশ্য-বিষয়ক বচনকে Teleological Judgment অথবা Judgment of Individualityও বলা হয়।

২। তথ্য—Fact, মূল্য—Value

হয় তারই নাম তথ্য। ফুল, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র এসবই তথ্য। কিন্তু আর এক জাতীয় বস্তু আছে যা আমাদের কাছে আদর্শ হিসাবে দেখা দেয়—তারই নাম মূল্য। সত্য, শিব ও সুন্দর[১] এই জাতীয় পদার্থ। ফুলকে আমরা জগতে যে ভাবে থাকতে দেখি সেভাবে সত্য, শিব ও সুন্দর কখনও থাকে না। বস্তুর মূল্য নিরূপণ করতে গিয়েই আমরা সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত প্রভৃতি নানারকম বলে থাকি। সুতরাং সত্য, শিব ও সুন্দর জাগতিক বস্তুর মত জায়গা জুড়ে না থেকে বস্তুর মূল্যায়নে মানুষের বিভিন্ন মূল্যবোধ প্রকাশ করে থাকে। এই সব মূল্যের প্রকাশ জাগতিক কোন বস্তুতেই পূর্ণভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। বস্তুর মূল্য-বিচারে এগুলো যেন ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ। এই সব আদর্শের মাপকাঠিতেই আমরা বস্তুর মান বা মূল্য ঠিক করি। কোন একটা কথাকে সত্য, কোন একটা ছেলেকে ভালো আবার কোন একটা দৃশ্যকে সুন্দর আমরা হামেসাই বলে থাকি। এই সব বলার পেছনে কথা, ছেলে ও দৃশ্যের মূল্য-নিরূপণের প্রবৃত্তি কাজ করে। এই মূল্য-নিরূপণ আবার সত্য, ভালো (শিব) ও সুন্দর সম্বন্ধে আমাদের যে আদর্শ আছে তার কতটুকু এই বিশেষ ক্ষেত্রে পূর্ণ হ'ল তার ওপর সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করে।

তথ্য ও মূল্যের পার্থক্য খানিকটা আলোচনা করা গেল। এখন তথ্যবিষয়ক বচন ও মূল্য-জ্ঞাপক বচনের সম্পর্ক আলোচনা করতে হবে। যখন কোন বচন কোন তথ্যের বর্ণনা বা ঘোষণা প্রকাশ করে তখন তার নাম তথ্যবিষয়ক বচন। উদাহরণ হিসেবে 'ফুলটি লাল', 'নির্মেঘ আকাশ'—এই জাতীয় বচনের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দুই বচনের প্রথমটিতে ফুলের রঙ সম্বন্ধে ঘোষণা আছে, আর দ্বিতীয়টিতে আকাশের বর্ণনা আছে।

অন্যদিকে আমরা যখন কোন কিছুর মূল্য বিচার করি তখন যে বচন হয় তার নাম মূল্য-বিষয়ক বচন। রাম একটি ছেলে। ছেলে হিসেবে তার মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে যখন আমরা বলি 'রাম ভাল ছেলে' তখন এই বচন মূল্য-বিষয়ক হয়ে ওঠে। এখানে কিন্তু রামের কোন সাধারণ বর্ণনা নেই। এই বচনে রামের মূল্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রকাশ পাচ্ছে। আবার ধরুন, যখন বলি 'কথাটা সত্য' অথবা 'ফুলটি সুন্দর'—তখন এই দু'টি বচনই কথা ও ফুলের মূল্যই প্রকাশ করে থাকে। 'আকাশ নীল' আর 'আকাশ সুন্দর'—এই দু'টি বচনের পার্থক্য সুস্পষ্ট। প্রথমটিতে আকাশের একটি বর্ণনা পাই,

১। সত্য—Truth. শিব—Goodness, সুন্দর—Beauty

দ্বিতীয়টিতে আকাশের মূল্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রকাশ পায়। প্রথমটি তথ্য-বিষয়ক বচন আর দ্বিতীয়টি মূল্য-বিষয়ক।

কখনও কখনও অন্য আর একদিক্ থেকেও তথ্য-বিষয়ক বচন ও মূল্য-জ্ঞাপক বচনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। তথ্য-বিষযক বচনে আমরা কোন একটা বস্তু **সম্বন্ধে (about)** বর্ণনা করি। কিন্তু মূল্য-জ্ঞাপক বচনে কোন বিষয়ের **উপর (upon)** তার মূল্য সম্বন্ধে আমাদেব ধারণা প্রকাশ পায। 'বইটি নীল-মলাট-যুক্ত' এই তথ্য-বিষযক বচনে বইটির মলাট সম্বন্ধে একটা ঘোষণা আছে, কিন্তু যখন আমরা 'বইটি ভালো' এই মূল্য-জ্ঞাপক বচন প্রকাশ করি তখন বইযের উপর তার মূল্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণাই প্রকাশ পায়।

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞান-বিজ্ঞান

(Epistemology or the Theory of Knowledge)

জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শনের একটি শাখা। দর্শনের এই অংশে জ্ঞানের স্বরূপ, জ্ঞানের উৎপত্তি, জ্ঞানের সীমা প্রভৃতি আলোচনা করা হ'য়ে থাকে। তর্ক-বিজ্ঞান[১] ও মনোবিজ্ঞানেও[২] জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা তর্কবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের আলোচনার চেয়ে একটু ভিন্ন ধরণের। আমরা এখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তর্কবিজ্ঞান ও মনো-বিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করব।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান

(Epistemology, Logic & Psychology)

জ্ঞান-বিজ্ঞান জ্ঞানের প্রকৃতি, জ্ঞানের উৎপত্তি, জ্ঞানের প্রাগুপকরণ[৩], জ্ঞানের পরিধি প্রভৃতি নানা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে। তর্কবিজ্ঞান জ্ঞানের সত্যতার আকার নির্ণয় করে। কি রকম আকার-প্রকারের মধ্য দিয়ে জানলে জ্ঞান সত্য হবে—এই আলোচনাই তর্কবিজ্ঞানের বিষয়। জ্ঞান হওয়ার পর তার সত্যতা নিরূপণই তর্ক-বিজ্ঞানের কাজ। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাজ আরও গভীর ও মূলস্পর্শী[৪]। কি কি উপকরণের সমাবেশ হ'লে জ্ঞান হয় তাই জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা করে। অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা জ্ঞানের সম্ভাবনা নিরূপণ করে। জ্ঞান সম্ভব হ'লেই তার সত্যতার প্রশ্ন ওঠে। তর্ক-বিজ্ঞান জ্ঞানের সত্যতার রূপ নির্ধারণ করে। সুতরাং তর্কবিজ্ঞানীর কাজ জ্ঞান-বিজ্ঞানীর কাজের ওপর নির্ভর করে।

মনোবিজ্ঞান শুধু জ্ঞানেরই আলোচনা করে না—জ্ঞান, অনুভূতি[৫] ও ইচ্ছা[৬] এই তিন নিয়েই আলোচনা করে। এইদিক থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের পার্থক্য সুস্পষ্ট। জ্ঞান-বিজ্ঞান জ্ঞান নিয়েই আলোচনা করে, অনুভূতি বা ইচ্ছা নিয়ে আলোচনা করে না। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানালোচনা

১। Logic ২। Psychology
৩। Pre-conditions ৪। Fundamental
৫। Feeling ৬। Willing

আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের জ্ঞানালোচনার মধ্যেও যথেষ্ট তফাৎ আছে। আমাদের জ্ঞান যেভাবে হয় এবং যে সব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হয়, মনোবিজ্ঞান তার বর্ণনা দিয়ে থাকে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, সামান্য ধারণা, স্মৃতি, কল্পনা প্রভৃতি জ্ঞান-প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেওয়াই মনোবিজ্ঞানের কাজ। জ্ঞান-বিজ্ঞানে কিন্তু জ্ঞানের বর্ণনা দেওয়া হয় না, জ্ঞানোৎপত্তির মূলে কি কি উপাদান থাকে তাই আলোচনা করা হয়। কোন্ কোন্ উপাদান বা উপকরণ না হ'লে জ্ঞান সম্ভবই নয় তা বের করাই জ্ঞান-বিজ্ঞানীর কাজ। শুধু তাই নয়। মানুষ কতটুকু জানতে পারে, অতীন্দ্রিয় বিষয় জানা যায় কিনা—এই জাতীয় প্রশ্নও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়। মনোবিজ্ঞান এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে না।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, জ্ঞানোৎপত্তির মূলে কি কি উপকরণ থাকে তা নির্ণয় করাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান কাজ। সুতরাং জ্ঞানোৎপত্তি কি ভাবে সম্ভব হয়—এই আলোচনা নিয়েই জ্ঞান-বিজ্ঞান শুরু হবে।

জ্ঞানোৎপত্তি কি ভাবে সম্ভব?

জ্ঞানোৎপত্তি কি ভাবে সম্ভব এ নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিকের মধ্যে মতভেদ আছে। জ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাবনা নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের চারটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ভাগ করা যেতে পারে—বুদ্ধিবাদী[১], প্রত্যক্ষবাদী[২] বিচারবাদী[৩] ও দ্বান্দ্বিকবাদী[৪]। ডেকার্টে, লাইব্‌নিজ, ভলফ্ প্রভৃতি বুদ্ধিবাদী দার্শনিক নামে পরিচিত। জন লক্, ডেভিড হিউম—এঁরা হচ্ছেন অভিজ্ঞতা-বাদী দার্শনিক। কাণ্ট বিচারবাদী আর হেগেল দ্বান্দ্বিকবাদী দার্শনিক।

বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মতে ইন্দ্রিয় কখনই সত্য জ্ঞান দিতে পারে না। ইন্দ্রিয় থেকে যে জ্ঞান আমরা পাই তা নিশ্চিতও নয়, সর্বজনগ্রাহ্যও নয়। সমস্ত সত্য জ্ঞানই বুদ্ধির কতগুলি মৌলিক ধারণা থেকে লাভ করতে হয়। সহজাত ধারণা (Innate ideas) সত্য জ্ঞানের নিয়ামক। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের এই মতবাদের নাম বুদ্ধিবাদ (Rationalism)। প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদের মতে একমাত্র প্রত্যক্ষ থেকেই জ্ঞান লাভ সম্ভব। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়পথেই লাভ করা যায়। এই মতবাদের নাম প্রত্যক্ষবাদ (Empiricism)। কাণ্টের মতে জ্ঞানলাভের জন্য প্রত্যক্ষ ও বুদ্ধি দুই-ই দরকার। প্রত্যক্ষ

১। Rationalistic School ২। Empirical School

৩। Critical School ৪। Dialectical School

জ্ঞানের বিষয় আর বুদ্ধি জ্ঞানের আকার দিয়ে থাকে। বিষয় আর আকার দুই মিলেই পরিপূর্ণ জ্ঞান হয়। কাণ্টের এই মতবাদের নাম বিচারবাদ (Criticism)। হেগেল জ্ঞানের বিষয় আর জ্ঞানের আকার যে ভিন্ন নয়, পরন্তু একই তত্ত্বের দুই বিভিন্ন প্রকাশমাত্র—তা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। হেগেলের এই মতের নাম দ্বান্দ্বিকবাদ (Dialectic theory)। আমরা নীচে এই সমস্ত বিভিন্ন মতবাদগুলোর একটু বিস্তৃত আলোচনা করব।

বুদ্ধিবাদ (Rationalism)

বুদ্ধিবাদের মূল বক্তব্য এই যে, সত্য জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েই লাভ করা যায়। ইন্দ্রিয় থেকে যে জ্ঞান পাই, তা হয় জ্ঞানই নয়, নয়ত অতি নিকৃষ্ট নিম্নস্তরের জ্ঞান।

বুদ্ধিবাদী দার্শনিক ডেকার্টের মতে আমাদের কতগুলো সহজাত ধারণা আ[illegible]এ ধারণাগুলো কখনই মিথ্যা হ'তে পারে না। ভগবান হয়ত জন্মে[illegible]ই এই সমস্ত ধারণা মানুষের মনে গেঁথে দেন। সমস্ত জ্ঞান এই সমস্ত ধারণা থেকে গাণিতিক অবরোহ পদ্ধতিতে লাভ করা যায়। এই জাতীয় বুদ্ধিবাদকে পল্‌সন গাণিতিক বুদ্ধিবাদ (Mathematical Rationalism) নামে অভিহিত করেছেন।

সহজাত ধারণায় বিশ্বাসের পক্ষে কয়েকটি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে।

প্রথমতঃ, যে জ্ঞানই আমরা অভিজ্ঞতা থেকে পাই না কেন তাই সন্দেহ করতে পারি। 'ফুলটি লাল' না বলে যদি বলি 'ফুলটি সাদা' তবে চিন্তার মধ্যে কোন বিরোধিতা থাকে না। কিন্তু 'সোনার পাথর বাটি' বললে চিন্তার মধ্যেই বিরোধিতা দেখা দেয়। সুতরাং 'সোনার পাথর বাটি' ভাবাই যায় না। কিন্তু ফুলটিকে 'লাল' না ভেবে অনায়াসেই 'সাদা' ভাবা যায়। আমাদের জীবনে এমন কতগুলো ধারণার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় যাদের বিপরীত ভাবাই যায় না। দুই আর দুই যোগ করলে চার হয়। এর বিপরীত ভাবা যায় না। সুতরাং এই জ্ঞানকে অভিজ্ঞতালব্ধ বলা যাবে না। এই জ্ঞান সহজাত।

দ্বিতীয়তঃ, অভিজ্ঞতার পূর্বে অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তু কখনও মনে উপস্থিত থাকতে পারে না। যে কখনও ঘোড়া দেখে নাই, ঘোড়ার ছবি তার মনে

১। Through mathematical deduction

কখনও জাগতে পারে না। কিন্তু মানুষের এমন কতগুলো ধারণা আছে যা মানুষের মনে সর্বদাই থাকে। এইগুলো অভিজ্ঞতালব্ধ নয়, সহজাত। কার্য-কারণবিধি সম্বন্ধে মানুষের ধারণা এই জাতের অন্তর্গত।

তৃতীয়তঃ, অভিজ্ঞতায় যে জ্ঞান পাওয়া যায় প্রায়ই সে বিষয়ে মতানৈক্য দেখা যায়। একজনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রায়ই অন্য লোকের অভিজ্ঞতার মিল হয় না। কিন্তু তর্কবিজ্ঞানে এমন কতগুলো নিয়ম আছে যাদের সম্বন্ধে কোন মতানৈক্যই সম্ভব নয়। এই নিয়মগুলো তর্কবিজ্ঞানে 'চিন্তার মৌলিক নিয়ম' (Fundamental laws of thought) নামে পরিচিত। এই নিয়মগুলো কখনই অভিজ্ঞতালব্ধ হ'তে পারে না, এগুলো সহজাত। নীতির মৌলিক নিয়ম, ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা—এসবও এই দলের অন্তর্গত।

এই সমস্ত কথা বিবেচনা ক'রে বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা বলেন যে সহজাত ধারণা সম্ভব এবং এই সহজাত ধারণাই নিশ্চিত জ্ঞান দিয়ে থাকে।

জার্মান দার্শনিক লাইব্‌নিজ সমস্ত উচ্চ বিষয়ের জ্ঞানই যে বুদ্ধিলভ্য, তা জোর গলায় ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে বুদ্ধির সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের কোন অহি-নকুল সম্পর্ক নাই। তিনি মনে করেন, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধিজাত জ্ঞান—দুই বিজাতীয় জ্ঞান নয়। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বুদ্ধিজাত জ্ঞানের চেয়ে অস্পষ্ট ও কম প্রামাণ্য মাত্র। ইন্দ্রিয় বুদ্ধিরই এক অনুন্নত রূপ।

(দার্শনিক ভলফ, কতগুলো মৌলিক ধারণা (Fundamental Ideas) থেকে সমস্ত জ্ঞান অবরোহ পদ্ধতিতে লাভ করা যায়—এই মতবাদে বিশ্বাসী। তিনিও একজন বুদ্ধিবাদের সমর্থক।)

সমালোচনা : বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মূল বক্তব্য সহজাত ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। দার্শনিক জন লক্ এই সহজাত ধারণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। আমরা বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের সমালোচনা প্রসঙ্গে লকের এই প্রতিবাদ মেনে নিতে পারি।

লক্ বলেন সর্বজনগৃহীত ও সর্বজনজ্ঞাত কোন ধারণাই নাই। কিন্তু বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মতে সর্বজনগৃহীত ও সর্বজনজ্ঞাত ধারণাই সহজাত ধারণা। কার্য-কারণ-বিধি বা তর্কবিজ্ঞানের কোন মৌলিক নিয়ম সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছোট শিশুর নেই। সুতরাং এগুলোকে সহজাত ধারণা বলা যায় না।

যে সমস্ত ধারণা সম্বন্ধে সকলেরই মতৈক্য আছে তাদেরই সহজাত ধারণা বলা হ'য়েছে। কিন্তু লকের মতে ঈশ্বর, নৈতিক নিয়ম প্রভৃতি সম্বন্ধে সকলের

মতৈক্য নেই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন কালে ঈশ্বর সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায়। কেউ বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, কেউ মাত্র দুই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, আবার কেউ বা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী। ঈশ্বরের গুণাবলী সম্বন্ধেও বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ধারণা পোষণ করে। ডেকার্টে মনে করেন, জন্মের সময়ই ঈশ্বর সহজাত ধারণাগুলো মানুষের মনে গেঁথে দেন। কিন্তু ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ঈশ্বর তাঁর নিজের ধারণাই সকলের মনে একরকম ভাবে গেঁথে দিতে পারেন নি। সুতরাং অন্য কোন ধারণা তিনি সকলের মনে একরকম করে গেঁথে দেবেন, তা-ই বা কি করে ভাবা যায়। বিভিন্ন দেশে ও সমাজে নীতি সম্বন্ধেও বিভিন্ন মত দেখা যায়। কোন সমাজে এক পুরুষের দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ নিন্দনীয়, আবার অন্য কোন সমাজে এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী সমাজ-সমর্থিত; এই অবস্থায় নীতির ধারণাকেও সহজাত বলা যায় না।

বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের বিরুদ্ধে আর একটি বিষয়ও বলবার আছে। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা মনে করেন, ধারণা থেকেই জ্ঞান হয়। কিন্তু শুধু ধারণা বলে দুনিয়ায় কিছু আছে কি? ধারণা ত সব সময়েই বস্তুর ধারণা। আর এই বস্তু ত কখনই বুদ্ধিসৃষ্ট হ'তে পারে না। বস্তু প্রত্যক্ষের মাধ্যমেই লাভ করা যেতে পারে। সুতরাং বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা এই দিক্ থেকেও একটা ভুল করেছেন।

এখানে প্রশ্ন উঠবে—বুদ্ধিবাদের যদি এতই দোষ তবে তার কোন গুণই নেই কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব—জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বুদ্ধির দরকার আছে, একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। কাণ্ট বলেছেন, বুদ্ধি জ্ঞানের আকার দিয়ে থাকে। কোন বস্তুই বিষয় ও আকার[১] ছাড়া ভাবা যায় না। জ্ঞানেরও বিষয় ও আকার দুইই আছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় দেয় আর বুদ্ধি দেয় জ্ঞানের আকার। প্রত্যক্ষ ও বুদ্ধি এই দুই-ই জ্ঞানের জন্য দরকার।[২] বুদ্ধিবাদ জ্ঞানে বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করে। এইখানেই বুদ্ধিবাদের সার্থকতা।

প্রত্যক্ষবাদ (Empiricism):

প্রত্যক্ষবাদের মতে প্রত্যক্ষই জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ। এই বৃহৎ পথ থেকে দুটো শাখা-পথ বেরিয়ে গেছে—একটার নাম সংবেদন (Sensation)

১। বিষয়—Matter, আকার—Form

২। এই প্রসঙ্গের বিশদ আলোচনা কাণ্টের বিচারবাদ আলোচনায় দ্রষ্টব্য।

ও আর একটার নাম অন্তর্দর্শন (Reflection)। সংবেদনের সাহায্যে আমরা বাইরের জিনিসের জ্ঞানলাভ করি। অন্তর্দর্শনে আমরা নিজেদের মানসিক অবস্থার পরিচয় পাই।

দার্শনিক জন লক্ এই প্রত্যক্ষবাদের প্রধান পুরোহিত। তাঁর মতে মানুষ জন্মের সময় কোন ধারণা নিয়েই জন্মায় না। শিশুর মন একেবারে খালি থাকে। লক এই সাদা মনকে একখানা অলিখিত কোরা কাগজ[১] বলে উল্লেখ করেছেন। পরে যখন শিশুর ইন্দ্রিয়গুলো বাইরের বস্তুর সংস্পর্শে আসে, যখন ইন্দ্রিয়-পথে মনের ওপর বাইরের জিনিসের ছাপ পড়ে। এই ছাপ থেকেই শিশুর জ্ঞান হয়। যে বস্তু আছে, তাই জানা যায়। বস্তু থাকলেই জানা যাবে এমন নয়, কিন্তু বস্তু না থাকলে জানা যায় না। এখন প্রশ্ন হ'ল—বস্তু যে আছে তা বুঝব কি করে? উত্তরে লক্ বলেন—বস্তুর ছাপ যদি মনে পড়ে তবেই বুঝব বস্তু আছে। বস্তুর যে ছাপ মনে পড়ে লক্ তার নাম দিয়েছেন ধারণা (Idea)।

ধারণা দু'টো পথ দিয়ে আমাদের মনে প্রবেশ করতে পারে—একটা হচ্ছে সংবেদনের পথ, আর একটা অন্তর্দর্শনের পথ। সংবেদন-পথে বাইরের জগতের ধারণা পাই, আর অন্তর্দর্শনের পথে মানসিক অবস্থার জ্ঞান পাওয়া যায়। লকের মতে ধারণা-গ্রহণ ব্যাপারে মন একান্তভাবেই নিষ্ক্রিয় থাকে। বাইরে থেকে ধারণাগুলো যখন মনের সাদা পর্দায় এসে পড়ে তখন মনের দিক থেকে কিছুই করবার থাকে না।

লকের মতে এই ধারণাগুলো জ্ঞান নয়। ধারণার মধ্যে মিল বা গরমিল প্রত্যক্ষ করার নামই জ্ঞান। 'ফুল'—এই ধারণা কোন জ্ঞান নয়, কিন্তু 'ফুলটি লাল'—এটি একটা জ্ঞান, কারণ এখানে 'ফুল' ও 'লাল' এই দুই ধারণার মধ্যে মিল প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। এই প্রত্যক্ষকরণ ত্রিবিধ উপায়ে সম্ভবপর—(ক) বোধির সাহায্যে সরাসরি দুটো ধারণার তুলনা করে, (খ) বুদ্ধি দিয়ে এক বা একাধিক ধারণার মাধ্যমে দু'টি ধারণার মিল বা গরমিল দেখে, ও (গ) সংবেদনের সাহায্যে কোন বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করে।

সমালোচনা: লকের প্রত্যক্ষবাদ যদি আমরা একটু তলিয়ে দেখি তবে নানারকমের অসঙ্গতি ও অসম্ভাব্যতা আমাদের চোখে পড়ে।

প্রথমতঃ, লক্ ধারণা-গ্রহণ-ব্যাপারে মনকে নিষ্ক্রিয় বলেছেন। তাঁর মতে মানুষের মন বিভিন্ন ধারণার নিষ্ক্রিয় আধার মাত্র। কিন্তু আমাদের মনে

১। Tabula Rasa

হয় জ্ঞান-ব্যাপারে মন কখনই নিষ্ক্রিয় নয়। সংবেদনের দ্বারা মন বিক্ষুব্ধ (irritated) না হ'লে কখনই জ্ঞান হ'তে পারে না। আর মন যখন বিক্ষুব্ধ হয় তখন বিক্ষোভের হেতুর পরিচয় মনই সক্রিয়ভাবে দিয়ে থাকে। এই পরিচয় থেকেই জ্ঞান হয়। কথাটা উদাহরণ দিয়ে বোঝান যেতে পারে। বাইরে যখন কোন শব্দ হয় তখন কর্ণেন্দ্রিয় সংক্ষুব্ধ হয়। মন এই সংক্ষোভের একটা ব্যাখ্যা বা পরিচয় দেয়, আর তার ফলেই আমরা জানতে পারি যে, একটা শব্দ হ'য়েছে। সুতরাং জ্ঞান-ব্যাপারে মন নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয়।

দ্বিতীয়তঃ, লক্ বস্তু ও ধারণার মধ্যে একটা ভেদরেখা টেনেছেন। তাঁর মতে ধারণাই আমরা সরাসরি জানি। ধারণা লাভের পর ধারণার একটি বস্তু আছে তা আমরা বুঝতে পারি। বস্তুর সরাসরি জ্ঞান আমাদের কখনই হয় না। লকের এই মতবাদ থেকেই পরবর্তী কালে বার্কলির বিজ্ঞানবাদের সৃষ্টি হ'য়েছে। বার্কলি বলেছেন—ধারণাই যদি আমরা সরাসরি জানি ও বস্তু কখনই সোজাসুজি না জানি, তবে বস্তু যে আছে তার ত কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। যা প্রত্যক্ষ করি না তা আছে, এমন কথা মানা যায় না। সুতরাং বস্তুর অস্তিত্বই অস্বীকার করতে হয়। যা আমরা জানি তা সবই ধারণা। সুতরাং একমাত্র ধারণাই আছে। ধারণাতিরিক্ত বস্তু বলে কিছু নাই। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, লকের মতবাদ মানতে গেলে বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করা যায় না।

তৃতীয়তঃ, লক্ ধারণা ও জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে শুধু ধারণাই জ্ঞান নয়, ধারণার মিল বা গরমিল প্রত্যক্ষ করার নামই জ্ঞান। কিন্তু আমাদের মনে হয় শুধু ধারণাকেই জ্ঞান বলা যায়। ফুলের ধারণা ফুলের জ্ঞান নয়—এমন কথা কে বলবে?

চতুর্থতঃ, ধারণা সত্য কি মিথ্যা বুঝব কি করে? লক্ অবশ্য বলবেন, ধারণা যখন বস্তুর সঙ্গে মেলে তখনই ধারণা সত্য হয়, আর যখন মেলে না তখন হয় মিথ্যা। কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে—যে বস্তু আমরা কখনই সরাসরি জানি না তার সঙ্গে ধারণা মিলল কি মিলল না তা বুঝব কি করে? যে লোককে আমরা কখনও দেখিনি তার ফটো দেখে লোকটির প্রতিকৃতি ঠিক হয়েছে কিনা তা ত আমরা বলতে পারি না। সুতরাং অজ্ঞাত বস্তুর সঙ্গে ধারণার মিল বা গরমিলও আমরা জানতে পারি না। কাজেই লকের মতানুসারে ধারণার সত্যাসত্য কখনই নির্ণয় করা যায় না।

পরবর্তী কালে হিউম লকের প্রত্যক্ষবাদকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে অতীন্দ্রিয় আত্মা, বস্তুর দ্রব্যত্ব[১] ও ঈশ্বরের কোন জ্ঞান হয় না। সুতরাং এদের অস্তিত্ব স্বীকার করার পেছনে কোন যুক্তিই নাই। হিউমের এই মতবাদ সংশয়বাদ[২] নামে পরিচিত।

হিউমের মতে সাক্ষাৎ জ্ঞানের একমাত্র বিষয় মুদ্রণ[৩]। মানুষের কোন ইন্দ্রিয় যখন বস্তুর সংস্পর্শে আসে তখন সেই বস্তুর একটা ছাপ মানুষের মনে পড়ে। হিউম তারই নাম দিয়েছেন মুদ্রণ। এই মুদ্রণ যখন অস্পষ্ট আকার ধারণ করে তখন তার নাম ধারণা। হিউমের মতে মুদ্রণ ছাড়া কোন ধারণাই হ'তে পারে না। আত্মা, বস্তুর দ্রব্যত্ব বা ঈশ্বরের কোন মুদ্রণ সম্ভব নয়, কারণ কোন ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়েই এদের পাওয়া যায় না; আর যা ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় না তার কোন মুদ্রণ হ'তে পারে না। সুতরাং আত্মা, বস্তুর দ্রব্যত্ব বা ঈশ্বরের জ্ঞান সম্ভব নয়। যাদের জ্ঞান সম্ভব নয়, তাদের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করা যায় না।

হিউম মনে করেন, পরস্পর বিচ্ছিন্ন মুদ্রণ কতকগুলো অনুষঙ্গের নিয়মের[৪] বন্ধনে বদ্ধ হ'লেই জ্ঞান হয়। সান্নিধ্য (Contiguity), সাদৃশ্য (Similarity) ও কার্যকারণসম্পর্ক (Cause and Effect relation) অনুষঙ্গের এই তিন নিয়ম। সমস্ত বস্তুই কতকগুলো মুদ্রণের সমষ্টি বিশেষ। মুদ্রণাতিরিক্ত বস্তুর দ্রব্যত্ব ব'লে কিছু নাই।

হিউমের মতে কার্যকারণের মধ্যে কোন আবশ্যিক সম্বন্ধ[৫] নাই। কুইনাইন খেলে জ্বর কমে। এই ক্ষেত্রে কুইনাইন খাওয়া কারণ আর জ্বর কমা তার কার্য। হিউম বলবেন—কুইনাইন খেলেই জ্বর কমবে এমন কোন আবশ্যিক কার্যকারণ সম্পর্ক আমরা কখনও প্রত্যক্ষ করি না। বার বার কুইনাইন খেয়ে জ্বর কমতে দেখে আমরা আশা করি ভবিষ্যতেও কুইনাইন খেলে জ্বর কমবে।

১। দ্রব্যত্ব (Substantiality)—কোন বস্তুর রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণাবলী যে আধারে থাকে তার নাম দ্রব্য। এই আধার কখনই দেখা যায় না। অথচ প্রকাশিত গুণগুলোর অধিষ্ঠান হিসেবে তাকে মানতে হয়। লক্ দ্রব্যত্ব সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করেন। হিউম বলেন, প্রকাশিত গুণাবলী ছাড়া বস্তুর দ্রব্যত্ব বলে প্রচ্ছন্ন কোন সত্তা নেই। বিস্তৃত আলোচনা সপ্তম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

২। সংশয়বাদ—Seepticism

৩। মুদ্রণ—Impression

৪। অনুষঙ্গের নিয়ম—Laws of Association

৫। আবশ্যিক সম্বন্ধ—Necessary Connection

এটা আমাদের অভ্যাসগত ধারণা মাত্র। এর কোন বস্তুগত নিশ্চয়তা (Objective necessity) নাই।

সমালোচনা: বিচ্ছিন্ন মুদ্রণের মধ্যে যদি বস্তুগত ঐক্য না থাকে তবে আমাদের পক্ষে কোন বস্তুর জ্ঞানই সম্ভব নয়। অনুষঙ্গ-নিয়ম-লব্ধ ঐক্য কখনই বস্তু-ঐক্য দিতে পারে না; কারণ অনুষঙ্গের নিয়ম বস্তুর নিয়ম নয়, এগুলো ব্যক্তি মানসের নিয়ম মাত্র। মনে করুন—রূপ, রস, গন্ধের কতগুলো বিচ্ছিন্ন মুদ্রণ পাওয়া গেল। এগুলো একত্র সন্নিবিষ্ট না হলে বস্তুর জ্ঞান হতে পারে না। হিউমের মতে গুণগুলো একত্র সন্নিবিষ্ট হয়ে আমাদের কাছে আসে না। আমরা অনুষঙ্গের নিয়ম দিয়ে তাদের একত্র সন্নিবিষ্ট করি। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল—অনুষঙ্গের নিয়ম যে ঐক্য দেয় সে ত ব্যক্তিগত ঐক্য (Subjective unity), কিন্তু তা বস্তুর ঐক্য বিধান করবে কি ক'রে? অনুষঙ্গের নিয়ম ব্যক্তিমনের নিয়ম, কিন্তু বস্তুর নিয়ম নয়। সুতরাং অনুষঙ্গের নিয়ম দিয়ে কখনই বস্তুর ঐক্য পাওয়া যায় না। আর বস্তুর ঐক্য যদি না পাওয়া যায়, তবে বস্তুর জ্ঞানই হ'তে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, হিউমের মতে সমস্ত বস্তুই কতকগুলো মুদ্রণের সমষ্টিমাত্র। তাই যদি হয়, তবে মানুষের মনও কতগুলো মুদ্রণের সমষ্টি। একথা সত্য হ'লে আমাদের কোন স্মৃতিই হ'বে না। আজ যা প্রত্যক্ষ করি মনে তা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে বলেই পরে তা স্মরণ করতে পারি। কিন্তু হিউমের মতে স্থায়ী মন বলে কিছু নেই। মন পরিবর্তমান কতকগুলো মুদ্রণের সমষ্টিমাত্র। সুতরাং এই মন নিয়ত পরিবর্তনশীল, এখানে কিছুই অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। সুতরাং স্মৃতিও সম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ, হিউম যে বলেছেন, কার্যকারণের মধ্যে কোন বস্তুগত নিশ্চয়তা নেই—একথা সত্য নয়। কাণ্ট এই মতবাদের অযাথার্থ্য বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করেছেন। আমরা সপ্তম অধ্যায়ে কার্যকারণ-সম্পর্ক-নির্ণয় প্রসঙ্গে কাণ্টের মতবাদ আলোচনা করব।

চতুর্থতঃ, হিউমের প্রত্যক্ষবাদ সংশয়বাদে পর্যবসিত হ'য়েছে। হিউমের মতে কোন তত্ত্ব-জ্ঞানই[১] হ'তে পারে না। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি যে, সংশয়বাদ সুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক নয়। সংশয়বাদের মধ্যে একটা স্ববিরোধিতা আছে, সেই প্রসঙ্গে

১। তত্ত্ব-জ্ঞান—Metaphysical Knowledge.

আমরা তাও উল্লেখ করেছি। সুতরাং এই দিক থেকেও হিউমের প্রত্যক্ষবাদ যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রত্যক্ষবাদ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হ'ল। লক্ ও হিউমের এই মতবাদ বহু দোষদুষ্ট তাও দেখান হযেছে। এখন প্রশ্ন হ'ল—প্রত্যক্ষবাদের কোন গুণই নাই কি ?

আমাদের মনে হয়, বস্তু ছাড়া যে কোন ধারণা হয় না—প্রত্যক্ষবাদীদের একথা একটা বড সত্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মতে ধারণাই বস্তু-জ্ঞান সৃষ্টি করতে সমর্থ। প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক হিউম একথার মিথ্যাত্ব প্রমাণ করেছেন। ধারণা সব সময়েই কোন না কোন বস্তুর ধারণা। সুতবাং বস্তু ছাড়া কোন ধারণাই হতে পাবে না। পরবর্তী কালে কাণ্ট একথার সত্যতা স্বীকার করেছেন। প্রথম জীবনে কাণ্ট মনে করতেন—ধারণাই আমাদের বস্তু-জ্ঞান দিতে সক্ষম। পরে হিউমের বই পড়ে তাঁর ভুল ভাঙ্গে। তিনি নিজে বলেছেন 'হিউম আমাকে নির্বিচার নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দিয়েছে'।[১]

বিচারবাদ (Critical theory) :

প্রত্যেক জিনিসেরই সাধারণভাবে দুটো দিক থাকে—একটা তার আকারের দিক, আর একটা তার বস্তুর দিক।[২] যে টেবিলের ওপর লিখছি তার কথাই ধরা যাক্ না কেন। বস্তুর দিক থেকে এই বিশেষ টেবিলটি কাঠের, আর আকারের দিক থেকে এটা চতুষ্কোণ। অবশ্য টেবিলের বস্তু মার্বেল, বেত বা অন্য কিছু হ'তে পারত। এর আকারও তেমনি গোল অথবা অন্য কিছু হওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু কোন না কোন বস্তু ও আকার ছাড়া কোন টেবিলই হ'তে পারে না।

কাণ্টের মতে জ্ঞানের বেলায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ভাবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। প্রত্যেক জ্ঞানেরই দুই দিক—আকারের দিক ও বিষয় বা বস্তুর দিক। বিষয় বা বস্তু ছাড়া শুধু আকার শূন্যগর্ভ, আবার আকার ছাড়া শুধু বস্তু অন্ধ।[৩] আকার যেন একটা ছাঁচের মত ফাঁপা—বস্তু দিলেই তা পূর্ণ হয়।

১। 'Hume roused me from dogmatic slumber'.

২। আকার—Form ; বস্তু—Matter.

৩। 'Concepts without percepts are empty and percepts without concepts are blind."

আর যেখানে শুধু বস্তু আছে কিন্তু তার কোন আকার নেই সেখানে বস্তুর কোন রূপ পাওয়া যায় না। অন্ধ মানুষ কোনরূপই জানতে পারে না। সুতরাং আকারহীন বস্তুকে অন্ধই বলা যেতে পারে।

এখন প্রশ্ন হল—জ্ঞানের আকারই বা কি আর তার বস্তু-প্রকৃতিই বা কি? আর এদের কি করে পাওয়া যায়? এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কাণ্ট বুদ্ধিবাদ ও প্রত্যক্ষবাদের বক্তব্য বিচার ক'রে নিজের সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন।

আমরা দেখেছি, বুদ্ধিবাদের মতে বুদ্ধিই সত্যজ্ঞান দিতে সক্ষম। প্রথম জীবনে কাণ্ট একথার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি মনে করতেন—শুধু ধারণা থেকেই আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারি। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউমের বই পড়ে তাঁর ধারণা বদলে যায়। তিনি বুঝতে শেখেন বস্তু ছাড়া শুদ্ধ ধারণা বলে কিছু হতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান হতে গেলে ধারণা ও বস্তু দুইই দরকার। বুদ্ধি দিয়ে ধারণা পাওয়া যায়, কিন্তু বস্তু পাওয়া যায় না। বস্তু পেতে হ'লে বস্তুর প্রত্যক্ষ বা সংবেদন প্রয়োজন।

প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদের মতে শুধু সংবেদন থেকেই জ্ঞান হয়। কিন্তু কাণ্ট বললেন—শুধু সংবেদন থেকে জ্ঞানের বস্তু পাই, আকার না পেলে জ্ঞান হ'তে পারে না। সুতরাং প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকেরা পূর্ণ সত্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁদের মতবাদ অর্ধ সত্য বহন করে মাত্র। অন্যদিকে বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। তাঁদের মতে শুধু বুদ্ধিজাত ধারণা থেকেই জ্ঞান হয়। কিন্তু কাণ্ট বললেন—বুদ্ধিজাত ধারণা জ্ঞানের আকার দিতে পারে বটে, কিন্তু তা জ্ঞানের বিষয় দিতে পারে না, আর জ্ঞানের বিষয় ও আকার দুইই না পেলে জ্ঞান হয় না। সুতরাং জ্ঞান হ'তে গেলে বুদ্ধিজাত ধারণা ও সংবেদনজাত বস্তু উভয়ই দরকার। কাণ্ট এইভাবে প্রত্যক্ষবাদ ও বুদ্ধিবাদের মধ্যে নিহিত সত্য গ্রহণ ক'রে এক সমন্বিত মতবাদ (Synthetic theory) সৃষ্টি করলেন। কাণ্টের মতে জ্ঞান হতে গেলে বুদ্ধি ও সংবেদন[১] দুইই দরকার। বুদ্ধি থেকে আমরা জ্ঞানের আকার পাই আর সংবেদন আমাদের জ্ঞানের বস্তু দিয়ে থাকে। যেহেতু কাণ্ট সমস্ত জ্ঞান ব্যাপার, বিশেষ করে প্রত্যক্ষবাদ ও বুদ্ধিবাদ বিচার বিশ্লেষণ ক'রে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সেজন্য কাণ্টের এই মতবাদকে বিচারবাদ বলা হয়।

১। বুদ্ধি—Understanding; সংবেদন—Sensibility

১ সংবেদন দিযে জ্ঞানের বিষয়ের যে পরিচয আমরা পাই তার নাম অনুভব।[১] সংবেদন নিষ্ক্রিয় ব্যাপার। বহির্বিশ্ব থেকে আগত বস্তু-অনুভব নিষ্ক্রিয় ভাবে দেশ ও কালের মধ্যে ধারণ করাই তার কাজ। দেশ ও কাল অনুভবের দু'টি পূর্বতঃ সিদ্ধ আকার।[২] এদেব পূর্বতঃ সিদ্ধ আকার এই অর্থে বলা যায যে, এই আকার ছাড়া কোন অনুভব সম্ভব নয। সুতবাং এরা অনুভব-সাপেক্ষ নয, ববং অনুভবই এদের ওপর নিভর করে। দেশ ও কালের মধ্যে সংবেদন যে অনুভব ধারণ কবে বুদ্ধি সক্রিযভাবে তার ওপর বুদ্ধির আকার[৩] লাগিযে দেয। বুদ্ধির আকারে আকাবিত হ'যে দেশ ও কালস্থিত অনুভব জ্ঞান-পদবাচ্য হয। বহির্বিশ্ব থেকে আগত কেবলমাত্র অনুভব জ্ঞান দিতে পারে না। অনুভব বুদ্ধিব আকাবের সঙ্গে সংযুক্ত হযেই জ্ঞান সম্ভব করে তোলে।' এই বুদ্ধিব আকার অবশ্য কোন ব্যক্তিবিশেষেব বুদ্ধির আকার নয। এগুলো সকল মানুষের মধ্যেই যে সাধাবণ বুদ্ধি আছে তারই আকার। সুতবাং এই বুদ্ধির আকাবে আকারিত করে যে অনুভব আমরা লাভ কবি তা সকলের কাছেই এক রকম। কিন্তু এই জ্ঞান বস্তু-স্বরূপের[৪] জ্ঞান দিতে পারে না। কারণ সমস্ত জ্ঞানেই আমাদেব বুদ্ধির আকার থাকে। সুতরাং অবিমিশ বস্তু স্বরূপ আমরা কখনই জানতে পাবি না। যা আমরা জানি তা বুদ্ধির আকার-বিমিশ্র বস্তুরূপ।' কাণ্ট জ্ঞানের এই বিষযের নাম দিযেছেন অবভাস[৫]। অবভাসের জ্ঞানই আমাদের পক্ষে সম্ভব। বস্তু-স্বরূপের জ্ঞান আমরা কখনই পাই না। কিন্তু বস্তু-স্বরূপের অস্তিত্ব না মেনে উপায নাই। সংবেদন নিষ্ক্রিযভাবে বহির্বিশ্ব থেকে আগত অনুভব ধারণ করে। অনুভব সংবেদন-সৃষ্ট নয। সুতরাং এই অনুভবের উৎস হিসেবে বস্তু-স্বরূপের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হ'বে।'

সমালোচনা—কাণ্ট অনেক বিচার বিশ্লেষণ ক'রে এই বিচারবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু এত করা সত্ত্বেও কাণ্টের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হযনি। **জ্ঞানোৎপত্তির দিক থেকে তিনি এক অসমন্বিত দ্বৈত ধারণার**[৬] সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মতে জ্ঞানোৎপত্তির জন্য সংবেদন ও বুদ্ধি উভযেরই সমন্বয আবশ্যক। সংবেদন সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয়, আর বুদ্ধি একান্তভাবেই সক্রিয। সুতরাং সংবেদন ও বুদ্ধি একেবারেই বিপরীতধর্মী। এই দুই বিপরীতধর্মী

১। Intuition
২। A—priori forms of Intuition
৩। Categories of understanding
৪। Thing-in-itself
৫। Phenomenon
৬। Epistemological Dualism

প্রক্রিয়া কি করে একত্র হ'য়ে জ্ঞান উৎপন্ন করে তার কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা কাণ্ট দেন নি। সুতরাং তাঁর মতে জ্ঞানোৎপত্তির জন্য অপরিহার্য দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা দ্বৈতভাব আছে। কাণ্ট এই দ্বৈতভাব সমন্বয়ের কোন চেষ্টা করেন নি।

বস্তু-সত্তার দিক থেকেও কাণ্ট এক দ্বৈত ধারণার সৃষ্টি করেছেন।[১] তাঁর মতে অবভাসের জ্ঞানই আমাদের পক্ষে লাভ করা সম্ভব। বস্তু-স্বরূপ আছে, কিন্তু আমরা তা জানতে পারি না। এই ক্ষেত্রে বস্তু-অবভাস ও বস্তু-স্বরূপ এক দ্বৈত বোধ সৃষ্টি করেছে। কাণ্ট পরিষ্কার ভাবে বস্তু-স্বরূপ ও বস্তু-অবভাসের দ্বন্দ্ব সমন্বিত কবার চেষ্টা করেন নি।

দ্বান্দ্বিকবাদ (Dialectic Theory) :

কাণ্ট তাঁব বিচাববাদে একদিকে সংবেদন ও বুদ্ধি, অন্যদিকে বস্তু-অবভাস ও বস্তু-স্বরূপের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও দ্বৈতত্ব সৃষ্টি করেছেন। হেগেল দ্বান্দ্বিকবাদে এক বৃহত্তর তত্ত্বের সাহায্যে এই দ্বন্দ্ব ও দ্বৈতত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেছেন। এক বৃহত্তর ধারণায় বিপরীত ধারণার সমন্বয়ই দ্বান্দ্বিকবাদের মূল কথা। হেগেল বলেছেন —বুদ্ধির আকার যেহেতু সংবেদন-লভ্য অনুভবে লাগান যায়, সুতরাং বুদ্ধি ও সংবেদনের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন মিল আছে। বুদ্ধি ও সংবেদনে কোন মিল না থাকলে কখনও বুদ্ধির আকার সংবেদন-লভ্য অনুভবে লাগত না। হেগেল মনে করেন, বুদ্ধি ও সংবেদন উভয়ই অদ্বয় চিন্তার[২] ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। সংবেদনের সঙ্গে বুদ্ধির কোন মৌলিক তফাৎ নেই। এদের তফাৎ শুধু অদ্বয় চিন্তার প্রকাশের স্পষ্টতার মাত্রাভেদে। বুদ্ধিতে অদ্বয় চিন্তাব প্রকাশ স্পষ্ট; কিন্তু সংবেদনে অস্পষ্ট। সুতরাং বুদ্ধি ও সংবেদনের মধ্যে কোন অসমন্বিত দ্বৈতত্ব নেই।

হেগেলের মতে বুদ্ধি ও বস্তু অদ্বয় চিন্তার দু'টি বিভিন্ন প্রকাশ। যদি এরা এক অদ্বয় চিন্তার বিভিন্ন প্রকাশ না হত তবে বুদ্ধির আকার বস্তুতে কখনই লাগত না। সুতরাং বুদ্ধির আকার লাগিয়ে যে অবভাস পাই তা বস্তু-স্বরূপের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই সম্পর্কিত। কাজেই বস্তু-অবভাস ও বস্তু-স্বরূপের মধ্যেও কোন দ্বৈতত্ব বা দ্বন্দ্ব নেই।

এইভাবে হেগেল কাণ্টের বিচারবাদের দোষত্রুটি দূর করে এক সুযুক্তিপূর্ণ ভিত্তির ওপর নিজের দ্বান্দ্বিকবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই মতবাদ খণ্ডন করা শক্ত।

১। Ontological Dualism

২। Absolute Thought

পঞ্চম অধ্যায়

জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃতি—বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ ও ভাববাদ

(The Nature of Object of Knowledge—Realism and Idealism)

জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্ক প্রকাশ করে। যিনি জানেন তাঁর নাম জ্ঞাতা, আর যে বস্তু জানা যায় তার নাম জ্ঞেয়। সমস্ত জ্ঞানেই কোন একজন লোক কোন একটি বস্তু জানে। সুতরাং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্পর্কই জ্ঞান।

এখন প্রশ্ন হ'ল—জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃতি কি? যা জানি তা কি জানার ওপর নির্ভর করে? না জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞান-নিরপেক্ষ ভাবেই থাকে? এই সব প্রশ্নের উত্তর দুই দলের দার্শনিক দু'রকম ভাবে দিয়েছেন। একদলের মতে জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। দর্শনের ইতিহাসে এই দলের নাম ভাববাদী দার্শনিক।[১] আর এক দলের মতে জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়। বস্তু জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা নিয়েই বিরাজমান। এই দলের নাম বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক।[২] ভাববাদী দার্শনিকদের মত ভাববাদ[৩] ও বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের বক্তব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ[৪] নামে পরিচিত।

যদি চিন্তার অগ্রগতির ইতিহাস আলোচনা করা যায় তবে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদকেই প্রথমে পাওয়া যাবে। মানুষ প্রথমতঃ বস্তু জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র এই ধারণা নিয়েই চিন্তা শুরু করে। পরে বিচার বিশ্লেষণের পর কেউ কেউ বস্তু জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল—একরকম ভাবতে থাকেন। এঁরাই ভাববাদী দার্শনিক। সুতরাং কালানুক্রমিক বিচারে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ আগে, তারপর ভাববাদের উৎপত্তি। আমরা এই অধ্যায়ে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ ও ভাববাদের বক্তব্য একটু বিশদভাবে আলোচনা করব।[৫]

১। Idealists ২। Realists ৩। Idealism ৪। Realism

৫। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যে 'রিয়েলিজম্' ও 'আইডিয়েলিজম্'—এই দু'টি শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হয় তা আলোচনা করা যেতে পারে। দর্শনে 'রিয়েলিজম্' ও 'আইডিয়েলিজম্' বলতে যা বোঝায়, সাহিত্যে কিন্তু তা আদৌ বোঝায় না। সাহিত্যে 'রিয়েলিজম্' বলতে বাস্তবতা বোঝায়, বস্তুস্বাতন্ত্র্য নয়। সাহিত্যের 'আইডিয়েলিজম্'ও ভাববাদ নয়, আদর্শবাদ। যখন কোন সাহিত্যিক সংসারে যা ঘটে, আছে বা থাকে তা আপন মনের রসায়নে রসায়িত ক'রে প্রকাশিত করেন, তখন আমরা তাঁকে বাস্তবধর্মী (Realistic) সাহিত্যিক বলি। কেউ কেউ অবশ্য এমন কথাও বলেন যে, যা ঘটে তা সবই সত্যি নয়। কবি বা সাহিত্যিক 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' যা

বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ (Realism) :

বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের মতে, জ্ঞানের বিষয় কোন রকমেই জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়। জ্ঞেয় বস্তুর একটা জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা আছে। আমরা যখন কোন একটা স্থান প্রথম জানি তখন আমরা জানলাম বলেই স্থানটির সৃষ্টি হ'ল—এমন কথা সত্য নয়। স্থানটি আছে বলেই আমরা তা জানতে পারি। আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ার আগে আমেরিকাকে কেউ জানত না। কিন্তু তা বলে তখন আমেরিকা ছিলই না—এমন কথা বলা যায় না। আসলে মানুষ যখন আমেরিকার কোন পরিচয়ই জানত না তখনও আমেরিকা ছিল। সুতরাং আমেরিকার অস্তিত্ব কোন মানুষের জ্ঞানের ওপর আদৌ নির্ভর করে না।

রচনা করেন, তাই সত্য। আমরা এখানে এই বিষয়ে কোন জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করতে চাই না। কারণ এই পুস্তকে আমাদের আলোচ্য বিষয় দর্শন, সাহিত্য নয়। এখানে একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, সমাজ ও সংসারের প্রাত্যহিক জীবনকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য গড়ে ওঠে তাই বাস্তব-ধর্মী সাহিত্য। সাহিত্যে বাস্তবতা বলতে সংসারে যা ঘটে তারই সহৃদয় প্রকাশ বুঝতে হবে। ঘটনা কিভাবে ঘটা উচিত তা নয়, কি ভাবে ঘটে—তাই যেখানে উপজীব্য তারই নাম বাস্তব-ধর্মী সাহিত্য। বাংলার শরৎ-সাহিত্য বাস্তব-ধর্মী সাহিত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের ব্যক্তি ও সমাজজীবনের স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব, ব্যথা ও বেদনা, সুখ ও দুঃখ, আশা ও নৈরাশ্য প্রাণস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করেছেন শরৎচন্দ্র। সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে, মানুষের হৃদয়-হীনতার বিরুদ্ধে সামাজিক মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সহজ ও সাধারণ ঘটনার মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র মানুষের মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সমাজে কি হওয়া উচিত ছিল, কি হ'লে ভাল হ'ত—তার সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র বিশেষ কিছু বলেন নি। সমাজে যা হয়, তা যে প্রায়ই কত দুঃখের, কত বেদনার তা-ই তাঁর আলোচনার বিষয়।

যখন কোন সাহিত্যিক যা ঘটে তার দ্বারা পরিচালিত না হ'য়ে যা ঘটা উচিত তার দ্বারা পরিচালিত হন তখন তাঁকে বলব আদর্শবাদী সাহিত্যিক। কোন একটি বিশেষ আদর্শকে মনে রেখে সাহিত্যিক যখন তাঁর মানস কন্যা ও পুত্রদের সেই ছাঁচে গড়ে তোলেন তখন যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তার নাম আদর্শবাদী সাহিত্য। এখানে সমাজে কি ঘটে সে দিকে প্রায়ই লক্ষ্য রাখা হয় না, লেখকের আদর্শানুসারে কি ঘটা উচিত তারই ওপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই শ্রেণীর লেখক। কৃষ্ণকান্তের উইলে তিনি যে রোহিণীকে গুলি করে মেরেছেন তা একান্তভাবেই তাঁর আদর্শের খাতিরে। রোহিণীকে তার সমস্ত স্বাভাবিক দুর্বলতা, কলঙ্ক ও ক্ষুধা নিয়ে বাঁচতে দেওয়াই উচিত ছিল—স্বাভাবিক মানুষের এই দাবী। যা স্বাভাবিক তা আদর্শের দৃষ্টিতে যতই খারাপ হোক না কেন, স্বাভাবিক বলেই তা সত্য।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সাহিত্যে বাস্তবতা ও আদর্শবাদ যথাক্রমে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ ও ভাববাদের চেয়ে একটু অন্য ধরণের। সুতরাং সাহিত্যে 'রিয়েলিজম্' ও 'আইডিয়েলিজম্' বলতে আমরা যে দর্শনের 'রিয়েলিজম্' ও 'আইডিয়েলিজম্' বুঝি না তা মানতেই হবে।

বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলেন, জ্ঞানের বিষয় না থাকলে কোন জ্ঞানই হয় না। জ্ঞান বিষয় বা বস্তু দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত (determined) হয়ে থাকে। কিন্তু বিষয় বা বস্তুর অস্তিত্ব কখনই জ্ঞানের দ্বারা নিযন্ত্রিত হয না। জ্ঞান ছাড়াও বস্তু থাকতে পারে।

বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের দ্বিতীয কথা হচ্ছে এই যে, বস্তুর সঙ্গে জ্ঞানের কোন আন্তরিক সম্পর্ক নাই। যখন কোন বস্তু আর একটি বস্তু ছাড়া কখনই থাকতে পাবে না তখন সাধাবণতঃ তাদেব সম্পককে আন্তরিক সম্পর্ক (Internal Relation) বলা হয। যে কোন বস্তুই কোন মানুষেব জ্ঞানেব বিষয না হযেও অনাযাসে থাকতে পারে। সকল মানুষেবই অজ্ঞাত কোন বস্তু থাকা অসম্ভব নয। কলম্বাসেব আমেবিকা আবিষ্কারের আগে আমেরিকা ত ছিলই, মানুষ তা জানত না মাত্র।

বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদেব তৃতীয বক্তব্য এই যে, জ্ঞানেব বিষয বা বস্তু সংখ্যায একাধিক। ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। আমরা বিভিন্ন সমযে বিভিন্ন বস্তুই ত জানি। এই সমস্ত বস্তুরই জ্ঞানাতিবিক্ত সত্তা আছে। সুতরাং সত্য বস্তুর অসংখ্যতা স্বীকার করতেই হবে।

সমস্ত বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরাই বস্তুর জ্ঞান-নিরপেক্ষতা, জ্ঞান ও বস্তুতে আন্তরিক সম্পর্কহীনতা ও সত্য বস্তুর অসংখ্যতায বিশ্বাস করেন। কিন্তু বস্তু কতটুকু পরিমাণে জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র ও বস্তুকে কিভাবে জানা যায এবিষয়ে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। যে কোন বস্তুকেই আমরা বিশ্লেষণ করি না কেন তাব দ্রব ত্ব (Substantiality) ও কতগুলো গুণ পাওযা যায। 'কমলা লেবু'কে—বিশ্লেষণ করলে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, আকার, ঘনত্ব প্রভৃতি কতগুলো গুণ পাওয়া যাবে। এই গুণগুলো একত্রিত হ'যে যাতে থাকে তার নাম দ্রব্য। দ্রব্য বস্তু-গুণের আধার বিশেষ। বস্তুর দ্রব্যত্ব যে একান্তভাবেই জ্ঞানাতিরিক্ত এবিষযে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু কোন বস্তুর গুণগুলোর সবই জ্ঞানাতিরিক্ত, না কিছু কিছু গুণ জ্ঞান-সাপেক্ষ—এ নিযে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মধ্যে মতভেদ আছে। যে সব বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক বস্তুর দ্রব্যত্ব ও সমস্ত গুণ জ্ঞানাতিরিক্ত বলে মনে করেন—তাঁদের নাম সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক (Naive Realists)। আর একদল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী আছেন যাঁদের মতে দ্রব্যত্ব ও কতগুলো গুণ জ্ঞানাতিরিক্ত বটে, কিন্তু অন্য কতগুলো গুণ জ্ঞান-সাপেক্ষ। এঁদের নাম বৈজ্ঞানিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক (Scientific Realists)। প্রথম দলের দার্শনিকদের মতে বস্তু সরাসরিই

জানা যায়। সেজন্য তাঁদের সাক্ষাৎ বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীও (Direct Realists) বলা হয়। দ্বিতীয় দলের মতে বস্তুর জ্ঞান বস্তুর প্রতীক বা ছাপের মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব ; বস্তু কখনই সরাসরি জানা যায় না। সেজন্য এঁদের প্রতীকবাদীও (Representationists) বলা হয়। প্রথম দলের মতবাদ সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ বা সাক্ষাৎ বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ (Naive or Direct Realism) আর দ্বিতীয় দলের মত বৈজ্ঞানিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ বা প্রতীকবাদ (Scientific Realism or Representationism) নামে পরিচিত।

পরবর্তীকা'ল সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের পথ অনুসরণ করে আর একদলের বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক দেখা দিয়েছেন। এঁদের মতবাদ নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ (Neo-Realism) নামে খ্যাত। বিচারমূলক বা বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ (Critical Realism) নাম দিয়ে আধুনিক একদলের দার্শনিক এক নূতন রকমের বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ পত্তন করেছেন। এঁদের বক্তব্য অনেকটা প্রতীকবাদেরই মত। আমরা এখন বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের বিভিন্ন শাখা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব।

সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ বা সাক্ষাৎ বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ

(Naive or Direct Realism)

বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের মূলকথা—বস্তু বা বিষয় জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়। সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের মতে বিষয়ের দ্রব্যত্ব ও গুণ—উভয়ই জ্ঞানাতিরিক্ত। আমরা বস্তুর যে সমস্ত গুণ জানি তার সবগুলোই বস্তুতেই থাকে। বস্তুতে নেই এমন গুণ কখনই জানা যায় না। বিষয় বা বস্তু না থাকলেও জ্ঞান হয় না। বিষয় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বা জ্ঞান বিষয় অনুযায়ীই হ'যে থাকে। আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা সরাসরিই জানতে পারি। যা কিছু আমরা সরাসরি জানি তা সবই সত্যি।

এই মতবাদকে সাধারণ লোকের মতবাদ[১]-ও বলা যেতে পারে। বস্তু সরাসরি জানা যায় আর বস্তু না থাকলে জানা যায় না—এই ত সাধারণ লোকের ধারণা। সাধারণ জ্ঞানের[২] সঙ্গে এই মতবাদের মিল আছে, সরল বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে এই-ই সব চেয়ে বড় যুক্তি। এই মতবাদে সাধারণ লোকের

১। Common sense theory
২। Common sense

সরল ধারণা পাওয়া যায় বলে এর নাম সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ। এই মতানুসারে বিষয় সরাসরি বা সাক্ষাৎভাবে জানা যায় বলে এর আর এক নাম সাক্ষাৎ বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদ।

সমালোচনা : এই মত সত্য হ'লে আমাদের কখনই ভুল জ্ঞান হওয়া উচিত নয়। সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে বিষয় না থাকলে জ্ঞানই হয় না। কিন্তু আমরা অনেক সময় যেখানে কিছু নেই সেখানে ভুল ক'রে কোন বস্তু দেখি।[১] আবার কখনও কখনও এক বস্তুতে অন্য বস্তুরও জ্ঞান হয়।[২] অন্ধকার রাত্রিতে অনেকেই ত রজ্জুকে সর্প বলে মনে করে। রজ্জুতে সর্প নেই, অথচ সর্পের জ্ঞান হয়। সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকেরা এই জাতীয় জ্ঞানের কোন সৎ ব্যাখ্যা দিতে পারেন না।

স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুর জ্ঞানের ব্যাখ্যাও এই মতবাদে মেলে না। স্বপ্নে আমরা নানারকমের বস্তু দেখি। কিন্তু এসব বস্তু তেমনিভাবে জগতে প্রায়ই থাকে না। সুতরাং এই সব বস্তু জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়, এমন কথা বলা যায় কি ?

এই মতবাদের আর একটি ত্রুটিও লক্ষণীয়। এই মতানুসারে বস্তুর সমস্ত গুণই বস্তুগত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আলোচনায় দেখা গেছে যে বস্তুর সমস্ত গুণই বস্তুগত নয় ; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণ জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। একই জিনিস কারো কাছে সুস্বাদু, আবার কারো কাছে সুস্বাদু নয় বলে মনে হয়। কিন্তু কোন জিনিসই একই লোকের কাছে একই সঙ্গে সুস্বাদু ও সুস্বাদু নয়—দুইই হ'তে পারে না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে স্বাদ বস্তুগত ব্যাপার নয়, ব্যক্তিগত ব্যাপার—এমনই ভাবতে হ'বে। যে ব্যক্তি বস্তুর স্বাদ যেমন বলে মনে করে তার কাছে বস্তুর স্বাদ তেমনই বটে। ঠিক তেমনি ক'রে একই বস্তুর রূপ, গন্ধ ও স্পর্শ বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন রকম হ'তে পারে। সুতরাং এই গুণগুলোও ব্যক্তি-জ্ঞান-সাপেক্ষ একথা বলতে হ'বে।

বৈজ্ঞানিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ বা প্রতীকবাদ
(Scientific Realism or Representationism)

দার্শনিক জন লক্ সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের দোষত্রুটি দূর করার জন্য বৈজ্ঞানিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ বা প্রতীকবাদের পত্তন করেছেন। লকের মতে বস্তুর সমস্ত

১। যেখানে কিছু নেই সেখানে কিছু দেখাকে মনোবিজ্ঞানে **'Hallucination'** বলে।
২। **Illusion**

গুণই একজাতীয় নয়। কতগুলো গুণ বস্তুগত আর কতগুলো গুণ ব্যক্তিগত বা জ্ঞানগত। যে সমস্ত গুণ বস্তুগত তাদের নাম মুখ্য গুণ[১], আর যে সমস্ত গুণ ব্যক্তিগত বা জ্ঞানগত তাদের নাম গৌণ গুণ[২]। বস্তুর আয়তন, সংখ্যা, ঘনত্ব প্রভৃতি গুণকে মুখ্যগুণ বলা হয়। এই সমস্ত গুণ সকল লোকের কাছেই একরকম বলে মনে হয়। কিন্তু আর কতগুলো গুণ আছে যা ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি এই জাতের অন্তর্গত। এদের নাম গোণ গুণ। বস্তুর দ্রব্যত্ব ও মুখ্য গুণগুলোই জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। গৌণ গুণ একান্তভাবেই জ্ঞান-নির্ভর।

লকের সমকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় গুণের এই দুই ভাগ স্বীকৃত ছিল লক্ নিজের বক্তব্য তৎকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বলে তাঁর মতবাদ বৈজ্ঞানিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ নামে পরিচিত।

আমরা আগেই দেখেছি, সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ ভ্রান্ত জ্ঞানের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে নি। সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের এই দোষ দূর করার জন্য লক্ প্রতীকবাদের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মতে আমরা কোন বস্তুই সরাসরি জানতে পারি না। আমাদের ইন্দ্রিয়পথে ছাপ বা প্রতীক এসে মনের পর্দায় দাগ কাটে। আমরা সরাসরি এই ছাপ বা প্রতীক বা ধারণাই জানতে পারি। যখন কোন প্রতীক বা ধারণা জানি, তখন এর পশ্চাতে যে বস্তু আছে, তাও জানি। সুতরাং বস্তু-জ্ঞান প্রতীক বা ধারণার মাধ্যমেই হ'য়ে থাকে। যখন প্রতীক বা ধারণার সঙ্গে বস্তুর মিল হয় তখন আমরা সত্যজ্ঞান লাভ করি। আমাদের ধারণার সঙ্গে যখন বস্তুর মিল হয় না তখন জ্ঞান হয় মিথ্যা। এই মতানুসারে বস্তুর প্রতীকই আমরা সরাসরি জানি বলে এর নাম দেওয়া হ'য়েছে প্রতীকবাদ।

এই মতের সাহায্যে সহজেই ভ্রান্ত জ্ঞান ব্যাখ্যা করা যায়। রজ্জুতে যখন আমরা সর্প দেখি, তখন সর্প আমাদের একটা ধারণা বা প্রতীক মাত্র। এই প্রতীকের সঙ্গে বস্তুর মিল নেই বলে সর্পজ্ঞান সত্য নয়, মিথ্যা।

সমালোচনা: ভ্রান্তজ্ঞান ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা আপাতদৃষ্টিতে প্রতীক-বাদের একটি বিশেষ গুণ বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে প্রতীকবাদ ভ্রান্তজ্ঞানের যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, তা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এ ছাড়াও প্রতীকবাদের আরও দোষত্রুটি আছে।

১। Primary Qualities

২। Secondary Qualities

প্রথমতঃ, প্রতীকবাদের মতে বস্তু কখনই সরাসরি জানা যায় না। যা সরাসরি জানা যায় না তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সহজেই সন্দেহ প্রকাশ করা যেতে পারে। দার্শনিক বার্কলি এই সূত্র ধরেই জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। জন লক্ প্রতীকবাদের পত্তন করে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের শ্মশান-শয্যা রচনা করেছেন। কারণ বার্কলির ভাববাদ এই প্রতীকবাদের ওপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠেছে। বার্কলি বলেছেন, যা আমরা সরাসরি জানি তা সবই যদি আমাদের ধারণা হয় তবে একমাত্র ধারণাই আছে—একথা স্বীকার করতে হ'বে। আর একমাত্র ধারণাই সত্য, জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু বলে কিছু নেই—একথা বললে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের মূলোচ্ছেদ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই মত স্বীকার ক'রে নিলে জ্ঞানের সত্যাসত্য নির্ণয় করা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। লক বলেছেন—ধারণার সঙ্গে বস্তুর মিল হ'লে জ্ঞান সত্য হ'বে। কিন্তু তাঁর মতে বস্তু সরাসরি জানা যায় না। সুতরাং যে বস্তু আমরা জানি না তার সঙ্গে ধারণা মিললো কি মিললো না তাও জানা যাবে না। আর তা জানা না গেলে বস্তুর সত্যাসত্য নির্ণয় করাও সম্ভব হবে না।

নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ (Neo-Realism) ঃ

এইমাত্র দেখলাম, লকের প্রতীকবাদ বার্কলির ভাববাদের গোড়াপত্তন করেছে। তাই আধুনিক কালে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের জয়ধ্বজা নিয়ে একদল উৎসাহী দার্শনিক প্রতীকবাদ বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁরা দল পাকিয়েছেন, বার্কলিব ভাববাদের বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ কবেছেন আব দশনের মন্দিরে কোলাহল জমিয়েছেন প্রচুব। এঁরা ভীষণ রকমেব বিদ্রোহী, আর এঁদের বিদ্রোহ মুখ্যতঃ বার্কলির ভাববাদের বিরুদ্ধে। হেগেলের পরব্রহ্মবাদকেও[১] এঁরা তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। সোজা কথায় সমস্ত রকমের ভাববাদের কবব খননই এঁদের কাজ। দর্শনের ইতিহাসে এই উৎসাহী গোষ্ঠীর মতবাদ নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ নামে পরিচিত। আমেরিকার হোল্ট, মার্ভিন, মণ্টেগু ও পেরী প্রভৃতি দার্শনিকেরা এই আন্দোলনের স্রষ্টা। ব্রিটিশ দার্শনিক মূর, রাসেল ও আলেকজাণ্ডার নানা দিক থেকেই এই আন্দোলনের সমর্থক। কিন্তু আমেরিকার নব্যতন্ত্রীদের সঙ্গে ব্রিটিশ দার্শনিকদের কোন কোন বিষয়ে মতানৈক্যও আছে।

১। Hegel's Absolute Idealism

লকের প্রতীকবাদ বার্কলির ভাববাদ সৃষ্টি করে ব'লে প্রথমেই নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা প্রতীকবাদ পরিত্যাগ করেছেন। তাঁরা বলেছেন—জ্ঞান ও বিষয়ের মধ্যে কোন প্রতীক বা ধারণা নেই। বিষয় বা বস্তু আমরা সোজাসুজি জেনে থাকি। এঁদের কথা অনেকটা সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের কথার মত। সেজন্য অনেকেই নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদকে সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদেরই নূতন সংস্করণ ব'লে মনে করেন। নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে, জ্ঞানের বিষয় সোজাসুজি এই জগতেরই বিষয়। ভাববাদীদের মতে, বিষয় জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। এঁরা ঠিক উল্টোভাবে বলেন—জ্ঞানই বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। শুধু তাই নয়। এঁরা আরও সাংঘাতিক কথা বলেন। আমেরিকার নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে মন বিষয়েরই একটা সংস্থামাত্র; বিষয় ভিন্ন মন ব'লে আলাদা কিছু নেই। হোল্ট ত মন বা চৈতন্যকে স্নায়বিক চক্রের বিশেষ সংক্ষোভ নির্দিষ্ট বিশ্বের একটা অংশ বলে মনে করেন।[১] বস্তুর সঙ্গে স্নায়বিক চক্রের সন্নিকর্ষ হ'লেই বিশ্বের অন্যান্য বস্তু থেকে সেই বস্তুটি আলাদা হ'য়ে যায়। এই বস্তুই জ্ঞানের বিষয় আর এটারই আর এক নাম মন। বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ জ্ঞানই মন বা চৈতন্য সৃষ্টি করে। জ্ঞান আর জ্ঞানের বিষয় একান্তভাবেই অভিন্ন। দুনিয়ায় মানসিক বা আধ্যাত্মিক[২] বলে কিছু নেই, সবই বিষয় বা বিষয়-সম্ভূত। কথাটা উদাহরণ দিয়ে বোঝান যেতে পারে। একটা বিশেষ মুহূর্তে 'ফুল' আমাদের জ্ঞানের বিষয় হ'তে পারে। এখন প্রশ্ন হ'ল—জ্ঞান হ'বে কি করে? হোল্ট বলবেন—আমাদের স্নায়ুর মধ্যে 'ফুল' সংক্ষোভ[৩] সৃষ্টি করবে। ফলে, ফুলটি জগতের অন্য বস্তু থেকে আলাদা হ'য়ে যাবে। কারণ ফুলটি স্নায়ুতে সংক্ষোভ সৃষ্টি করেছে, কিন্তু অন্য বস্তু তেমন ভাবে স্নায়ুকে সংক্ষুব্ধ করে নি। এই দিক থেকে স্নায়ুর সংক্ষোভ-স্রষ্টা 'ফুল' অন্য বস্তু থেকে ত আলাদাই হ'বে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে সংক্ষোভ-স্রষ্টা 'ফুল' জ্ঞানের বিষয়—এটাই জ্ঞান—আবার এই বস্তুই মন বা চৈতন্য। হোল্ট প্রভৃতি দার্শনিকেরা বলেন, ভাববাদী দার্শনিকেরা আত্মমুখী প্রবণতা[৪] থেকে দুনিয়াকে বিচার করেন ব'লে তাঁদের কাছে বিষয় জ্ঞান-নির্ভর মনে হয়। সমস্ত বস্তুই আত্মার ওপর নির্ভর করে

১। 'Cross-section of the universe selected by the specific response of the nervous system'—Holt.

২। Mental or Spiritual

৩। Irritation

৪। Ego-centric Predicament

এরকম মনে করাই আত্মমুখী প্রবণতার লক্ষণ। আত্মমুখী প্রবণতার জন্য সমস্ত বস্তুকেই আত্ম-কেন্দ্রিক[১] বলে মনে হয়। আত্মমুখী প্রবণতা মানুষের একটা দুর্বলতা বিশেষ। নিজেকে অহেতুক ভাবে সমস্ত বস্তুর কেন্দ্রস্থিত মনে করা দুর্বলতা ছাড়া আর কি হবে? এই দুর্বলতা দূর করতে পারলেই সত্যদৃষ্টি পাওয়া যেতে পারে। আর তখন মনে হবে, বস্তু একান্তভাবেই জ্ঞানাতিরিক্ত, জ্ঞান বস্তুরই সৃষ্টি। এমন কি ভ্রম-প্রমাদের বিষয়ও অবাস্তব[২] নয়।

ভাববাদীরা ভ্রম-প্রমাদের বিষয়কে জ্ঞান-সাপেক্ষ ব'লে মনে করেন, আর এই যুক্তিতে সমস্ত বস্তুই জ্ঞান-সাপেক্ষ এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছন। নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে ভ্রম-প্রমাদের বস্তু আদৌ জ্ঞান-নির্ভর নয়। ভ্রমাত্মক জ্ঞানের বিষয়ও জ্ঞান-নিরপেক্ষ ও বাস্তব। এখানে প্রশ্ন ওঠে—অন্ধকারে যখন রজ্জুতে ভুল ক'রে সাপ দেখি—তখন রজ্জু ও সর্প দুইই একসঙ্গে বাস্তব[৩] হবে কি করে? এই রকম ধরণের প্রশ্ন আশঙ্কা ক'রে নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা এবিষয়ে সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে সত্য ও মিথ্যা উভয় প্রকার জ্ঞানের বিষয়ই সৎ[৪]। এই সৎ বস্তু যখন দেশে ও কালে থাকে তখন তা সত্যজ্ঞানের বিষয় হয়, আর তখন তাকে স্থিতিসম্পন্ন বস্তু[৫] বলি। যে সৎ বস্তু দেশে ও কালে থাকে না তা যখন আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়, তখন আমাদের ভ্রমাত্মক জ্ঞান হয়ে থাকে। এই ভ্রমাত্মক জ্ঞানের বিষয় স্থিতিসম্পন্ন না হ'লেও বাস্তব। এই বস্তু সৎ এবং কোন দিক থেকেই তা মনের ওপর নির্ভরশীল নয়। রজ্জুতে যখন সর্প দেখি তখন সৎসর্পকে স্থিতিসম্পন্ন বলে মনে হয়। এই বিশেষ ক্ষেত্রে রজ্জু দেশে ও কালে থাকে, কিন্তু সর্প দেশে ও কালে থাকে না। একই দেশে ও কালে যদি রজ্জু ও সর্প দুইই থাকত তবে বিরোধ দেখা দিত। এখানে রজ্জু দেশকালস্থিত ও সর্প তা নয় বলে এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। আসলে সৎ বস্তুকে স্থিতিসম্পন্ন ব'লে মনে করার জন্যই ভ্রান্তজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। যে সৎবস্তু স্থিতিসম্পন্নও বটে তার জ্ঞানই সত্যজ্ঞান। বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকেরা ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয়ের বাস্তবতা প্রমাণ করতে আরও অনেক জটিল যুক্তিজালও বিস্তার করেছেন। এই জালে ধরা পড়লে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হ'বে। সুতরাং তাতে প্রবেশ না করাই ভালো। যেসব মনুষ্যের বক্তব্য বিশেষ কিছু থাকে না অথবা যাদের বক্তব্য পরিষ্কার নয়, তারা ভাষার

১। Ego-centric
২। Unreal
৩। Real
৪। Subsistent
৫। Existent

কুহেলিকা সৃষ্টি করে। আমাদের মনে হয় নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের অবস্থা অনেকটা সে ধরণের।

সমালোচনা: মহা আড়ম্বর ক'রে নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ভাববাদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, তা এক মহা বিড়ম্বনার সৃষ্টি করেছে। তাঁরা তর্কের ঝড় তুলেছেন, ঝড়ে ধূলোও উড়েছে প্রচুর। দৃষ্টি তাতে আমাদের আচ্ছন্ন হ'য়ে গেছে। সুতরাং সত্যদৃষ্টিলাভের পক্ষে এ এক মহা অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যা হোক্, প্রশান্ত মুহূর্তে আলোচনা ক'রে দেখলে মনে হয় নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের কতগুলো নূতন নূতন শব্দ ছাড়া বিশেষ কিছুই দেবার নেই। ভাষার কুহেলিকা ছিন্ন করলে মনে হবে সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদেরই এ এক নূতন সংস্করণ। সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতই—বস্তু সরাসরি জানা যায়—একথায় এঁরাও বিশ্বাস করেন। কিন্তু সৎবস্তু, স্থিতিসম্পন্ন বস্তু প্রভৃতি বস্তুর নানা রকমফের স্বীকার করে এঁরা ভ্রান্তজ্ঞানের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। আমরা দেখেছি, সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ভ্রান্তজ্ঞানের কোন সৎব্যাখ্যা দিতে পারেন না। নব্যতন্ত্রীরা ভ্রান্তজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়েই নানা জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। আমাদের ধারণা তাতে তাঁদের দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে—ভ্রান্তজ্ঞানের কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় অবাস্তব নয়। এরা সৎ, কিন্তু স্থিতিসম্পন্ন নয়। ভ্রান্তজ্ঞানে সৎ বস্তুকেই স্থিতিসম্পন্ন বলে মনে হয়। প্রশ্ন হ'ল, এ রকম মনে করার কারণ কি? নিশ্চয়ই কারণটা ব্যক্তিগত ও মানসিক। কারণ, কোন কোন ব্যক্তির কাছেই এই ভ্রান্তজ্ঞান উৎপন্ন হ'য়ে থাকে; সকলের কাছে হয় না। নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ভ্রমের কোন ব্যক্তিগত বা মানসিক কারণ স্বীকার করেন না। আমাদের বিবেচনায় ভ্রান্তজ্ঞান ব্যাখ্যায় নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের এটাই ভ্রম।

দ্বিতীয়তঃ, ভ্রান্তজ্ঞান ব্যাখ্যার অতি উৎসাহে নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা যে সৎ বস্তুর সৃষ্টি করেছেন এ জগতে তার দেখা মেলে না। রাসেল এই বস্তুর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—এগুলো মানসিকও নয় আবার জড়ীয়ও নয়[১]; এগুলোকে 'মাঝামাঝি পদার্থ[২]' বলা যেতে পারে। এই মাঝামাঝি পদার্থ একটা বিশেষ গঠন-প্রক্রিয়ায় মন বা চৈতন্যের সৃষ্টি করে আর অন্য এক গঠন-প্রক্রিয়ার জড়বস্তুর সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল—মানসিকও নয় আবার জড়ীয়ও

১। Neither mental nor physical

২। Neutral entities

নয় এমন কোন মাঝামাঝি পদার্থ আছে কি ? এ ত বুদ্ধিসৃষ্ট একটা কল্পনামাত্র। জগতে এমন ভৌতিক পদার্থ কখনই দেখা যায় না। আর তা ছাড়া এই পদার্থ মন বা জড়কে কি ক'রে সৃষ্টি করে তাও বোঝা যায় না। মন বা জড় উভয়ই পার্থিব বস্তু। কিন্তু মাঝামাঝি পদার্থ ত সেই অর্থে কখনই পার্থিব নয়। কারণ কেউ কোন দিন এই পদার্থ দেখে নি। কি ভৌতিক প্রক্রিয়ায় এই ভৌতিক পদার্থ জাগতিক মন ও জড়কে সৃষ্টি করে তা বোঝা যায় না।

তৃতীয়তঃ, ভাববাদ খণ্ডনের অতি উৎসাহে কোন কোন নব্য বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক ত মন বা চৈতন্যকে বস্তু বা বিষয়ে পরিণত ক'রে ফেলেছেন। এঁদের এই অপকর্মের বিরুদ্ধে এই দলেরই ব্রিটিশ দার্শনিক আলেকজেণ্ডার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর মতে, মন বা চৈতন্যের বস্তু-অতিরিক্ত সত্তা অবশ্যই স্বীকার করতে হ'বে। তিনি মনে করেন, মনটা যেন আলোর মত জগতের কতগুলো বস্তুকে আলোকিত করে। আমরা এই আলোকিত বস্তুগুলিই জানি। আলো আর আলোকিত বস্তু কখনই এক হ'তে পারে না। বিশেষতঃ মন আর বিষয়কে ত একভাবে জানাই যায় না। মন কখনও জ্ঞানের বিষয় হ'তে পারে না। মন জ্ঞাতা, কিন্তু জ্ঞেয় নয়। জ্ঞানের বিষয় হ'য়ে গেলে মন জ্ঞাতা থাকে না, জ্ঞেয় হয়ে যায়। সুতরাং জ্ঞানের বিষয় হিসেবে জ্ঞাতা মনকে কখনই জানা যায় না। আলেকজেণ্ডারের মতে জ্ঞাতার পরিচয় একজাতীয় অনুভূতিজাত সম্ভোগের[১] মধ্যে পাওয়া যায় আর বিষয় সাধারণ জ্ঞানেই[২] লাভ করা যেতে পারে। সুতরাং এই দিক থেকেও মন আর বিষয় কখনও এক হ'তে পারে না।

ব্রিটিশ দার্শনিক আলেকজেণ্ডার নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের এক নূতন ভাষ্য দিয়েছেন। আমরা এখন অতি সংক্ষেপে তাঁর জ্ঞান-তত্ত্ব আলোচনা করব।

মার্কিন নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মত অদ্ভুত রকম নূতন কথা বলার ঝোঁক আলেকজেণ্ডার সাহেবের নেই। তিনি অনেকটা সংযমী। তাই সহজ ভাবেই তিনি জ্ঞান-তত্ত্বের আলোচনা শুরু করেছেন। সমস্ত কিছুই বিষয় বা বিষয়াকার—এমন অসত্যভাষণ তাঁর দর্শনে নেই। তিনি বিশ্বের সমস্ত বস্তুকে দুভাগে ভাগ করতে বলেন—মন ও বহির্বস্তু। এক ভাগের সঙ্গে আর এক-ভাগের সংযোগ[৩] ঘটলে. জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়। ভেবে দেখতে হ'বে

১। Enjoying

২। Contemplated

৩। Compresence or Togetherness

এ সংযোগ ঠিক কোন্ জাতের। ভাববাদীরা এই সংযোগে মনের অযথা প্রাধান্য দেন। তাঁরা মনে করেন, যেহেতু কোন বস্তুর জ্ঞান না হ'লে বস্তুটি জানা যায় না, সুতরাং জ্ঞাত বস্তু ছাড়া বস্তুই নেই। আলেকজেণ্ডার মনে করেন, কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বস্তুর জ্ঞাততা ধর্ম জ্ঞান-নির্ভর বটে, কিন্তু বস্তু-সত্তা কখনই জ্ঞান-নির্ভর নয়। আমরা জানি না এমন অনেক বস্তুই আছে। মন বস্তুর চেয়ে উন্নত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলে বস্তু মনের ওপর নির্ভরশীল নয়। মন ও বস্তু উভয়েরই স্বতন্ত্র সত্তা আছে। ফলে জ্ঞান যে সংযোগের ফল তা কেবল দুটি স্বতন্ত্র বস্তুর সংযোগমাত্র। এ সংযোগ অতি সাধারণ একত্র সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। গাছের সঙ্গে ঘাসের, ডিমের সঙ্গে টেবিলের যেমন একত্র সমাবেশ হয়, জ্ঞানও তেমনি মনের সঙ্গে বস্তুর একত্র সমাবেশ মাত্র। ঘাস ও গাছ, ডিম ও টেবিল যখন একত্র সমাবিষ্ট হয় তখন সত্তার দিক থেকে একটি আর একটির ওপর নির্ভর করে না। জ্ঞানের বেলাতেও মন ও বস্তু যখন একত্র হয় তখন একটি আর একটির ওপর নির্ভর করতে পারে না। তা হ'লে প্রশ্ন উঠবে জ্ঞানগত সমাবেশের সঙ্গে সাধারণ সমাবেশের কোন তফাৎই নেই কি? উত্তরে আলেকজেণ্ডার সাহেব বলেন, সমাবেশের প্রকৃতির দিক থেকে জ্ঞান-গত সমাবেশ ও সাধারণ সমাবেশের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, তফাৎ শুধু সমাবিষ্ট বস্তুর প্রকৃতির দিক থেকে। জ্ঞান ভিন্ন অন্য সমাবেশে উভয় বস্তুই বিষয় মাত্র, কাজেই সেখানে জ্ঞানের উদয় হয় না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমাবিষ্ট বস্তুর একটি অন্যটির চেয়ে একটু উন্নত ধরণের। মন বস্তুর চেয়ে উন্নত, তাই সে বস্তুকে জানতে পারে। কিন্তু তা বলে মন বস্তুকে সৃষ্টি করে এমন কথা বলা যাবে না।

মন যখন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তুর সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট হয় তখন বস্তুর কতগুলো গুণ প্রয়োজন অনুসারে মন আলাদা করে নেয়। এই আলাদা করা গুণগুলো বস্তুরই গুণ। কখনও কখনও মনের এই নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে বস্তুর নির্দেশে হয় না। তখন ভ্রান্ত জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। আলেকজেণ্ডার মনে করেন, মানসিক প্রক্রিয়ার জন্যই এরকম হ'য়ে থাকে। ব্যক্তিগত মানসিক প্রক্রিয়া বস্তু যেখানে আছে সেখান থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে অন্য আর এক জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করে। ভ্রান্ত জ্ঞানের বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বাস্তবই বটে, কিন্তু অংশগুলো বাস্তবে যেমনভাবে আছে তেমনভাবে ভ্রান্ত জ্ঞানে থাকে না।' এই মতবাদের সঙ্গে ভারতীয় নৈয়ায়িকদের 'অন্যথা খ্যাতিবাদ'-এর যথেষ্ট মিল আছে। নৈয়ায়িকদের মতে ভ্রমে যে বস্তু ভাসে তা মনের

ধারণা মাত্র নয়। ভ্রান্ত জ্ঞানের বিষয় জাগতিক বস্তুই বটে। তবে বস্তুটিকে যথাস্থানে না দেখাতেই ভ্রান্ত জ্ঞানের উদ্ভব হয়। কথাটা উদাহরণ দিয়ে বোঝান যেতে পারে। অন্ধকারে লোকে রজ্জুতে যখন সর্প দেখে তখন অন্য সময় অন্যত্র যে সর্প দেখা গিয়েছিল তারই স্মৃতি রজ্জুতে প্রত্যক্ষের কারণ হয়। সুতরাং এই ভ্রান্তজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সর্প দেখা যায় তা বাস্তবই বটে, তবে যে বিশেষ স্থানে তাকে দেখা যাচ্ছে সেখানে তা নেই।

সমালোচনা—এই জাতীয় চিন্তাধারার বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে, ভ্রমে যে সর্প দেখি তা যদি অন্যত্র থাকে তবে সেই সর্প দর্শনে লোকে ভয় পাবে কেন? অথচ আমরা জানি অন্ধকারে রজ্জুতে সর্প দেখে অনেকেরই ভয় হয়। সুতরাং লোক-ব্যবহার অন্যথা খ্যাতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

আর একটা কথাও বলবার আছে। আলেকজেণ্ডার বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক হিসেবে জ্ঞানের বিষয়ে মনের কোন অবদান স্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু তিনি বলেছেন, মানসিক প্রক্রিয়াই (Squintment of mind) ভ্রমের জন্য দায়ী। একথা বললে ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয় যে মানস-সৃষ্ট নয় তা মানা যাবে না। আর তা হ'লে ভাববাদেরই জয় হ'বে। সুতরাং আলেকজেণ্ডার সাহেবের ভ্রান্তজ্ঞান-ব্যাখ্যা ভাববাদের পথই প্রশস্ত করে দেয়।

বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ
বা
বিচারমূলক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ (Critical Realism)

নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের অসুবিধেগুলি দূর করার জন্য একদল মার্কিন দার্শনিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের নবভাষ্য রচনা করেছেন। ড্রেক, প্র্যাট্, সাণ্টায়ন প্রভৃতি দার্শনিক এই দলের স্রষ্টা। এদের নবভাষ্য বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ নামে পরিচিত। বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা এক ভ্রান্ত মতবাদ থেকে দর্শন শুরু করেছেন। নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের ধারণা বস্তু সোজাসুজিই জানা যায়। বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে এই ধারণা সর্বৈব মিথ্যা।

বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলেন, বস্তু যদি সোজাসুজিই জ্ঞানের বিষয় হ'ত তবে ভ্রান্তজ্ঞানের কখনই উদ্ভব হ'ত না। যা আমরা সরাসরি জানি তা কখনও ভুল হতে পারে না। কিন্তু আমাদের ভ্রান্তজ্ঞানের ত' অভাব

নেই। অন্ধকার রাত্রে প্রায়ই ত' লোকে রজ্জুকে সর্প বলে ভুল করে। সুতরাং বস্তু কখনই সরাসরি জানা যেতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে জ্ঞানের বিষয়ই জ্ঞান বা চৈতন্য। কিন্তু তা হ'লে প্রশ্ন উঠবে—বিভিন্ন লোক একই সময়ে একই বস্তু দেখে কি করে? রামবাবু যখন আকাশের চাঁদ দেখেন তখন চাঁদ বস্তুটাই যদি রামবাবুর জ্ঞান বা চৈতন্য হয় তবে সেই সঙ্গে সেই চাঁদই আবাব শ্যামবাবুর জ্ঞান বা চৈতন্য হ'বে কি ক'রে? রামবাবুর ও শ্যামবাবুর একই বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান ত' আর একই জ্ঞানই নয়। সুতরাং একই বস্তু বিভিন্ন জ্ঞানাকারে প্রকাশিত হয় কি করে? এ সমস্যার মীমাংসা সহজ নয়। আসলে নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা একই সময়ে কি করে বিভিন্ন লোক একই বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে তার সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারেন না।

তৃতীয়তঃ, বিজ্ঞান সবসময় বস্তুর সঙ্গে চৈতন্যের সাক্ষাৎ পরিচয় স্বীকার করতে পারে না। যে নক্ষত্র লক্ষ মাইল দূরে তার আলো যখন বহু বছর পরে চৈতন্যে এসে পৌছায়, তখনই তার জ্ঞান হয়। তাই চেতনার সঙ্গে নক্ষত্রের কোন সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। নক্ষত্রের আলোর সঙ্গেই চৈতন্যের সাক্ষাৎ পরিচয়। প্রত্যেক প্রত্যক্ষের বেলায়ই ত' এ রকম ভাবা যেতে পাবে।

চতুর্থতঃ, একই বস্তুর বিভিন্ন প্রত্যক্ষ হতে পারে। সুস্থ চোখ যে জিনিস 'সবুজ' দেখে, অসুস্থ চোখ তাকেই 'হল্‌দে' দেখতে পারে। এসব উদাহরণের বেলায় যদি জ্ঞানের জিনিস বহির্বস্তু বলে মানতে হয় তবে বস্তুটি একই সঙ্গে 'সবুজ' ও 'হল্‌দে' এমন অদ্ভুত কথা বলতে হ'বে। কিন্তু তা কি আর হয়?

নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের কথা মানা যায় না বলে ভাববাদ মানবারও সঙ্গত কোন কারণ নেই। প্রত্যক্ষের বিষয় বহির্বস্তু নয় বলেই তা মনের ধারণা মাত্র নয়। যখন একটা গোলাকার ফুটবল মাঠে গড়িয়ে যেতে দেখি তখন তা নিশ্চয়ই মনের ধারণা নয়। মনের ধারণা কখনই গোল হতে পারে না, আর তা মাঠে গড়িয়েও যেতে পারে না। সুতরাং যা জানি তা কখনই মনের ধারণামাত্র হ'তে পারে না। তা হ'লে প্রশ্ন ওঠে—আমরা সরাসরি কি জানি? বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকেরা এ প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে অত্যন্ত জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের মতে বহির্বস্তু মানবমনে এক রকম প্রভাব প্রেরণ করে। এই প্রভাবকে আশ্রয় করেই বস্তুর প্রত্যক্ষ সম্ভব। জ্ঞাতা যে জিনিস সোজাসুজি জানে সে জিনিস

বহির্বস্তুও নয়, মনের ধারণামাত্রও নয়; তা বহির্বস্তুর কাছ থেকে পাওয়া একপ্রকার প্রভাব বিশেষ। বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে বস্তুর যে প্রভাব আমরা সোজাসুজি জানি তার নাম 'স্বভাব-বিমিশ্র'[১] বা 'আন্তর সত্তা'[২] দেওয়া যেতে পারে। এই 'স্বভাব-বিমিশ্র' বা 'আন্তর সত্তা' জড়ও নয় আবার চেতনও নয়, এগুলো বুদ্ধিগ্রাহ্য পদার্থ বিশেষ।[৩] এই 'আন্তর সত্তা' গ্রহণ করবার পর মানুষ বহির্জগতে এদের বাস্তব উৎস কল্পনা করে নেয়। সে কল্পনা যেখানে যথার্থ প্রত্যক্ষ সেখানে সত্য, যেখানে অযথার্থ প্রত্যক্ষ সেখানে ভ্রান্ত।

বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা প্রত্যেক জ্ঞানেরই তিনটি অঙ্গ স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষকারী মন, বহির্বস্তু ও ইন্দ্রিয়োপাত্ত[৪] এই তিন অঙ্গ। ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বভাব-বিমিশ্র বা আন্তর সত্তা নামে পরিচিত। প্রত্যক্ষকারী মন সরাসরি আন্তর সত্তাই জানে। আন্তর সত্তা থেকে বহির্বস্তু কল্পনা করে নেওয়া হয়। বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বিষয় ভিন্ন মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁদের মতে জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞাতা মন কখনই এক হ'তে পারে না।

বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের বক্তব্য ভাল করে লক্ষ্য করলে এই মতবাদ প্রতীকবাদেরই নব সংস্করণ বলে মনে হয়। প্রতীকবাদী লকের মতে বস্তুর প্রতীক বা ধারণার মধ্য দিয়েই আমাদের বস্তু-জ্ঞান হ'য়ে থাকে। বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতেও বস্তুর প্রভাব আন্তর সত্তা বা স্বভাব-বিমিশ্রের মাধ্যমেই বস্তুর জ্ঞান সম্ভব হয়। কিন্তু বৈচারিক মতবাদীরা নিজেদের প্রতীকবাদী বলে পরিচয় দিতে রাজী নন। তারা বলেন, যদিও বস্তু আন্তর সত্তার মাধ্যমেই জানা যায় তবুও বস্তু আমরা সরাসরিই জানি। মানুষ যখন চোখ দিয়ে কোন বস্তু দেখে তখন সে নিশ্চয়ই সরাসরিই বস্তুটি দেখে থাকে; চোখ দিয়ে দেখে বলে সে সরাসরি দেখে না, এমন কথা বলা যায় না। ঠিক তেমনি করে যদিও আমরা আন্তর সত্তার মাধ্যমে বস্তু জানি তথাপি তা সরাসরিই জানি।

সমালোচনাঃ—বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে বস্তুর আন্তর সত্তাই আমরা সরাসরি জানতে পারি। আন্তর সত্তা দেখে বস্তু-স্থিতি আমরা কল্পনা ক'রে নেই। আমরা যা কল্পনা করি তার সম্বন্ধে অতি সহজেই সংশয় পোষণ করা যেতে পারে। সুতরাং বস্তু-স্থিতিও সন্দেহের বিষয়।

১। Character complex ২। Essence
৩। Logical entities ৪। Sense datum

দ্বিতীয়তঃ, বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে বুদ্ধিগ্রাহ্য আন্তর সত্তার মাধ্যমে বস্তুর জ্ঞান হয়। কিন্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য আন্তর সত্তা কি ভাবে বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত তা না জানলে আন্তর সত্তার মাধ্যমে বস্তুর জ্ঞান কী করে সম্ভব তা ত' বোঝা যায় না। আর বুদ্ধিগ্রাহ্য আন্তর সত্তার সঙ্গে দেশকালস্থিত বস্তুর কোন সম্পর্ক হতে পারে কি ?

তৃতীয়তঃ, বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা আন্তর সত্তার মাধ্যমে বস্তু জানলেও বস্তু সরাসরি জানা যায় বলে মনে করেন। উদাহরণ হিসেবে তাঁরা বলেন— মানুষ যখন চোখ দিয়ে কোন বস্তু দেখে তখন ত' সে সরাসরিই দেখে। আমাদের মনে হয়, উদাহরণে যে তুলনা দেওয়া হয়েছে, তা ঠিক হয়নি। জ্ঞাতা যে চোখ দিয়ে দেখে সে চোখ ত' জ্ঞাতার দেহেরই অঙ্গ। সুতরাং অঙ্গী অঙ্গ দিয়ে সরাসরিই যে কোন বস্তু পাবে তাই স্বাভাবিক। কিন্তু আন্তর সত্তা ত' বস্তুর অঙ্গ নয়; কারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য আন্তর সত্তা দেশকালস্থিত বস্তুর অঙ্গ হ'তে পারে না। সুতরাং আন্তর সত্তার মাধ্যমে যখন বস্তু জানা যায় তখন বস্তু সরাসরিই জানা যায় এমন কথা ভাবা যায় না। আসলে বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতীকবাদেরই নামান্তর মাত্র।

বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হল। কিন্তু বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের কোন ভাষ্যই যুক্তির কষ্টিপাথরে টিকলো না। বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের সমস্ত বহ্বারম্ভ লঘুক্রিয়াতে সমাপ্ত হয়েছে। এখন আমরা বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের চিরশত্রু ভাববাদ নিয়ে আলোচনা করব।

ভাববাদ (Idealism)

ভাববাদের মতে বিষয় জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। কোন বিষয়ই জ্ঞান-নিরপেক্ষভাবে থাকতে পারে না। জ্ঞানের সঙ্গে বিষয়ের সম্পর্কও আন্তরিক[১] জ্ঞান ছাড়া বিষয় ভাবাই যায় না। দুনিয়ায় একমাত্র জ্ঞানই স্বয়ংনির্ভর ও পরনিরপেক্ষ। বিষয় নিয়তই জ্ঞান-নির্ভর ও জ্ঞান-সাপেক্ষ। সুতরাং বিষয়ের কোন আত্যন্তিক সত্তা[২] নেই। জ্ঞানই চরম সত্য ও সত্তা। জ্ঞানকে আত্মা, চৈতন্য বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হিসাবেও ভাবা যেতে পারে।

ভাববাদের এই মূল বক্তব্যের পক্ষে নানা রকমের যুক্তির অবতারণা করা হয়। আমরা এখানে শুধু প্রধান যুক্তিগুলোরই উল্লেখ করব।

১। Internal
২। Ultimate reality

(১) কখনও কখনও যেখানে যে বস্তু নেই সেখানে সেই বস্তু দেখা যায়। অন্ধকারে অনেক সময়েই আমরা রজ্জুকে সর্প মনে করে ভয় পাই। এই ক্ষেত্রে সর্প মনের একটি ধারণা মাত্র। যদি এই বিশেষ ক্ষেত্রে মনের ধারণাকে বাইরের বস্তু বলে মনে হয়, তবে বাইরের সমস্ত বস্তুই যে মনের ধারণা নয় তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। ভাববাদীদেব মতে ভ্রমে ভাসমান সর্পের মত সমস্ত বস্তুই মনের ধারণা।

(২) বিজ্ঞানীরা বলেন, অনেক নক্ষত্রের আলো পৃথিবীতে এসে পৌছোতে কোটি কোটি বৎসর কেটে যায়। এক কোটি বছর আগে যে আলো নক্ষত্র থেকে যাত্রা সুরু করেছে সে হয়ত আজ এসে আমাদের কাছে পৌছোল। ইত্যবসরে নক্ষত্রটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমরা যখন আজ নক্ষত্র দেখছি তখন সত্যি সত্যি নক্ষত্রটি আছে কি-না এ বিষয়ে সন্দেহ করা যেতে পারে। বিশেষতঃ নক্ষত্র না থাকলেও কখনও কখনও তার আলো আমরা দেখতে পারি সুতরাং বস্তু না থাকলেও তার জ্ঞান হতে পারে।

(৩) যখনই যে বস্তু জানা যায় তখনই তা জ্ঞাত বস্তু রূপে জানা যায়। সুতরাং না জানলে বস্তু থাকে এমন ত' কোন প্রমাণ নেই।

(৪) ডেকার্টে দেখিয়েছেন যে, সমস্ত বস্তুকেই সংশয় করা যায়। কিন্তু সংশয়াত্মাকে সংশয় করা যায় না। যা সংশয় করা যায় না—তা-ই একমাত্র সত্য। সুতরাং আত্মাই চরম সত্য। আত্মা আবার জ্ঞান-স্বরূপ। সুতরাং জ্ঞানকেই পরম সত্য বলা যেতে পারে।

ডেকার্টে কি করে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছোলেন তা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। ডেকার্টে প্রথমে সব কিছুকেই সংশয় করে দার্শনিক চিন্তা সুরু করেছেন। তাঁর মতে বিশ্বের বস্তুরাজ্য অতি সহজেই সংশয় করা যায়। অন্ধকারে যেখানে সর্প নেই সেখানে যেমন আমরা সর্প দেখি, তেমনি যেখানে জগৎ নেই সেখানে জগৎ দেখি, এমন ত' অতি অনায়াসেই ভাবা যেতে পারে। গণিতেব জ্ঞান সম্বন্ধেও সংশয় সম্ভব। এমন হতে পারে যে দুষ্ট স্রষ্টার কূট ইচ্ছায় সমস্ত গাণিতিক প্রক্রিয়াব গোড়াতেই গলদ রয়ে গেছে। সুতরাং গণিতেব জ্ঞানও নিশ্চয়তা দাবী করতে পারে না। এরকম করে সব কিছুই সংশয় করা যায়। কিন্তু যিনি সংশয়াত্মা তাঁকে কখনই সংশয় করা যায় না। তাঁকে সংশয় করলে সংশয় করার কর্তাই যে কেউ থাকবে না। সংশয় করার কর্তা ছাড়া কি কখনও সংশয় হতে পারে? সুতরাং সংশয়ের প্রক্রিয়ার মধ্যেই সংশয়াত্মার অস্তিত্বের নিশ্চয়তা নিহিত আছে।

(৫) বার্কলি বলেন, যে কোন বস্তুকে বিশ্লেষণ করলে কতগুলো গুণ পাওয়া যায় মাত্র। লকের মতে এসমস্ত 'গুণ একজাতীয় নয়—কতকগুলো মুখ্য আর কতকগুলো গৌণ। বস্তুর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গৌণ; কারণ এগুলো ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। এই গুণগুলোকে ব্যক্তিনির্ভরও বলা যেতে পারে। কিন্তু বস্তুর আকৃতি, আয়তন, ঘনত্ব প্রভৃতি গুণ লকের মতে ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয় না। সুতরাং এই সব মুখ্য গুণ। বার্কলি বলেন, বস্তুর, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি যেমন ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন রূপ নেয়, ঠিক তেমনি আকার প্রভৃতিও বিভিন্ন রূপ নেয়। সুতরাং আকার প্রভৃতি মুখ্য গুণও ব্যক্তিনির্ভর। লক গুণ ছাড়াও বস্তুতে গুণের আধার বলে এক অজ্ঞাত তত্ত্বের[১] অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই অজ্ঞাত তত্ত্বের নাম দিয়েছেন তিনি দ্রব্য। বার্কলি বলেন, অজ্ঞাত দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করার পেছনে কোন যুক্তি নেই। যা জানি না তা আছে, এমন কথাও জানি না। সুতরাং বস্তুতে গুণাতিরিক্ত দ্রব্য বলে কিছু নেই। এই বকম করে বার্কলি বস্তুকে ব্যক্তিনির্ভর কতগুলো ধারণার সমষ্টিতে পবিণত করলেন। প্রত্যেক বস্তুই কতগুলো গুণের সমষ্টিমাত্র, আর সব গুণই ব্যক্তির ধারণা মাত্র। সুতরাং বস্তু ব্যক্তির কতগুলো ধারণা ছাড়া আব কি হবে?

এই সব বিভিন্ন যুক্তির ওপরে ভাববাদের ইমারৎ দাঁড়িয়ে আছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দার্শনিক ভাববাদের ভিৎ ভেঙ্গে দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করেন নি। ভাববাদের প্রকারভেদ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ভাববাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুক্তিগুলো আলোচনা করব।

ভাববাদের প্রকারভেদ :—আমরা দেখেছি, ভাববাদের মতে বিষয় জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল; জ্ঞান বা চৈতন্য বা আত্মাই চরম সত্য ও সত্তা। সহজ ভাষায় বলতে গেলে ভাববাদের মতে সত্তার স্বরূপ ভাবাত্মক বা আধ্যাত্মিক।[২]

বিষয় কার জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল—এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ভাববাদীদের মধ্যে মতভেদ আছে। বার্কলির মতে বিষয় ব্যক্তি-জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। এই মতবাদ বিজ্ঞানবাদ[৩] নামে পরিচিত। হেগেলের মতে বিষয় কোন

১। Know-not-what (Substance)
২। Spiritual
৩। Subjective Idealism

ব্যক্তি-জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়; এক অনন্ত জ্ঞান বা অনন্ত চৈতন্য বিষয়ের নির্ভর। এই মতবাদ পরব্রহ্মবাদ[1] নামে পরিচিত। আর এক জাতের ভাববাদ হতে পারে যেখানে বিষয় কোন বিশেষ জ্ঞান-নির্ভর না হয়েও ভাবাত্মক বা আধ্যাত্মিক। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো আর জার্মান দার্শনিক লাইব্‌-নিজ্‌ এই মতবাদে বিশ্বাসী। আমরা এঁদের মতবাদই প্রথম আলোচনা করব। তারপর বিজ্ঞানবাদ ও পরব্রহ্মবাদ আলোচনা শেষে এই অধ্যায়েব উপসংহার হবে।

প্লেটোর ভাববাদ

প্রাচীন গ্রীস দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক প্লেটোকে ভাববাদের আদি গুরু বলা যেতে পারে। তাঁর মতে সমস্ত ব্যক্তি ও বিশেষ বস্তুই ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী। ব্যক্তি ও বিশেষ বস্তু নিয়ে যে জগৎ গড়ে উঠেছে তাও অস্থির ও বিনাশী। সুতরাং এই জগৎ ও জগতের ব্যক্তি ও বিশেষ বস্তু শাশ্বত নয়। যা বিশেষ নয়, ব্যক্তি নয়, সামান্য[2] বা জাতি তা ভঙ্গুরও নয়, ক্ষণস্থায়ীও নয়। কত ব্যক্তি জন্মাল আর মরল, কিন্তু মনুষ্যজাতির মরণ কখনও ঘটল না। জাতি বা সামান্যই শাশ্বত ও সনাতন। ব্যক্তির শত পরিবর্তন সত্ত্বেও জাতির কোন পরিবর্তন হয় না। এই জাতি বা সামান্যই একমাত্র সত্য বস্তু। জাতি বা সামান্যকে প্লেটো কখনও কখনও আকার[3], কখনও বা ধারণা[4] বলেছেন। ব্যক্তি যেন বস্তু[5], আর জাতি তার আকার। যা আকার তা ধারণাও বটে। সমস্ত ধারণারই কোন না কোন বস্তু থাকে। জাতি হচ্ছে ধারণা আর ব্যক্তি হচ্ছে তার বস্তু।

ব্যক্তি নিয়ে যেমন এই ইন্দ্রিয়ের জগৎ, জাতি নিয়ে তেমনি ভাবের জগৎ[6]। প্লেটোর মতে ভাবের জগৎ শাশ্বত ও সনাতন। সেই জগতের কোন ক্ষয়-ক্ষতি নেই, পরিণাম-পরিণতিও নেই। ভাবের জগৎ সত্যের জগৎ। ইন্দ্রিয়ের জগৎ মিথ্যার জগৎ। প্লেটো বলেছেন, ইন্দ্রিয়ের জগৎ যেন ভাবের জগতের ছায়া মাত্র। জাতি হচ্ছে কায়া আর ব্যক্তি হচ্ছে ছায়া। জাতি নিয়ে যে ভাবের জগৎ তা যেন কায়ার জগৎ। আর ব্যক্তি নিয়ে যে ইন্দ্রিয়ের জগৎ তা যেন ছায়ার জগৎ। ভাব বা ধারণাই কায়া, বস্তু ছায়া মাত্র।

১। Absolute Idealism
২। Universal
৩। Form
৪। Idea
৫। Matter
৬। Spiritual world

সমালোচনা ঃ—প্লেটোর লেখা পড়লে কাব্য পাঠের আনন্দ পাওয়া যায়। 'রিপাবলিক'-এর যে জায়গায় প্লেটো ছায়ার জগৎ আর কায়ার জগতের বর্ণনা দিয়েছেন সে এক অপূর্ব সৃষ্টি। প্লেটোর চিন্তাধারা যেন মানুষকে এই ধূলিমলিন সংসার থেকে অনেক উর্ধ্বে উধাও করে নিয়ে চলে। অনুভূতি দিয়ে প্লেটোকে যখন বুঝতে চেষ্টা করি তখন সত্যিই তাঁকে অপূর্ব ও অদ্ভূত বলে মনে হয়। কিন্তু যুক্তি দিয়ে যখন তাঁর মতবাদ বিচার করি তখন নানা দোষ-ত্রুটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

আমরা জানি জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ব্যক্তি ছাড়া জাতিকে ভাবাই যায় না। রাম, শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতি কোন ব্যক্তিই নেই অথচ মনুষ্যজাতি আছে, এমন কখনই হতে পারে না। প্লেটো কিন্তু জাতি ও ব্যক্তির এই নিবিড় সম্পর্ক স্বীকার করেন নি। প্লেটোর মতে জাতির সঙ্গে ব্যক্তির আসমান জমিন ফারাক্। জাতি যেন আকাশের ভাবের জগতের অধিবাসী, আর ব্যক্তি এই মলিন মাটির লোক।

দ্বিতীয়তঃ, জাতি ব্যক্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে কি করে ভাবের জগতে থাকে, তা বোঝা যায় না। ব্যক্তি ছাড়া কোন জাতিই থাকতে পারে না। এমনিতে জাতি অমূর্ত। কিন্তু ব্যক্তির মধ্যেই জাতি মূর্তি গ্রহণ করে। প্লেটোর ধারণা জাতি নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে ব্যক্তির স্পর্শ বাঁচিয়ে ভাবের জগতে থাকতে পারে। কথাটা সত্যি নয়।

তৃতীয়তঃ, প্লেটোর মতে ইন্দ্রিয়ের জগৎ ভাবের জগতের ছায়া মাত্র। কিন্তু তিনি ভাবের জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়ের জগৎকে এত দূরে নির্বাসন দিয়েছেন যে, ভাবের জগতের ছায়া সেখানে পড়তেই পারে না।

চতুর্থতঃ, ভাবের জগতের অধিবাসী 'জাতি'দের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে প্লেটো পরিষ্কার করে কিছু বলেন নি। কোথাও কোথাও তিনি 'শিব'[১]-এর ধারণাকে সকলের ওপরে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য ধারণাব মধ্যে কি সম্পর্ক সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু বলেন নি। এ বিষয়ে আমাদের কৌতূহল অতৃপ্তই থেকে গেছে।

লাইব্‌নিজের ভাববাদ

জার্মান দার্শনিক লাইব্‌নিজের বুদ্ধিবাদ কিছু আগে জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। এখন সত্তা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য

১। Good

আমরা আলোচনা করব। লাইব্‌নিজের মতে চরমতত্ত্ব অবিভাজ্য ও অস্তিত্ব-সম্পন্ন হ'বে। যা বিভাজ্য তা ভঙ্গুর। আর যা ভঙ্গুর তা কখনই সত্য হ'তে পারে না। সুতরাং চরমতত্ত্ব বা সত্য অবিভাজ্য হ'বে। যার অস্তিত্ব নেই তার পূর্ণতা নেই, কারণ অস্তিত্ব পূর্ণতার অঙ্গ-বিশেষ। চরমতত্ত্ব কখনই অপূর্ণ হ'তে পারে না সুতরাং চরমতত্ত্ব অস্তিত্ববান হ'বে।

এখন প্রশ্ন হল—অবিভাজ্য অথচ অস্তিত্ববান এমন তত্ত্ব কি আছে? লাইব্‌নিজ গ্রীসেব পরমাণুবাদী[১] ও আধুনিককালের কার্টেজিয দার্শনিকদের মতবাদ সমন্বিত করে এ প্রশ্নেব উত্তর দিযেছেন। গ্রীসের পরমাণুবাদীদের মতে বস্তুর পরমাণুই আদিম তত্ত্ব। বস্তুকে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যে সূক্ষ্মতম অংশ পাওযা যায় ও যাকে আব ভাঙ্গা যায না তারই নাম পরমাণু। লাইব্‌নিজ্ মনে করেন, পবমাণু জডাত্মক[২] বলে তা কখনও অবিভাজ্য হ'তে পাবে না। যা-ই জডাত্মক তারই বিস্তৃতি আছে, কারণ বিস্তৃতিই জডের লক্ষণ। পরমাণু জড বলে নিশ্চযই তা বিস্তৃতিসম্পন্ন হ'বে। আর যা ই বিস্তৃতিসম্পন্ন তাই বিভাজ্য। সুতরাং জডাত্মক পরমাণু কখনই চরমতত্ত্ব হ'তে পারে না।

কার্টেজিয মতবাদে গাণিতিক বিন্দুকে সূক্ষ্মতম তত্ত্ব বলা হ'য়েছে। এই বিন্দু নিঃসন্দেহে অবিভাজ্য। গণিতে বিন্দু বলতে এমন জিনিস বোঝায যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ কিছুই নেই। যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ নেই তার বিস্তৃতিও নেই। আর যার বিস্তৃতি নেই তা বিভাজ্য নয। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই—গাণিতিক বিন্দু একান্তভাবেই অমূর্ত বস্তু। যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ কিছুই নেই—এমন বস্তু জগতে থাকতে পারে না। সুতরাং গাণিতিক বিন্দু অবিভাজ্য হ'লেও অস্তিত্বসম্পন্ন নয। যা অস্তিত্বসম্পন্ন নয় তা কখনও চরমতত্ত্ব হ'তে পারে না।

গ্রীসের পরমাণুবাদ আর কার্টেজিয মতবাদ আলোচনা ক'রে লাইব্‌নিজ্ এমন পরমাণুর সন্ধান করতে লাগলেন যা জড়পরমাণুর মত অস্তিত্বসম্পন্ন হ'বে ও কার্টেজিয় বিন্দুর মত অবিভাজ্য হ'বে। লাইব্‌নিজ্ ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত করলেন যে, পরমাণু যদি চেতন ও ভাবাত্মক[৩] হয তবেই তা একাধারে অবিভাজ্য ও অস্তিত্বসম্পন্ন হবে। সুতরাং লাইব্‌নিজের শেষ কথা দাঁডাল এই যে—চেতন ও ভাবাত্মক পরমাণুই[৪] চরমতত্ত্ব।

চঞ্চলতা, গতি ও অস্থিরতাই বিশ্বের প্রকৃতি। অবিরাম চলাই জগতের নিযম। সুতরাং বিশ্বের চরমতত্ত্ব গতিহীন বা অচঞ্চল হ'তে পারে না।

১। Greek atomists
২। Material
৩। Spiritual
৪। Monad

লাইব্‌নিজ্‌ বললেন—চেতন পরমাণু স্বভাবতঃই গতিশীল। কিন্তু সমস্ত চেতন পরমাণুই সমানভাবে গতিশীল নয়। যে সমস্ত চেতন পরমাণুর গতিশীলতা বা সক্রিয়তা অন্য সমস্ত পরমাণু থেকে কম তারাই জড় বলে প্রতিভাত হয়। আসলে জড় চেতনই বটে, এখানে চৈতন্য অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন মাত্র। চরমতত্ত্ব যদি এক হয় তবে কোন গতি থাকতে পারে না। একাধিক চরমতত্ত্বের অস্তিত্বই জাগতিক চঞ্চলতা ও অস্থিরতা ব্যাখ্যা করতে পারে। সুতরাং লাইব্‌নিজ্‌ বহু চেতন পরমাণুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়েছেন। তাঁর এই মতবাদ বহুতত্ত্ববাদী ভাববাদ[১] নামে পরিচিত।

লাইব্‌নিজ্‌ প্রত্যেক চেতন পরমাণুকেই অন্যনিরপেক্ষ ও স্বনির্ভর বলে মনে করেন। কোন পরমাণুই অন্য পরমাণুর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এখানে প্রশ্ন ওঠে, এই অবস্থায় জগতের সুসমঞ্জস রচনা পারিপাট্যের ব্যাখ্যা হ'বে কি করে? অন্যনিরপেক্ষ ও স্বনির্ভর চেতন পরমাণুগুলো এমন সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত আছে কেন? পারস্পরিক প্রভাবের অভাবে এদের উচ্ছৃঙ্খলতাই ত' স্বাভাবিক। এই প্রশ্নের উত্তরে লাইব্‌নিজ্‌ এক পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলার[২] উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে সৃষ্টির সময়েই বিভিন্ন চেতন পরমাণু-গুলোর মধ্যে এক শৃঙ্খলা স্থাপিত হ'য়ে গেছে, আর ঈশ্বর এই শৃঙ্খলা স্থাপন করেছেন। ঈশ্বর সমস্ত চেতন পরমাণুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরমাণু[৩]। অন্য সমস্ত পরমাণু ঈশ্বর থেকেই এসেছে।

সমালোচনা :—লাইব্‌নিজ বহু চেতন পরমাণুর পরমতত্ত্বের বিশ্বাস নিয়ে দার্শনিক চিন্তা শুরু করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন তিনি দেখলেন যে একাধিক স্বাধীন পরমাণুর পারস্পরিক শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করা যায় না তখন চরমতত্ত্ব হিসেবে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানতে বাধ্য হলেন। নিরুপায় হয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস লাইব্‌নিজের দার্শনিক জীবনের চরম পরাজয় সূচনা করে।

লাইব্‌নিজ্‌ শেষের দিকে সমস্ত চেতন পরমাণু ঈশ্বরের শৃঙ্খলা মেনে চলে, একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। সমস্ত চেতন পরমাণুই যদি পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলা মেনে নিতে বাধ্য হয় তবে চেতন পরমাণুকে আর স্বনির্ভর বলা যায় না। লাইব্‌নিজ প্রথম জীবনে চেতন পরমাণুকে স্বনির্ভরই বলেছিলেন।

১। Pluralistic Idealism

২। Pre-established Harmony

৩। Monad of monads

এই দিক থেকে লাইব্‌নিজের প্রথম জীবনের সঙ্গে শেষ জীবনের চিন্তা-ধারার একটা বিরোধ লক্ষ্য করা যায়।

সর্বশেষে লাইব্‌নিজ্ চেতন পরমাণুদের মধ্যে শৃঙ্খলা-স্থাপক হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানতে বাধ্য হয়েছেন। লাইব্‌নিজের মতে ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ চেতন পরমাণু। তিনি আরও মনে করেন যে, এক চেতন পরমাণু অন্য চেতন পরমাণুর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাহ'লে ঈশ্বর নিজে এক চেতন পরমাণু হ'য়ে কি করে অন্য চেতন পরমাণুদেব মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করবেন, তা বোঝা যায় না।

বিজ্ঞানবাদ : বার্কলি

বিজ্ঞানবাদ ভাববাদের এক বিশেষ রূপ। বিজ্ঞানবাদ-মতে জাগতিক সমস্ত বস্তুই ব্যক্তি-জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। দুনিয়ায় মন ও তার ধারণাই একমাত্র সত্য। ব্রিটিশ দার্শনিক বার্কলির নামের সঙ্গেই এই মতবাদ বিশেষ ভাবে জড়িত। বাকলির বিজ্ঞানবাদ বুঝতে হ'লে দার্শনিক জন লকের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। বার্কলির বিজ্ঞানবাদ লকের চিন্তা-ধারার সূত্র ধরেই গড়ে উঠেছে।

জন লক প্রতীকবাদে বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন, বস্তু কখনই সোজা-সুজি জানা যায় না। বস্তু জানতে গেলেই ইন্দ্রিয়পথে তার ছাপ বা প্রতীক এসে মনে দাগ কাটে। এই ছাপ বা প্রতীকই আমরা সোজাসুজি জানি। লক ছাপ বা প্রতীকের নাম দিয়েছেন 'ধারণা'। যখন আমরা কোন ধারণা জানি তখন এর পেছনে যে একটা বস্তু আছে তাও জানি।

বার্কলি বলেন, আমরা যা সোজাসুজি জানি তা যদি সর্বদাই কোন না কোন প্রতীক বা ধারণা হয়, তবে প্রতীক বা ধারণাই একমাত্র আছে, একথা মানতে হ'বে। যে বস্তু আমরা কখনই সোজাসুজি জানি না তা আছে এমন কথা বলার কোন সঙ্গত কারণ নেই। সুতরাং বস্তু বলে কিছু নেই, যা আছে সবই মনের ধারণামাত্র। মন ছাড়া ত' আর মনের ধারণা থাকতে পারে না। কাজেই মন ও তার ধারণাই কেবলমাত্র আছে —একথা বলতে হ'বে। এভাবে লোকের প্রতীকবাদ থেকে বার্কলি বিজ্ঞান-বাদের সিদ্ধান্তে এসে পৌছোলেন।

জন লকের জ্ঞান-তত্ত্ব আলোচনা ক'রে কিভাবে বিজ্ঞানবাদে আসা যায় তার পরিচয় দেওয়া হ'ল। লকের বস্তু-তত্ত্ব আলোচনা ক'রেও একই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। বার্কলি সে-পথও অনুসরণ করেছেন।

জন লক মনে করেন, যে কোন বস্তুকে বিশ্লেষণ করলে কতগুলো গুণ আর গুণের একটা আধার পাওয়া যায়। গুণ ও তার আধার ছাড়া বস্তু বলতে আর কিছু নেই। কথাটা উদাহরণ দিয়ে বোঝান যেতে পারে। আমরা যদি 'কমলালেবু'কে বিশ্লেষণ করি, তবে রঙ্, রস, গন্ধ, আকার, ঘনত্ব প্রভৃতি কতগুলো গুণ পাব। এই গুণগুলো একত্র সন্নিবিষ্ট হ'য়ে আছে। এরা যদি কোন একটা বিশেষ আধারে না থাকে তবে কখনই একত্র সন্নিবিষ্ট হ'তে পারে না। সুতরাং গুণের একটা আধার ভাবতে হয়। গুণ যেমন দেখা যায় এই আধার তেমন দেখা যায় না। জন লকের মতে এই আধারের নাম দ্রব্য[১]। দ্রব্য আর গুণ মিলেই বস্তু।

লক মনে করেন, সমস্ত গুণই একজাতের নয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণ ব্যক্তিভেদে প্রায়ই ভিন্ন হয়। সুস্থ চোখে যা 'সবুজ', অসুস্থ চোখে তাই 'নীল' বলে মনে হয়। বর্ণান্ধদের বেলায় ত' প্রায়ই এমন হ'য়ে থাকে। বর্ণের মতই রস, গন্ধ প্রভৃতিও বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন রকম বলে মনে হয়। লক বলেন, যদি এসব গুণ বস্তুতেই থাকত তবে সব মানুষই এদের একরকম দেখত। যেহেতু এই গুণগুলো ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়, সেজন্য এদের বস্তুগত বলা যায় না। এরা ব্যক্তিগতই বটে। আসলে এই গুণগুলো ব্যক্তিমনের ধারণা মাত্র। লক এদের নাম দিয়েছেন 'গৌণ গুণ'[২]।

আর একজাতেরও গুণ আছে। আকৃতি, আয়তন, ঘনত্ব প্রভৃতি এই জাতির অন্তর্গত। এই গুণগুলো ব্যক্তিভেদে ভিন্ন রকমের হয় না। যে বস্তু গোলাকার তা সকলের কাছেই গোলাকার। সুতরাং এগুলোকে বস্তুগতই বলতে হ'বে। লক এদের নাম দিয়েছেন 'মুখ্য গুণ'।[৩]

বার্কলি বলেন, বস্তু বিশ্লেষণ করলে কতগুলো গুণই পাওয়া যায়। আমাদের অভিজ্ঞতায় গুণের আধার বলে কিছুই পাই না। আর যা অভিজ্ঞতায় পাই না তা মানারও কোন যুক্তি নেই। বস্তুতে যে গুণগুলো থাকে তা সবই একজাতের। রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন বলে যদি ব্যক্তি-

১। Substance
২। Secondary Qualities
৩। Primary Qualities

মন-নির্ভর হয়, তবে আকৃতি, আয়তন প্রভৃতিও ব্যক্তি-মন-নির্ভর হবে; কারণ, বস্তুর আকৃতি, আয়তন প্রভৃতিও সকলের কাছে একরকম নয়। দূরের লোক যা ক্ষুদ্রাকৃতি বলে মনে করে কাছের লোক তা-ই বৃহদাকার হিসেবে পায়। সুতরাং বস্তু বলতে কতগুলো গুণ বোঝায় আর এই সব গুণই মনের ধারণামাত্র। এই আলোচনা থেকে বার্কলি সিদ্ধান্ত করলেন, আমরা যা কিছু জানি সবই মনের ধারণামাত্র।

অন্য দিক থেকেও একই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। যে কোন বিষয়েরই অস্তিত্ব ব্যক্তির জ্ঞান-সাপেক্ষ। যে শব্দ কেউ শোনে নি, যে বর্ণ কেউ দেখে নি, তা অস্তিত্বহীনই বটে। সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব তার প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং প্রত্যক্ষ হওয়া আর থাকা একই কথা।[১]

সমালোচনা :—বার্কলি বলেছেন, প্রত্যক্ষ হওয়া আর থাকা একই কথা। এই মত সত্য হ'লে বস্তুর স্থায়িত্ব[২] ব্যাখ্যা করা যায় না। রান্নাঘরে উনুনে জল চাপিয়ে বাইরে গেলে ফিরে এসে দেখি—জল ফুটছে। বার্কলির কথা যদি সত্য হয় তবে রান্নাঘর, উনুন, জল এসব ততক্ষণই থাকবে যতক্ষণ আমরা তাদের প্রত্যক্ষ করব। তা হ'লে ঘর ছেড়ে যাওয়ার পর নিশ্চয়ই উনুন, জল প্রভৃতি ছিল না। কিন্তু ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে জল ফুটল কি ক'রে? উনুন, জল প্রভৃতি আমরা প্রত্যক্ষ না করলেও থাকে, একথা মানতেই হ'বে।

বার্কলি মুশ্‌কিলে পড়লেন। বাধ্য হয়ে তাঁকে বলতে হ'ল—আমরা যখন প্রত্যক্ষ করি না তখনও যে বস্তু থাকে তার কারণ তখন তা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ বলা হয়। সুতরাং তিনি সব সময়েই সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন। জাগতিক বস্তু তাঁরই প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভরশীল। যে বিজ্ঞানবাদ নিয়ে বার্কলি দার্শনিক যাত্রা শুরু করেছিলেন এভাবে তা তাঁকে পরিত্যাগ করতে হ'ল। বস্তু ঈশ্বরের জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল বললে আর বিজ্ঞানবাদ থাকে না। অশরণের শরণ ঈশ্বর বার্কলিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। কিন্তু বার্কলির নিজের মতবাদ বিজ্ঞানবাদ উদ্ধার পেল না। আসলে বিজ্ঞানবাদ কখনও বস্তুর স্থায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে পারে না।

পরবর্তী কালে বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে অনেকেই জেহাদ ঘোষণা করেছেন। মূরের ছোট্ট প্রবন্ধ 'বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন'[৩] সাম্প্রতিক য়ুরোপীয় দর্শনে বিরাট

১। Esse est percipi   ২। Continuity
৩। Refutation of Idealism

বিপ্লব ঘোষণা করেছে। বিজ্ঞানবাদকে এরকম স্পষ্ট ও তীব্র, এরকম নির্মম ও নির্ভীকভাবে খণ্ডন করবার চেষ্টা বিরল।

বিজ্ঞানবাদের মতে বস্তু জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। মূর দেখাতে চান, এই সিদ্ধান্ত এক ভ্রান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। 'জ্ঞান'কে বিশ্লেষণ করতে হ'লে জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় এই দুটো ভাগ স্বীকার করতেই হবে। বিজ্ঞানবাদীরা এই সহজ তফাৎটা ধরতে পারেন না। 'নীল রঙ্'-এর জ্ঞান ও 'লাল রঙ্'-এর জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এই পার্থক্যই জ্ঞানের জন্য নয়; কারণ জ্ঞান উভয়ক্ষেত্রেই বর্তমান। সুতরাং একথা স্বীকার করতেই হ'বে যে এদের পার্থক্য জ্ঞানের বিষয়ের জন্য। বিষয়ের বিভিন্নতার জন্যই জ্ঞানের বিভিন্নতা হয়। বিষয় যখন 'লাল রঙ্' তখন 'লাল রঙ্'-এর জ্ঞান হয়, আর বিষয় যখন 'নীল রঙ্' তখন 'নীল রঙ'-এর জ্ঞান জন্মে। সুতরাং 'নীল রঙ্'-এর জ্ঞান ও 'নীল রঙ্'-এর মধ্যে প্রভেদ আছে। 'নীল রঙ্'-এর জন্যই 'নীল রঙ্'-এর জ্ঞান হয়। বিজ্ঞানবাদীরা একথা বুঝতে পারেন নি। মূর আধুনিক কালের বস্তুস্বাতন্ত্র্য-বাদীদের গুরু। তাঁর 'ভাববাদ খণ্ডন'কে ভিত্তি করেই নূতন বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদেব ইমারৎ দাঁড়িয়ে আছে।

ব্রিটিশ দার্শনিক আলেকজেণ্ডার মূরের সুরেই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, আমরা যখনই যে বস্তু জানি তখনই তা জ্ঞাত বস্তু হিসেবেই জানি। এর থেকে বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, জ্ঞাত না হয়ে কোন বস্তুই থাকতে পারে না। আলেকজেণ্ডার মনে করেন, বিজ্ঞানবাদীদের এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয। বস্তুর 'জ্ঞাততা' ধর্ম জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে, কিন্তু স্বযং বস্তু জ্ঞানের ওপব নির্ভরশীল নয।

মার্কিন নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে অনেক অনুপপত্তি উত্থাপন কবেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা একটি অনুপপত্তি আলোচনা করতে পারি। আমরা যা কিছু জানি তা সমস্তই জ্ঞাত বস্তু, তাই জ্ঞাতা-অতিরিক্ত কিছুরই অবস্থিতি সম্ভব নয়। এই ত' বিজ্ঞানবাদীর কথা। কিন্তু একথায় স্পষ্ট অনুপপত্তি রয়েছে। এপর্যন্ত যা কিছু জেনেছি তা জ্ঞাত বস্তু, তা বলে বস্তুমাত্রই যে জ্ঞাত হ'তে বাধ্য একথা বললে অন্যায় অহমিকা প্রকাশ পায। নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা তাই এ অনুপপত্তির নাম দিয়েছেন 'আত্ম-কেন্দ্রিকানুপপত্তি'[১]।

১। Ego-centric Predicament

বিজ্ঞানবাদ থেকে এক জাতীয় বিশ্রী আত্মকেন্দ্রিকতা (Solipsism) আত্ম-প্রকাশ করে। বার্কলি বলেছেন, প্রত্যক্ষ হওয়া আর থাকা একই কথা। তাই যদি সত্যি হয়, তবে আমি আর আমার ধারণাই ত' শুধু আছে। এই জাতীয় ভাবনা চরম আত্মকেন্দ্রিকতার পরিচায়ক। যে কোন সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন লোকই আত্মকেন্দ্রিকতা সমর্থন করতে পারেন না।

আভিনেরিয়াস বলেছেন, বিজ্ঞানবাদ এক অদ্ভুত প্রক্ষেপ[১] প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। আকাশে যখন চাঁদ ওঠে, তখন অনেক লোকই এক সঙ্গে সেই চাঁদ দেখে। বিজ্ঞানবাদী বলবেন, চাঁদ কোন এক ব্যক্তির মনের ধারণা-মাত্র। তাই যদি হয়, তবে এতগুলো লোক একসঙ্গে চাঁদ দেখবে কি করে? একজনের মনের ধারণা ত আর সবাই দেখতে পারে না। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি-মনের ধারণা অন্য মনে প্রক্ষিপ্ত হয়, একথাই ভাবতে হবে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা একান্তভাবেই অবিশ্বাস্য।

এমনি ক'রে বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগই উত্থাপন করা যেতে পারে। কিন্তু তা আর ক'রে লাভ কি। আমরা বেশ বুঝতে পেরেছি, বিজ্ঞানবাদ আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য মতবাদ নয়। সুতরাং এবার ভাববাদের অন্য আর এক রূপের আলোচনা করা যাক্।

কাণ্টের ভাববাদ

জার্মান দার্শনিক কাণ্ট জ্ঞান-তত্ত্ব আলোচনা ক'রে যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তা আধুনিক দর্শনের ইতিহাসে এক বিপ্লব এনেছে। এই বিপ্লবের নাম দেওয়া হয়েছে কোপারনিকান বিপ্লব। জ্যোতির্বিদ্যায় কোপারনিকাসের আগে টলেমির প্রতাপ ছিল প্রচণ্ড। তিনি মনে করতেন পৃথিবী স্থির, সূর্যই তার চারিদিকে ঘোরে। কোপারনিকাস এই ধারণার মূলে আঘাত করলেন। তিনি বললেন— পৃথিবীই ঘুরছে, সূর্য একান্ত ভাবেই স্থির। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই নূতন চিন্তাধারাকে কোপারনিকান বিপ্লব নাম দেওয়া হয়েছে। কাণ্টের দাবী—তিনিও দর্শনের ইতিহাসে অনুরূপ বিপ্লব এনেছেন। কাণ্টের আগে দার্শনিকদের ধারণা ছিল জ্ঞান বস্তুর ওপরেই নির্ভর করে; বস্তু আছে বলেই জ্ঞান হয়। কাণ্ট এসে বললেন, জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের ওপরেই নির্ভর করে।

কাণ্টের সিদ্ধান্ত ভাববাদের জোর বৃদ্ধি করেছে। ভাববাদীদের মতে

১। Projection

বিষয় ত' জ্ঞান-নির্ভরই বটে। পরবর্তী কালে ভাববাদের চরম পরিণতি হেগেলের পরব্রহ্মবাদ[১] কাণ্টের সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। হেগেলের পরব্রহ্মবাদ খণ্ডন করা শক্ত। ভাববাদের এই চরম পরিণতির জন্য কাণ্টই দায়ী। অনেক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক সেজন্য কাণ্টের ওপর বিরক্ত। বার্ট্রাণ্ড রাসেল ত' কাণ্টকে আধুনিক দর্শনের 'দুর্ভাগ্য'[২] বলে অভিহিত করেছেন। আমাদের ধারণা, গালাগাল দিয়ে কোন মতবাদ খণ্ডন করা যায় না। যুক্তির বিরুদ্ধে উষ্মার কোন স্থান নেই, পাল্টা যুক্তিরই আছে। কাণ্টের দার্শনিক চিন্তাধারায় হয়ত অনেক দোষই আছে। কিন্তু, সমস্ত জ্ঞান-ব্যাপারে বিশ্লেষণ করতে কাণ্ট যে বুদ্ধি, ধৈর্য ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, সমস্ত দর্শনের ইতিহাসে তার তুলনা মেলা শক্ত। সমস্ত দেশের সমস্ত কালের দার্শনিকদের মধ্যে কাণ্ট এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছেন।

কাণ্টের মতে প্রত্যেক জিনিসের যেমন আকার ও বস্তু থাকে, জ্ঞানেরও তেমনি আকার ও বস্তু আছে। এই দুটো ছাড়া কোন জ্ঞানই হ'তে পারে না। বুদ্ধি[৩] জ্ঞানের আকার দিয়ে থাকে, আর বস্তু সংবেদন[৪] থেকেই লাভ করা যায়। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বহির্বিশ্ব থেকে সংবেদনের সাহায্যে যা আমরা পাই তার নাম অনুভব[৫]। অনুভব দেশ ও কালের মধ্যেই উপস্থাপিত হ'তে পারে। দেশ ও কাল অনুভবের দুটি পূর্বতঃসিদ্ধ আকার[৬]। এরা পূর্বতঃসিদ্ধ এজন্যে যে এদের ছাড়া কোন অনুভবই পাওয়া যায় না। কাণ্ট দেশ ও কালে লব্ধ অনুভবের নাম দিয়েছেন আভাস[৭]। এই আভাস জ্ঞান নয়। আভাস যখন দ্রব্য, কার্য, কারণ প্রভৃতি বুদ্ধির বিভিন্ন আকারে আকারিত হয় তখনই জ্ঞান পাওয়া যায়। কাণ্টের মতে বুদ্ধির আকারে[৮] আকারিত আভাসের নাম অবভাস[৯]। অবভাসই জ্ঞানের বিষয়। সুতরাং জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের ওপরই নির্ভরশীল।

জ্ঞনের বিষয় জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল হ'লেও কাণ্ট জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু-স্বরূপের[১০] অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সংবেদন নিষ্ক্রিয়ভাবে অনুভব লাভ করে। সুতরাং সংবেদন অনুভবের স্রষ্টা হ'তে পারে না। অনুভবের উৎস হিসেবে বস্তু-স্বরূপের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়। কাণ্টের মতে যা জানা যায় তা অবভাস

১। The Absolute Idealism of Hegel   ২। Misfortune
৩। Understanding   ৪। Sensibility
৫। Intuition
৬। Apriori forms of Intuition   ৭। Appearance
৮। Categories of understanding   ৯। Phenomenon
১০। Thing-in-itself

মাত্র। অবভাস জ্ঞানেরই সৃষ্টি। বস্তু-স্বরূপ কখনই জানা যায় না, কিন্তু বস্তু-স্বরূপের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে—কাণ্টের ভাববাদ একটু নূতন ধরণের। তাঁর মতে বস্তু-স্বরূপ জ্ঞান নির্ভর নয়। সুতরাং বস্তু-স্বরূপের দিক থেকে তিনি ভাববাদী নন। কিন্তু, কাণ্ট মনে করেন, জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। এই দিক থেকে কাণ্ট ভাববাদেব সমর্থক। কাণ্টের মতে অবভাস জ্ঞানের ওপর নির্ভবশীল। সেজন্য কেউ কেউ তাঁকে আবভাসিক ভাববাদী[১] বলেন আব তাঁর মতবাদের নাম দেন 'আবভাসিক ভাববাদ'[২]।

বস্তু-স্বরূপ জানা না গেলেও কাণ্ট তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। কাণ্টের চিন্তাধারায় এ একটা দুর্বলতা বিশেষ। যা জানি না তা আছে, এমন কথা বলা যায় না। পরবর্তী কালের ভাববাদী দার্শনিকেরা এজন্য কাণ্টকে তীব্রভাবে আক্রমণ কবেছেন। ফিকৃটে, শেলিং, হেগেল প্রভৃতি সকলেই কাণ্টের এই দুর্বলতার প্রতি ক্ষমাহীন কটাক্ষ করেছেন। আমরা এখন তাঁদের মতবাদ আলোচনা করব।

ফিকৃটে ও শেলিং-এর মধ্য দিয়ে কাণ্টের চিন্তাধারার হেগেলীয় পরব্রহ্মবাদে পরিণতি

আমরা দেখেছি, বস্তু-স্বরূপ জানা না গেলেও কাণ্ট বস্তু-স্বরূপের অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হযেছেন। তাব মতে বুদ্ধি ও সংবেদনেব সমন্বযেই জ্ঞানের উদ্ভব হয। সংবেদন নিষ্ক্রিযভাবে বহির্বিশ্ব থেকে অনুভব লাভ করে। বুদ্ধি তাতে সক্রিয় ভাবে নিজ আকাব লাগিযে দেয়। সংবেদন যখন নিষ্ক্রিয় ভাবে অনুভব লাভ করে তখন সংবেদন কখনই অনুভবের স্রষ্টা হ'তে পারে না। তা হ'লে প্রশ্ন ওঠে অনুভব এল কি ক'বে? এ প্রশ্নের উত্তরে অনুভবেব উৎস হিসেবে কাণ্ট বস্তু-স্বরূপ মানতে বাধ্য হয়েছেন। কাণ্ট কিন্তু একথাও বলেন যে, বস্তু-স্বরূপ জানা যায না।

বস্তু-স্বরূপ জানা যায় না অথচ আছে—একথা কাণ্টের পরবর্তী দার্শনিকদের অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে। এ সমস্যার দুটো সমাধান হতে পারে: হয়

১। Phenomenalistic Idealist
২। Phenomenalistic Idealism

বস্তু-স্বরূপ কোন না কোন ভাবে জানা যায়—একথা প্রমাণ করা, অথবা বস্তুস্বরূপ বলে কিছু নেই একথা মেনে নেওয়া।

জেকবি প্রথম বিকল্প বেছে নিয়েছেন। তাঁর মতে অপরোক্ষ অনুভূতিতে[১] বস্তু-স্বরূপ জানা যায়। কাণ্টের মতে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান হয় না। জ্ঞান হতে গেলে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব পাওয়া দরকার। অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয় না। সুতরাং অতীন্দ্রিয় বিষয়ের কোন অনুভব হয় না। কাজেই অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান হতে পারে না। জেকবি মনে করেন, অপরোক্ষ অনুভূতিতে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান হয়। কাণ্টের সমর্থকেরা জেকবির এই ব্যাখ্যা মানতে রাজী নন। তাঁদের মতে অপরোক্ষানুভূতি জ্ঞান নয়, অনুভূতি মাত্র। অনুভূতি ব্যক্তিগত ব্যাপার। দর্শনে এই ব্যক্তিগত অনুভূতির কোন স্থান নেই। সুতরাং তাঁরা দ্বিতীয় বিকল্প গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে কাণ্টের বস্তু-স্বরূপের কোন অস্তিত্বই নেই।

ফিক্‌টে অনুভবের উৎস হিসেবে বস্তু-স্বরূপ মানতে রাজী নন। তাঁর মতে 'মন' বা 'অহং'ই[২] চরমতত্ত্ব। তিনি বিশ্বাস করেন—সংবেদন নিষ্ক্রিয়। কিন্তু তিনি সংবেদনের নিষ্ক্রিয়তা কাণ্টের পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করতে প্রস্তুত নন। তাঁর মতে নিষ্ক্রিয়তা সক্রিয়তার স্বল্পতামাত্র। বুদ্ধি সংবেদনের চেয়ে বেশী সক্রিয়। সে-জন্য বুদ্ধির সঙ্গে তুলনায় সংবেদনকে নিষ্ক্রিয় বলে মনে হয়। জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু-স্বরূপের জন্য আমরা অনুভব লাভ করি না। মনই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে নিজেকে বিভক্ত ক'রে থাকে। মনেরই এক অংশ থেকে অনুভবের উৎপত্তি। সুতরাং সংবেদনের নিষ্ক্রিয়তা মনের আত্ম-বিভাগের দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। 'মন' বা 'অহং'ই চরমতত্ত্ব। নৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ লাভের জন্য 'অহং' নিজেকে বস্তুরূপে বিক্ষিপ্ত[৩] করে। সুতরাং বস্তু 'অহং'-এরই বিক্ষেপ বিশেষ।

শেলিং ফিক্‌টে "সমস্ত বস্তুর 'অহং'এ পর্যবসান" তত্ত্বে বিশ্বাস ক'রেই দার্শনিক আলোচনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু ক্রমে ফিক্‌টের বিজ্ঞানবাদ থেকে শেলিং পরব্রহ্মবাদের দিকে এগিয়ে যান। তিনি মানুষের মনে ও বিশ্বপ্রকৃতিতে একই মৌলিক নিয়মের খেলা দেখতে পান। সুতরাং মন ও বিশ্বপ্রকৃতি মূলতঃ অভিন্ন বলেই তাঁর ধারণা হয়। তিনি মন ও বিশ্বপ্রকৃতিকে এক পরব্রহ্মের[৪]

১। An immediate kind of feeling
২। Ego
৩। Projected
৪। Absolute Reality

দ্বিমূর্তি বলে মনে করেন। তাঁর কাছে প্রকৃতি যেন 'দৃশ্য আত্মা'[১] আর আত্মা বা মন যেন 'অদৃশ্য প্রকৃতি' (Invisible Nature)। যে পরব্রহ্ম এই দুই তত্ত্বকেই আত্মস্থ করেন তিনি উভয়-মধ্যস্থ অবিনাতত্ত্ব বিশেষ (Principle of Identity)।

হেগেল কাণ্টের মতবাদের ওপরই তাঁর দার্শনিক চিন্তার ইমারৎ গড়ে তুলেছেন। কিন্তু ফিক্‌টের মত তিনিও কাণ্টের 'বস্তু স্বরূপ'-এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না; তাঁর মতেও মনই চরমতত্ত্ব। দার্শনিক চিন্তায় হেগেল ফিক্‌টেকে ছাড়িয়ে গেছেন। শেলিং-এর মত তিনিও বিশ্বাস করেন, যে মন চরমতত্ত্ব তা কোন ব্যক্তি-মন নয়; আসলে তা এক পরম মন বা পরব্রহ্ম। এই পরব্রহ্ম ব্যক্তি-মন ও প্রকৃতি উভয়ই আত্মস্থ করে। তবে হেগেল শেলিং-এর মত পরব্রহ্মকে মন বা প্রকৃতি-মধ্যস্থিত এক অবিনাতত্ত্ব বলে মানতে রাজী নন। তিনি মনে করেন, শেলিং জগৎ ও মনের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতাকে এক অবিনাতত্ত্বের জয়গান করতে গিয়ে অস্বীকার করেছেন। হেগেলের মতে শেলিং-এর পরব্রহ্ম যেন এমন এক রাত্রি যেখানে সমস্ত গরুই কালো বলে মনে হয়। হেগেল মনে করেন, জোর করে জগতের বৈচিত্র্য অস্বীকার করা নির্মোহ মনের পরিচায়ক নয়। সুতরাং পরব্রহ্ম এক অবিনাতত্ত্ব নয়, পরব্রহ্ম বৈচিত্র্য-সঞ্জীবিত এক ঐক্যতত্ত্ব বিশেষ। বৈচিত্র্যের মধ্যে আত্মপ্রাপ্তিই এই পরব্রহ্মের লীলা। বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা পরব্রহ্মকে পুষ্ট ও সঞ্জীবিত করে।

হেগেলের পরব্রহ্মবাদ

য়ুরোপীয় দর্শনে ভাববাদের চরম পরিণতি হেগেলের পরব্রহ্মবাদে। হেগেলের মতে পরব্রহ্মই চরমতত্ত্ব। এই পরব্রহ্ম নিষ্কল ও নির্গুণ নয়। এ ব্রহ্মের মধ্যে চিদচিৎ সমস্ত কিছুরই অবিসংবাদিত স্থান আছে। বস্তুতঃ চিদচিৎ সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই তাঁর বিকাশ। সীমার মধ্যে অসীম সত্তাকে প্রকাশ করাই তাঁর লীলা।

পরব্রহ্ম বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্য। হেগেলের এই পরব্রহ্ম জীবন্ত ও গতিশীল। নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করাই তাঁর লীলা। এই লীলা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে চলে। পরব্রহ্মেই এই লীলার শুরু আর সেখানেই এর শেষ।

১। Visible Soul

দ্বান্দ্বিক গতিতে বাদ, প্রতিবাদ ও সম্বাদ[১]—এই তিন মুহূর্ত দেখতে পাওয়া যায়। বাদে যা প্রতিষ্ঠিত হয় প্রতিবাদে তার বিরুদ্ধ ধারণার মধ্য দিয়ে সম্বাদে তা এক উচ্চ ধারণায় সমন্বিত হয়। কিন্তু এই সম্বাদ লীলার সমাপ্তি নয়। অন্তর্দ্বন্দ্বই লীলার প্রাণ। সম্বাদ চরম প্রশান্তিরূপে স্থায়ী না হ'য়ে আবার সে নিজের বিরোধ সৃষ্টি করে ও নূতন সম্বাদের প্রয়োজন হয়। এরকম নানা বিরোধ, দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে পরব্রহ্ম আপনার বিচিত্র লীলা চালিয়ে যান। এই লীলায় নূতন পুরাতনকে পরিত্যাগ করে না, নিজের মধ্যেই গ্রহণ করে নেয়, নূতনের মধ্যে পুরাতনের হয় পুনর্জন্ম ও পূর্ণতর প্রকাশ। এখানে কিছুই হারায় না, সবই পূর্ণ ব্রহ্মের প্রসাদে নূতন জীবনে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। নানা বিরোধ ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে পরব্রহ্মের অব্যাহত লীলা চলেছে। সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ সুন্দর ও মধুর হয়ে উঠেছে।

পরব্রহ্মের লীলায় বাদ, প্রতিবাদ ও সম্বাদ অসংখ্য। কিন্তু সাধারণভাবে পরমলীলার তিনটি বিশেষ মুহূর্তই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ শুদ্ধ সার্বভৌমিক প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে পরব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করেন। এর নাম শুদ্ধ প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি।[২] লীলার দ্বিতীয় স্তরে প্রতিবাদরূপে সৃষ্ট হয় জড় জগৎ।[৩] তৃতীয় স্তরে বাদ প্রতিবাদের সমন্বয় রূপে সৃষ্টি হয় আত্মসচেতনতায় উপলব্ধ ধর্ম, শিল্প ও দর্শন।[৪] দর্শনের মধ্য দিয়েই পরব্রহ্মের চরম পরিচয় লাভ করা যায়।

মানুষের চিন্তার মধ্যে যে একটা বিরাট বিস্তৃতি ও মহিমা আছে—আমরা তা হেগেলের চিন্তাধারায় পাই। যাঁরা হেগেলের সমালোচক তাঁরাও হেগেলের মহত্ত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। হেগেলের মতে জ্ঞান জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের একটি সম্পর্ক বিশেষ। যেহেতু জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই এক তত্ত্বের বিভিন্ন দিক, সুতরাং এদের সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিক। কাজেই হেগেলের দর্শনে জ্ঞানের সম্পর্ক—সমস্যা অতি সহজেই মিটে যায়। বিষয় বা বস্তু পরব্রহ্মের অংশ বটে, কিন্তু তা কোন বিশেষ মনের অংশ নয়। সুতরাং কোন বিশেষ মনের কাছে বিষয় মন-বহির্ভূতই বটে। কাজেই বিজ্ঞানবাদে যে সমস্ত অসুবিধে হয়েছিল তা এখানে হতেই পারে না। পরব্রহ্ম মানুষের মধ্যেও আছেন আবার

১। বাদ=Thesis, প্রতিবাদ=Anti-thesis, সম্বাদ=Synthesis
২। Logic as thesis
৩। Nature as anti-thesis
৪। Spirit as Synthesis

তিনি মানুষের বাইরেও আছেন। সুতরাং মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এই পরমকে লাভ করবার চেষ্টা করবে আর তার ফলে নীতি ও ধর্মের তাৎপর্য অতি সহজেই ব্যাখ্যা করা যাবে। মানুষের মূল্যবোধও এই মতবাদে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। অসীম পরব্রহ্ম সসীম মানুষের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন। পরব্রহ্ম সত্য, শিব ও সুন্দরের পবিপূর্ণ পরিপূর্তির জাগ্রত প্রকাশ। সুতবাং সসীম মানুষের মধ্যে এই মূল্যের প্রকাশ অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই হ'বে। এই সমস্ত নানা দিক থেকে বিবেচনা ক'বেই ভাববাদেব যতগুলো রূপ আমরা আলোচনা করেছি তাদের মধ্যে হেগেলেব পবব্রহ্মবাদকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেশ ও কাল (Space and Time)

জ্ঞানের আকার (Categories of Knowledge)

বিষয় ছাড়া জ্ঞান হয় না। জ্ঞানের বিষয় প্রায়ই দেশে ও কালে থাকে। শুধু তাই নয়। বিষয়ের মধ্যে দ্রব্যগুণের[১] সম্পর্ক ও কার্যকারণতত্ত্ব[২] বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করা যায়। যখন আমরা বলি 'ফলটি সাদা' তখন ফল বলতে কোন একটা দ্রব্য বুঝি আর এও জানি যে এই দ্রব্যের সাদা রঙ বলে একটি গুণ আছে। আবার যখন বলি 'আগুনে মোম গলে', তখন আগুনের সঙ্গে মোম গলার একটি কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করি। এমনি ক'রে জ্ঞানের ব্যাপারে দেশ ও কাল, দ্রব্য ও গুণ, কার্য ও কারণ প্রভৃতি কতগুলো তত্ত্বের হামেশাই ব্যবহার হ'য়ে থাকে। এদের মত যে সমস্ত তত্ত্বের ব্যবহার জ্ঞানের পক্ষে একান্তভাবেই অপরিহার্য পশ্চিমের দর্শনে তাদের নাম দেওয়া হয় 'জ্ঞানের আকার'।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিষয় যা-ই হোক্ না কেন, জ্ঞানের আকার সাধারণ-ভাবে সর্বত্রই প্রযোজ্য। 'আকাশ নীল', 'ঘাস সবুজ', 'গোলাপ লাল' প্রভৃতি যা-ই আমরা বলিনা কেন—দ্রব্যগুণ সম্পর্ক সর্বত্রই আছে। এমনি ক'রে দেশ ও কালও যে সাধারণতঃ সর্বত্রই থাকে তা প্রমাণ করার দরকার নেই। জ্ঞানের বিষয় ত' কোন একটা বিশেষ দেশে ও কালে থাকবেই। কার্যকারণ সম্পর্কিত বিভিন্ন জ্ঞান ব্যাপারের মধ্যে সাধারণভাবে কার্যকারণতত্ত্বের উপস্থিতি সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়।

জ্ঞানের আকারের ঠিক সংখ্যা কত এ-নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক আরিস্টোটলের মতে জ্ঞানের আকার সংখ্যায় দশটি। জার্মান দার্শনিক কাণ্ট মনে করেন, জ্ঞানের আকার বারটি। হেগেলের মতে সত্তরটি আকার আছে। সোপেনহাওয়ার ত' সমস্ত আকার-গুলোকে এক কার্যকারণতত্ত্বে পরিণত করার প্রয়াসী। এই মত-বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা মত বেছে নেওয়া সত্যিই শক্ত। জ্ঞানের আকারের সংখ্যা যা-ই

১। দ্রব্য-গুণের সম্পর্ক = Substance-attribute Relation
২। কার্যকারণতত্ত্ব—Causal relation

হোক্ না কেন, এদের মধ্যে দ্রব্য-গুণ, দেশ-কাল ও কার্যকারণই যে সবচেয়ে মৌলিক ও প্রয়োজনীয়—একথা অধিকাংশ দাশনিকই স্বীকার করেন। আমরা এই অধ্যায়ে দেশ ও কালের স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করব। পববর্তী অধ্যায়ে দ্রব্য গুণ ও কার্যকাবণতত্ত্বেব আলোচনার ইচ্ছা বাখি।

সাধারণ দৃষ্টিতে দেশ ও কাল

জগতের দিকে তাকালেই বিভিন্ন বস্তু যে দেশে ও কালে রযেছে, তা বেশ বুঝতে পাবি। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে ওপব-নীচ, ভেতর-বাইব, দূরত্ব ওঁ দিকের সম্পর্ক রযেছে। সাধাবণতঃ আমরা কোন বস্তুকে অন্য আর একটা বস্তুর ওপরে বা নীচে, ভেতরে বা বাইবে, দূরে বা কাছে, উত্তরে বা দক্ষিণে, পূবে বা পশ্চিমে থাকতেই দেখি। বস্তুর সঙ্গে বস্তুব এ সমস্ত সম্পর্কই দৈশিক সম্পর্ক। এ ছাডাও বস্তুদের মধ্যে আব এক জাতেব সম্পর্ক দেখতে পাওযা যায। এক বস্থ অন্য আব এক বস্তুর আগে বা পরে স্থানান্তরিত বা পবিবর্তিত হচ্ছে—এও আমরা হামেশাই দেখি। বস্তুর মধ্যে এই আগে পরের সম্পর্ক কালিক সম্পর্ক সূচনা করে। সুতরাং বিষয়ের রাজ্যে দেশ ও কালের অপরিহার্যতা স্বীকার করতেই হয। এখন প্রশ্ন হ'ল—এই দেশ ও কালের আসল রূপ কি?

সাধারণ দৃষ্টিতে দেশ :

(১) সাধারণতঃ দেশ আমাদের কাছে সীমাহীন ও অনন্তবিস্তৃত ব'লেই মনে হয়। যে দিকেই তাকাই না কেন অসীম দেশ চোখের সামনে বিস্তৃত দেখতে পাই। দেশের সীমা নেই, কারণ দেশের যেখানেই সীমা টানি না কেন তারপরও আবার দেশই দেখতে পাই। দেশেই দেশের সীমা টানা যায়। সুতরাং অসীম এই দেশ।

(২) অসীম দেশকে কখনও কখনও আমরা খণ্ড খণ্ড ক'রেও দেখি। আমার লেখবার টেবিলটা যে দেশ জুড়ে আছে, ঘরের আলমারিটা সে দেশ জুড়ে নেই বলেই ত' ধারণা হয়। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। অসীম দেশকে ব্যবহারিক প্রয়োজনে আমরা খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখি বটে, আসলে অসীম দেশ কিন্তু এই খণ্ড খণ্ড দেশের সমষ্টিমাত্র নয়। দেশ স্বরূপতঃ অসীম। আমাদের প্রয়োজনে ও জাগতিক ব্যবহারের সুবিধের জন্য আমরা অসীম দেশকে খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখি।

(৩) সাধারণ দৃষ্টিতে দেশকে ত্রিমাত্রা-বিশিষ্ট[১] ব'লেই মনে হয়। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা—এই তিন মিলেই যেন দেশের পরিচয়। যে কোন ঘন বস্তুই এই তিন মাত্রা বিশিষ্ট। সরল রেখা শুধু দৈর্ঘ্যযুক্ত এবং সমতল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থযুক্ত। সরলরেখার প্রস্থ নেই আর সমতলের নেই গভীরতা। সরলরেখা ও সমতল তাই সাধারণ নিঃমের ব্যতিক্রম বিশেষ।

(৪) সাধারণ দৃষ্টিতে দেশকে কতগুলো বিন্দুর একত্র সমাবিষ্ট রূপ ব'লে মনে হয়। বিন্দুগুলোর মধ্যে দূরত্ব, দিক ও অবস্থানের একটা বিশিষ্ট প্রকাশও সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়।

সাধারণ দৃষ্টিতে কাল :

কালের ধারণা সাধারণতঃ পারম্পর্যবোধ থেকেই জন্মে। পর পর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। মনে হয় যেন কালও চলেছে।

(১) কাল অনাদি ও অনন্ত। যদি এর কোন আদি থাকত তবে তা কালেই থাকত। কালের অন্তও ত' কোন একটা বিশেষ কালেই সম্ভব। সুতরাং কালের আদি আর অন্ত খুঁজতে যাওয়া ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।

(২) কালের অনন্ত ভাগ কল্পনা করা যেতে পারে। যদি তা না যেত তবে কালের অংশ থাকত না আর তা হ'লে মুহূর্ত ব'লেও কিছুই থাকত না। কিন্তু আমরা ত' অনন্ত মুহূর্তেই বিশ্বাস করি।

(৩) কালের অনন্ত ভাগ কল্পনা করা গেলেও এই ভাগগুলো মিলে কখনও পূর্ণকাল সৃষ্টি করে না। কাল এক ও অদ্বিতীয়। কালের বিভিন্ন অংশ এই অদ্বিতীয় কালের খণ্ডিত অংশবিশেষ।

(৪) কালের একটা প্রবাহ আছে। এই প্রবাহে পূর্ব ও উত্তর তরঙ্গের কল্পনা করা যেতে পারে। এই তরঙ্গগুলো মিলেই চলমান কালের প্রবাহ।

প্রত্যক্ষগত দেশ ও কাল (Perceptual Space and Time)

ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে জগতের বিভিন্ন বস্তু যে কোন না কোন দেশ জুড়ে আছে তার পরিচয় পাওয়া যায়। জগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেও একটা দৈশিক সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করা যায়। আমরা দেখি, ঘরের টেবিলটা খাটের চেয়ে অনেকটা দূরে, আবার চেয়ারটা টেবিলের খুব কাছেই। কখনও বা দেখি টেবিলটা চেয়ারের সম্মুখভাগে আর আয়নাটা টেবিলের ওপরে। দূরে-কাছে,

১। Three-dimensional

আগে-পরে, ওপরে নীচে প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার ক'রে আমরা দৈশিক সম্পর্ক প্রকাশ করি। যে-সমস্ত ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে দেশ ও দৈশিক সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়, সে সমস্ত ক্ষেত্রে দেশকে প্রত্যক্ষগত দেশ বলা হয়। এই প্রত্যক্ষগত দেশ বস্তুভেদে বিভিন্ন ব'লে মনে হয়। ঘরের টেবিলটা যে দেশ জুড়ে আছে, সোফাটা সে দেশ জুড়ে নেই। এমনি ক'রে সমস্ত বস্তুই যেন বিভিন্ন দেশ অধিকাব ক'বে আছে।

আমাদের চারদিকে প্রতিনিয়ত কত কিছুই ঘটছে। গতি, চলা আর পরিবর্তনই ত' দুনিয়ার নিয়ম। শাে যে গাছ পত্রশূন্য, মৃতপ্রায় দেখি, বসন্তের হাওয়া লাগলেই আবার তা পুনর্জন্ম লাভ কবে। কত পাতা, কত ফুল, কত সৌন্দর্য তাকে ভর ক'রে বিকশিত হ'যে ওঠে তাব হিসেব নেই। ভোর হয়। আবার দিনের আলো সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। ফুল ফোটে, ফুল ঝরে। এই সব পবিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে কালেব পরিচয় আমরা পাই তার নাম প্রত্যক্ষগত কাল। এই কাল যেন বিভিন্ন বস্তুর পরিবর্তনের সঙ্গে অভিন্নভাবে জড়িযে থাকে। বস্তুর পরিবতন যেমন আমরা প্রত্যক্ষ কবি তেমনি এই কালও প্রত্যক্ষ কবি। বিভিন্ন পবিবর্তনের সঙ্গে এই কালও বিভিন্ন ব'লে মনে হয।

সামান্যধারণাগত দেশ ও কাল (Conceptual Space and Time)

প্রত্যক্ষগত বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্নতা আলাদা ক'বে যখন সমগ্র দেশের ধাবণা করি তখন তার নাম দেওয়া হয সামান্যধারণাগত দেশ। আমরা যখন 'মানুষ এই সামান্যধারণা ব্যবহার করি তখন বিভিন্ন মানুষের বৈচিত্র্য বাদ দিয়ে তাদের সাধারণ গুণগুলোই বুঝি। ঠিক তেমনি সামান্যধারণাগত দেশ বলতেও আমরা প্রত্যক্ষগত বিভিন্ন দেশের বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য বাদ দিযে তাদের সাধারণ সমগ্রতাই বুঝি। সামান্যধারণাগত দেশ প্রত্যক্ষগত দেশের মত বিভিন্ন নয়। এই দেশ এক ও অবিভাজ্য। প্রত্যক্ষধারণাগত বিভিন্ন দেশ এই এক ও অবিভাজ্য দেশেরই সীমিত প্রকাশ মাত্র।

বিভিন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত প্রত্যক্ষগত বিভিন্ন কাল থেকে বিভিন্নতা বাদ দিযে যখন আমরা এক অখণ্ড কা.লর ধারণা করি, তখন সেই কালকে সামান্যধারণাগত কাল বলা হয়। এই সামান্যধারণাগত কাল এক ও অখণ্ড। আমরা মনে করি এ যেন একটা প্রবাহ। বিভিন্ন বস্তুর পরিবর্তন-নিরপেক্ষভাবেই যেন এই কাল থাকতে পারে। জাগতিক শত পরিবর্তন-

নিরপেক্ষভাবে যে অনাদি ও অনন্ত কালপ্রবাহ চলেছে তারই নাম সামান্য-ধারণাগত কাল।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। আসলে বিভিন্ন দেশ যোগ ক'রে এক অখণ্ড দেশ সৃষ্টি হয় না। অখণ্ড দেশই আছে। আমরা প্রয়োজনে ও জাগতিক ব্যবহারের সুবিধের জন্য এই অখণ্ড দেশকে খণ্ড খণ্ড ক'রে ভাবি। কাল সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যেতে পারে। এক অখণ্ড কালই আছে। খণ্ডকাল আমাদেব প্রয়োজনের সৃষ্টিমাত্র। তা হ'লে প্রশ্ন উঠবে—সামান্য-ধারণাগত দেশ ও কাল প্রত্যক্ষগত বিভিন্ন দেশ ও কাল থেকে সৃষ্টি হয়, এর মানে কি? উত্তর সহজ। এক অখণ্ড দেশ ও কাল আমরা প্রথমেই জানতে পারি না। জানতে গেলে প্রত্যক্ষগত বিভিন্ন দেশ ও কালই আমরা প্রথমতঃ জানি। তারপর এই বিভিন্ন দেশ ও কাল থেকে চিন্তা ক'রে এক অখণ্ড দেশ ও কালের ধারণা লাভ করি। সুতরাং জানার দিক থেকেই প্রত্যক্ষগত দেশ ও কাল থেকে সামান্যধারণাগত দেশ ও কালের ধারণা হয়। আসলে এক অখণ্ড দেশ ও কালই আছে। বিভিন্ন দেশ ও কাল লোকব্যবহারের সৃষ্টিমাত্র।

দেশ ও কালের ধারণার উৎপত্তি
(Origin of the Ideas of Space and Time)

দেশ ও কালের ধারণা মানুষের মনে কি ক'রে এল—এ প্রশ্নের উত্তর সহজে দেওয়া যায় না। বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্নভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। আমরা তাঁদের বিভিন্ন মত এখানে আলোচনা করব।

(১) রিড্, মার্টিনিউ প্রভৃতি অপরোক্ষানুভূতিবাদী দার্শনিকেরা[১] মনে করেন, দেশ ও কাল আমরা সোজাসুজি অপরোক্ষানুভূতিতে[২] পাই। দেশ ও কাল পরস্পর-নিরপেক্ষ দু'টি স্ব-নিভর তত্ত্ব।

(২) বার্কলি, হিউম, মিল প্রভৃতি প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদের মতে দেশ ও কালের ধারণা প্রত্যক্ষ থেকেই লাভ করা যায়। বিভিন্ন বস্তুর অবস্থান, দূরত্ব প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করার পর দেশ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হয়। নিজেদের

১। Intuitionists
২। Intuition

মনের পরিবর্তনশীল বিভিন্ন অবস্থা প্রত্যক্ষ ক'রে কাল সম্বন্ধে আমরা ধারণা ক'রে থাকি

(৩) কাণ্ট বলেন, বস্তুর অবস্থান, দূরত্ব প্রভৃতি দেখে দেশের ধারণা হ'তে পাবে না। অবস্থান, দূরত্ব প্রভৃতি কিছুই দেশের ধারণা ছাডা বোঝা যায় না। সুতরাং বস্তুর অবস্থান, দূরত্ব প্রভৃতির ওপর দেশের ধারণা নির্ভর করে না. দেশেব ধারণার ওপরই বস্তুর অবস্থান, দূবত্ব প্রভৃতি নির্ভর করে। ঠিক তেমনি ক'রে মনেব পরিবর্তনশীল অবস্থা থেকেও কালের ধারণা লাভ করা যায় না। কালেব ধারণা না থাকলে পরিবর্তনই বোঝা যায না। পরিবর্তন বুঝতে গেলে কালের ধাবণা থাকা আবশ্যক। সুতরাং দেশ ও কালের ধারণা কোন অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করা যায না। সমস্ত অভিজ্ঞতাই দেশ ও কালের ধারণার ওপর নিভর করে।

কাণ্টের মতে দেশ ও কাল অভিজ্ঞতার পূর্বতঃসিদ্ধ আকার মাত্র। দেশ ও কাল পূর্বতঃসিদ্ধ এই অর্থে যে, দেশ ও কালের ধারণা ছাড়া কোন অভিজ্ঞতাই হয না।

দেশ ও কাল নিশ্চযাত্মক ধারণা।[১] দেশ ও কালস্থিত সমস্ত বস্তুর অভাব। আমরা ভাবতে পারি। কিন্তু দেশ ও কালের অভাব ভাবা যায না। কোন নিশ্চযাত্মক ধারণাই অভিজ্ঞতা থেকে লাভ কবা যায না। অভিজ্ঞতা থেকে যা-ই লাভ করা যাক্ না কেন তা-ই সংশযযোগ্য। সুতরাং দেশ ও কালেব ধারণা প্রাক্-অভিজ্ঞতাজাত ও পূবতঃসিদ্ধই বটে।

বিশেষতঃ দেশ ও কালের ধাবণা যদি অভিজ্ঞতা-প্রসূত হ'ত তবে কোন সামান্য বচনই[২] এদের ভিত্তি ক'রে গডে উঠতে পারত না। জ্যামিতি ও গতিবিজ্ঞানে বহু সামান্য বচনের ব্যবহার পাওযা যায, আব জ্যামিতি ও গতিবিজ্ঞান যথাক্রমে দেশ ও কাল নিযেই আলোচনা করে। সুতরাং এই দিক থেকে বিচার করলেও দেশ ও কালকে প্রাক্-অভিজ্ঞতাজাতই বলতে হবে।

কাণ্টের মতে দেশ ও কাল সামান্যধারণা[৩]-ও নয। দেশ ও কাল যদি সামান্যধারণা হ'ত তবে প্রত্যক্ষগত বিভিন্ন দেশ ও কাল থেকে বিভিন্নতা আলাদা ক'রেই এই সামান্যধারণা লাভ করা যেত। কাণ্ট মনে করেন, বিভিন্ন দেশ ও কাল অখণ্ড দেশ ও কাল খণ্ডিত ক'রেই লাভ করা যায। অখণ্ড দেশ ও কালই আগে থাকে আর তা খণ্ডিত হযেই বিভিন্ন দেশ ও কালের সৃষ্টি হয।

১। Necessary ideas ২। Universal Proposition
৩। Concept

আমরা দেশকে অসীম আর কালকে অনাদি ও অনন্ত বলে জানি। যদি দেশ বিভিন্ন দেশের সামান্যধারণা থেকে উৎপন্ন হ'ত তবে বিভিন্ন দেশেরই অসীমতা থাকত। কিন্তু খণ্ড খণ্ড দেশ অসীম, এমন কথা নিশ্চয়ই কেউ বলবে না। কাল অনাদি ও অনন্ত। কিন্তু কোন বিশেষ কালই অনাদি ও অনন্ত নয়। সুতরাং বিভিন্ন বিশেষ কালের সামান্যধারণা হিসেবে অনাদি ও অনন্ত কালকে ভাবা যায় না। সুতরাং দেশ ও কাল সামান্যধারণা নয়।

কাণ্ট এই সমস্ত দিক আলোচনা ক'রে দেশ ও কালকে মনের পূর্বতঃসিদ্ধ আকার ব'লে অভিহিত করেছেন। দেশ ও কালের ধারণা মনে থাকে ব'লে সমস্ত অভিজ্ঞতার আগেই এদের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে, এমন কথা কাণ্ট বলেন না। মানুষের মনে এসমস্ত ধারণার সম্ভাবনা থাকে। অভিজ্ঞতার সময়ই এদের উদ্ভব হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হ'ল—দেশ ও কাল যদি মনের আকার মাত্রই হয় তবে জগতের বস্তু আমরা দেশে ও কালে দেখি কি ক'রে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে **হেগেল** বলেন, দেশ ও কাল পরব্রহ্মের আকার। পরব্রহ্মই চরম সত্য। মানুষের মন ও জগৎ উভয়ই পরব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ। সুতরাং দেশ ও কাল যেমন মানুষের মনের আকার, ঠিক তেমনি তা জাগতিক বস্তুরও আকার বটে। যেহেতু দেশ ও কাল জাগতিক বস্তুর আকার, সেইজন্যই আমরা সমস্ত বস্তু দেশে ও কালে দেখি।

(৪) আধুনিক কালে দেশ ও কাল সম্বন্ধে আইনস্টাইন যে মতবাদ প্রচার করেছেন, সাধারণভাবে তা-ই স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর মতে দেশ ও কাল আলাদা নয়। দেশ ছাড়া কাল বোঝা যায় না, আবার কাল ছাড়াও দেশ বোঝা যায় না। সুতরাং দেশ ও কাল না ব'লে দেশ-কাল বলাই ঠিক।[১]

দ্রষ্টা বা জ্ঞাতার গতির ওপর দেশ ও কাল নির্ভর করে। কিন্তু দ্রষ্টার গতির ওপর নির্ভর করলেও দেশ-কাল আত্মগত নয়। দেশ-কালই দুনিয়ার চরম তত্ত্ব। অন্য সব কিছুই এই দেশ-কালের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

দেশ ও কাল বিষয়গত না আত্মগত?

(Are Space and Time Objective or Subjective)?

দেশ ও কাল বিষয়গত না আত্মগত—এ এক জটিল প্রশ্ন। সত্যি সত্যিই জগতে দেশ ও কাল ব'লে কোন বস্তু আছে কি? না, দেশ ও কাল জ্ঞাতা

১। আইনস্টাইনের মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা এই অধ্যায়ের শেষের দিকে দ্রষ্টব্য।

মনের আকার বা জ্ঞান নির্ভর মাত্র? এই দুটি প্রশ্নই আলোচনা করতে হবে। বিভিন্ন দার্শনিক এসব প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন।

(ক) দেশ ও কাল বিষয়গত:

সাধারণতঃ মনে করা হয় যে দেশ ও কালের জ্ঞাতা নিরপেক্ষ বিষয়গত সত্তা আছে। এরা যেন দুটি আধারের মত যথাক্রমে সমস্ত বস্তু ও ঘটনাকে ধারণ ক'রে আছে। এই মতে দেশ ও কালের সঙ্গে বস্তু ও ঘটনার এক আধার-আধেয় সম্পর্ক রয়েছে। দেশ ও কাল সম্বন্ধে সাধারণ লোকের এই ধারণা নিউটন, গ্যালিলিওর মত বৈজ্ঞানিকেরাও সমর্থন করেছেন। তাঁদের মতে দেশ ও কাল যেন দুটি বিষয়গত আধার। সমস্ত বস্তুই দেশে থাকে আর সমস্ত ঘটনাই কালে ঘটে।

ডেকার্টের মতে জড একটি দ্রব্য।[১] বিস্তৃতি জডের স্বরূপলক্ষণ। বিস্তৃতি ছাড়া জড থাকতে পারে না, আবার জড ছাডাও বিস্তৃতি থাকতে পারে না। বিস্তৃতি ও দেশ সমার্থক। সুতরাং দেশ জডের স্বরূপলক্ষণ। অর্থাৎ দেশ বিষয়-গত সত্তাসম্পন্ন।

স্পিনোজার মতে ঈশ্বরই পরমতত্ত্ব ও সত্য। ঈশ্বরের অনন্ত গুণ। বিস্তৃতি বা দেশ এই অনন্ত গুণের অন্যতম গুণ। অর্থাৎ দেশ বা বিস্তৃতি ঈশ্বরে বর্তমান। স্পিনোজার দর্শনে, যা ঈশ্বর তা-ই প্রকৃতি।[২] সুতরাং ঈশ্বরের গুণ দেশপ্রকৃতিরও গুণ। কাজেই স্পিনোজার মতে দেশ বিষয়গত।

আধুনিক কালে আলেকজেণ্ডার দেশ-কালকে বিশ্বেব চরমতত্ত্ব বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে দেশ-কালই জগতের সমস্ত বস্তুর উপাদান। নিউটনের মত তিনি দেশ ও কালকে পরস্পর বিবিক্ত ব'লে মানতে রাজী নন। তাঁর মতে দেশ ও কালের পরস্পরনিরপেক্ষ কোন সত্তা নেই। দেশ ছাড়া কাল ভাবা যায় না, আবার কাল ছাড়াও দেশ ভাবা যায় না। দেশ বলতে আমরা কতগুলো বিন্দুর একত্র সমাবেশই বুঝি। কিন্তু বিন্দুগুলো যদি পর পর না থাকে তবে কোন দেশ সৃষ্টি হয় না। 'পরপর' বা পরম্পরা কাল সূচনা করে। সুতরাং দেশের ধারণার মধ্যেই কালের ধারণা নিহিত। অন্যদিকে কালের ধারণার মধ্যেও দেশের ধারণা আছে। কাল বলতে আমরা পারম্পর্য বুঝি। কিন্তু শুধু পারম্পর্য বোধগম্য নয়। 'ক' যদি 'খ'র পরে হয় তবে 'ক' ও 'খ' খানিকটা

১। Matter is a substance
২। God = Nature

দেশ জুড়ে থাকবেই। সুতরাং পরম্পরা বুঝতে গেলে দেশের ধারণা আপনি এসে যায়। কাজেই কাল কখনই দেশ ছাড়া হয় না, সুতরাং দেশ-কাল একান্তভাবেই পরস্পরসাপেক্ষ। আলেকজেণ্ডারের মতে অচ্ছেদ্য দেশ-কাল বিশ্বের আদিম উপাদান। জড়, প্রাণ, মন সব কিছুই দেশ-কাল থেকে এসেছে।

এই প্রসঙ্গে বার্গসঁর বক্তব্য ও আলোচনা করা যেতে পারে। বার্গসঁর মতে কালই চরমতত্ত্ব। কাল বলতে অবশ্য তিনি পারম্পর্য বোঝেন না। তাঁর মতে কাল এক অনাদি, অনন্ত প্রবাহ বিশেষ। এই প্রবাহে কোথাও কোন ছেদ নেই, বিরাম নেই। আমরা যে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ ব'লে কালের তিন ভাগ করি, বার্গসঁর মতে তা কখনই পরস্পরনিরপেক্ষ নয়। বর্তমান অতীতে গিয়ে মিশেছে আর অতীত ভবিষ্যতের কোলে এলিয়ে পড়েছে। অবিরাম গতিই কালের প্রকৃতি। কালই একমাত্র সত্য।

বুদ্ধি দিয়ে প্রবহমাণ কালকে সম্পূর্ণভাবে কখনই জানা যায় না। যখনই আমরা কালকে বুদ্ধি দিয়ে জানতে চেষ্টা করি তখনই তার অখণ্ডতা নষ্ট হ'য়ে যায়; প্রবাহ স্তব্ধ হ'য়ে গেছে বলে মনে হয়। বুদ্ধি দিয়ে কালকে জানার সময় যে স্থিরতার ভ্রান্তি উৎপন্ন হয় তারই নাম দেশ। সুতরাং বার্গসঁর মতে দেশ ব'লে কোন সত্যবস্তু নেই। দেশ বুদ্ধিসৃষ্ট এক ধারণামাত্র। কালই পরমতত্ত্ব ও সত্য। অন্তরের গভীরতায় এই কালের সঙ্গে একাত্ম হ'য়েই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

দেশ ও কাল প্রত্যক্ষজাত ধারণাবিশেষ:

আমরা লাইব্‌নিজের ভাববাদ আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি, চিৎপরমাণুই[১] তাঁর মতে চরমতত্ত্ব। তুনিয়ার পরিবর্তন ও গতি সব সময়েই চলেছে। সুতরাং গতিশীলতা চিৎপরমাণুর প্রাণ। এই চিৎপরমাণু জড় বা জড়াত্মক নয়। সুতরাং বিস্তৃতি বা দেশ এই চিৎপরমাণুর কোন ধর্ম হ'তে পারে না। কোন কোন চিৎপরমাণুর গতিশীলতা অন্য চিৎপরমাণুর চেয়ে অনেক কম। সুতরাং যে সমস্ত চিৎপরমাণুর গতিশীলতা কম তাদের যে সমস্ত চিৎপরমাণুর গতিশীলতা বেশী তাদের তুলনায় নিষ্ক্রিয় ব'লে মনে হয়। এই সব চিৎপরমাণুতে নিষ্ক্রিয়তার ভ্রান্তি বোধের জন্য এদের জড় ব'লে ধারণা হয়। যা জড় তার বিস্তৃতিও আছে। সুতরাং চিৎপরমাণুর নিষ্ক্রিয়তার ভ্রান্তিবোধের জন্যেই বিস্তৃতি বা দেশের ধারণা

১। Monad

হয়। কাজেই দেশ-বিষয়ক ধারণা অভিজ্ঞতাজাত ধারণাই বটে। আসলে চিৎপরমাণুর দেশগত কোন ধর্ম নেই।

লাইব্‌নিজ মনে করেন, কালের ধারণাও চিৎপরমাণুর পারস্পরিক সম্পর্কের ভ্রান্তিবোধ থেকে উৎপন্ন হ'য়ে থাকে। তাঁর মতে প্রত্যেক চিৎপরমাণু স্বনির্ভর। এক চিৎপরমাণু কখনই অন্য চিৎপরমাণুর ওপব প্রভাব বিস্তার করে না। কিন্তু দুনিয়ার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা মনে করি, এক চিৎপরমাণু যেন অন্য চিৎপরমাণুর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রভাব বিস্তার কালেই সম্ভব। সুতরাং চিৎপরমাণুর পারস্পরিক প্রভাবের ভ্রান্ত ধারণা থেকেই কালের ধারণার উৎপত্তি হয়। কাল বস্তুগত নয়, একান্তভাবেই অভিজ্ঞতাজাত ধারণা বিশেষ। দেশ ও কালের অস্তিত্ব আমরা অভিজ্ঞতাতেই লাভ করি। এদের প্রাক্-অভিজ্ঞতাজাত কোন সত্তা নেই।

কাণ্ট এই মতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়েছেন। কাণ্ট মনে করেন, দেশ ও কাল যদি অভিজ্ঞতাজাত ধারণা মাত্র হয়, তবে দেশ-নির্ভর জ্যামিতি ও কালনির্ভর গতিবিজ্ঞান কখনই সম্ভব হ'তে পারে না। জ্যামিতি ও গতি-বিজ্ঞানে সবজনগৃহীত সামান্যজ্ঞান[১] লাভ করা যায়। অভিজ্ঞতায় কখনও সামান্যজ্ঞান পাওয়া যায় না। অভিজ্ঞতায় আমরা কয়েকজন লোককে মরতে দেখি। কিন্তু 'সকল মানুষ মরে' এমন সামান্যজ্ঞান কখনও অভিজ্ঞতায় হ'তে পাবে না। অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞান কখনও সর্বজনগৃহীতও হয না। ভিন্ন ভিন্ন লোকের অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন রকমই হয। সুতরাং অভিজ্ঞতা সর্বজনগ্রাহ্য কোন জ্ঞান দিতে পারে না। কাজেই জ্যামিতি ও গতিবিজ্ঞান কখনই অভিজ্ঞতা-জাত ধারণা দেশ ও কাল নিভর হ'তে পারে না। দেশ ও কাল প্রাক্-অভিজ্ঞতা-জাতই হ'বে। কাণ্টের মতে দেশ ও কাল মনের পূর্বতঃসিদ্ধ আকারমাত্র। আমরা তাঁর মতবাদ পূর্বে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। এখন তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

দেশ ও কাল মনের পূর্বতঃসিদ্ধ আকার মাত্র :

কাণ্টের মতে দেশ ও কাল বস্তুগত নয়। যদি বস্তুগত হ'ত তবে জ্যামিতি ও গতিবিজ্ঞানের মত-সর্বজনগৃহীত নিশ্চিত বিজ্ঞান কখনই দেশ ও কালের ওপর নির্ভর করে সৃষ্টি হতে পারত না। কোন বস্তুই নিশ্চিত নয়। কারণ, সমস্ত বস্তুরই বিপরীত ভাবা যেতে পারে। যে ফুলকে সাদা বলি তাকে লাল ভাবতেও

১। Universal Knowledge

কোন আপত্তি নেই। 'সোনার পাথরের বাটি' বললে যেমন চিন্তার মধ্যেই বিরোধিতা দেখা দেয়, এই ক্ষেত্রে তেমন কোন বিরোধিতা দেখা যায় না। এমনি ক'রে দেখান যেতে পারে যে, কোন বস্তুই সন্দেহাতীত নয়। সুতরাং জ্যামিতি ও গতিবিজ্ঞানের মত নিশ্চিত শাস্ত্র কখনই বস্তু-নির্ভর হ'তে পারে না। কাজেই দেশ ও কাল বস্তুগত নয়।

কিন্তু সেজন্য দেশ ও কালকে অধ্যাসরূপাত্মকও বলা চলে না। যদি দেশ ও কাল অধ্যাসরূপাত্মক হ'ত তবে দেশ-নির্ভর জ্যামিতি আর কাল-নির্ভর গতি-বিজ্ঞান কখনই নিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারত না।

দেশ ও কালকে সামান্যধারণা[১]ও বলা যায় না। কারণ, কোন অভিজ্ঞতাই দেশ ও কাল ছাড়া হয় না। এই বিষয় আমরা দেশ ও কালের উৎপত্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। সুতরাং দেশ ও কাল অভিজ্ঞতাজাত নয়। আর অভিজ্ঞতা-জাত নয় এমন কিছু কখনই সামান্যধারণা হ'তে পারে না। অভিজ্ঞতায় বিশেষের (Particulars) জ্ঞান না পেলে কখনই সামান্যধারণার সৃষ্টি হয় না। অভিজ্ঞতায় কতগুলো মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে কি 'মানুষ' এই সামান্যধারণা কখনও করা যায় ?

কাণ্ট এই সমস্ত নানা রকমের সম্ভাব্যতা বিচার ক'রে বললেন—দেশ ও কাল মনের পূর্বতঃসিদ্ধ আকারই (A-priori forms of Intuition) হ'বে। কাণ্ট দেশ ও কালকে পূর্বতঃসিদ্ধ আকার বলতে কি বোঝেন, তা আমরা দেশ ও কালের উৎপত্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হ'বে যে, কাণ্টের মতে দেশ ও কালের আকার ছাড়া কোন জ্ঞানই হ'তে পারে না। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বহির্বিশ্ব থেকে আমরা যা পাই, কাণ্ট তার নাম দিয়েছেন অনুভব।[২] এই অনুভব দেশ ও কালের মধ্যেই গৃহীত হ'য়ে থাকে। কোন কিছু জানতে হ'লেই মন বস্তুর ওপর দেশ ও কালের আকার লাগিয়ে দেয়। দেশ ও কালের আকার মনের আকার। সুতরাং দেশ ও কালের মধ্যে কখনই বস্তু-স্বরূপকে জানা যায় না। যখনই দেশ ও কালের মধ্যে বস্তু-স্বরূপ[৩] উপস্থাপিত হয় তখন তা আভাস[৪] রূপ ধারণ করে। আভাস অভিজ্ঞতা-লভ্য বস্তু। সেজন্য কাণ্ট বলেন, দেশ ও কাল অভিজ্ঞতাতেই সত্য, বস্তু-স্বরূপের প্রসঙ্গে এদের কোন সত্যতা নেই[৫]। তবে দেশ ও কাল ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। দেশ ও কাল সমস্তই মানুষেরই জ্ঞানের আকার।

১। Concept ২। Intuition ৩। Thing-in-itself ৪। Appearance
৫। Space and Time are empirically real but transcendentally ideal.

কে. পিয়ার্সন 'গ্রামার অব সায়েন্স' নামক পুস্তকে কাণ্টের মতবাদই সমর্থন করেছেন। তিনি মনে করেন, দেশ ও কাল এই জগতের কোন বিষয় নয়, পরস্পর বিচ্ছিন্ন বস্তুকে এদের মাধ্যমেই আমরা প্রত্যক্ষ করি।[১]

কিন্তু এই মতবাদে দেশ ও কাল সম্বন্ধে আমাদের যে সাধারণ ধারণা আছে তা তৃপ্ত হয না। আমরা জাগতিক বস্তু দেশে ও কালেই দেখতে পাই। দেশ ও কাল যদি মনেব আকার হয তবে তা জগতেব বস্তুতে কি করে থাকে, তা ঠিক বোঝা যায না। সেজন্য হেগেল দেশ ও কালকে পরব্রহ্মের আকার বলে অভিহিত করেছেন। ব্যক্তি-মন ও জগৎ পরব্রহ্মের দুই প্রকাশ। সুতরাং দেশ ও কাল যেমন মনোগত ঠিক তেমনি বস্তুগতও বটে।

আধুনিক কালে দেশ ও কাল সম্বন্ধে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মতবাদই সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করেছে। আইনস্টাইনের মতে দেশ ও কাল পরস্পবনিরপেক্ষ নয়। দেশবিচ্ছিন্ন কাল বা কালবিচ্ছিন্ন দেশ ভাবা যায় না। সুতরাং দেশ ও কাল না বলে দেশ-কাল বলাই উচিত। দেশ ও কাল দ্রষ্টার গতির ওপর নির্ভর করে। দ্রষ্টার গতির ওপর নির্ভর করলেও দেশ-কাল আত্মগত নয। দেশ-কালই পরমতত্ত্ব। সমস্ত বস্তুই দেশ-কালের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায। আইনস্টাইনের এই মত দেশ-কালাপেক্ষিকতাবাদ (Space-Time Relativity) নামে পবিচিত। আমরা এই অধ্যাযেই দেশ ও কালের উৎপত্তি প্রসঙ্গে আইনস্টাইনের মতবাদ সামান্য আলোচনা করেছি। এখন এই আপেক্ষিকতাবাদের আর একটু বিস্তৃত আলোচনা করব।

দেশ-কালাপেক্ষিকতাবাদ (Space-Time Relativity)

নিউটন মনে করতেন, দেশ ও কাল যেন নিত্যকাল ধরেই একইরূপে রয়েছে। দেশ বস্তুর আধার, কাল ঘটনার আধার। বস্তু দেশে থাকে, কালে ঘটনা ঘটে। শুধু তাই নয়। দেশ ও কাল সম্পূর্ণ বিবিক্ত। একটি আর একটির ওপর কোন দিক থেকেই নির্ভরশীল নয়। আধুনিক বিজ্ঞান এই মতবাদে বিশ্বাস করে না।

আইনস্টাইনের নেতৃত্বে আধুনিক পদার্থবিদ্যায় দেশ ও কাল সম্বন্ধে এক নূতন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এই নূতন ধারণা পুরাতন মতবাদ থেকে দুই দিক দিয়ে স্বতন্ত্র।

১। "Space and Time are not the realities of the phenomenal world, but modes under which we perceive things apart".

প্রথমতঃ, চিরকাল দেশ ও কালকে ভিন্ন জিনিস বলে মনে করা হয়েছে। সাধারণ লোকের ধারণা দেশ বিস্তৃতি বোঝায় আর কাল বোঝায় পারম্পর্য। বিস্তৃতি পারম্পর্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন, পারম্পর্যও বিস্তৃতির সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত। কিন্তু আইনস্টাইন মনে করেন, দেশ ও কাল ভিন্ন নয়। আসলে কাল দেশেরই চতুর্থ মাত্রা[১] বিশেষ। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা—দেশের এই তিন মাত্রা। পারম্পর্য দেশের চতুর্থ মাত্রা। পারম্পর্য বলতে কাল বোঝায়। আইনস্টাইন মনে করেন, চার মাত্রা বিশিষ্ট দেশ-কালই আসল বস্তু। দেশ ও কাল দেশ-কাল-এর বিভিন্ন দিক মাত্র। দেশ স্বরূপতঃই কালিক সত্তা বিশিষ্ট। কালও স্বরূপতঃ দৈশিক সত্তা সম্পন্ন। আসলে দেশ-কাল পরস্পর অবিচ্ছিন্ন একই সত্তা। দ্বিতীয়তঃ, দেশ ও কাল দ্রষ্টার গতির ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। সূর্যে যদি কোন মানুষের অবস্থান সম্ভব হয় তবে তার দেশ-কাল পৃথিবীর লোকের দেশ-কাল থেকে ভিন্ন হবে, কারণ সূর্যের গতি আর পৃথিবীর গতি এক নয়।

দেশ-কাল সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানীদের এই মতবাদ দেশ-কালাপেক্ষিকতা-বাদ নামে পরিচিত। এই মতে দেশ ও কাল দ্রষ্টার গতির ওপর নির্ভরশীল হ'লেও তা কখনও আত্মগত নয়। বিশ্বের চরমতত্ত্বই এই দেশ-কাল। এই আপেক্ষিকতাবাদই দেশ-কাল সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত।

তর্কবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে যে ধারণার মধ্যেই স্ববিরোধ আছে, তা কখনও সত্য হ'তে পারে না। 'সোনার পাথরের বাটি' একটি স্ববিরোধ-সম্বলিত ধারণা। যে বাটি সোনার তা আবার পাথরের হ'তে পারে না। স্ববিরোধ-যুক্ত বলে 'সোনার পাথর বাটি' কোন সত্য ধারণা নয়। কোন কোন দার্শনিকের মতে দেশ ও কালের ধারণার মধ্যেও স্ববিরোধ রয়েছে। সুতরাং দেশ ও কালের ধারণা কখনই সত্য হ'তে পারে না। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক জিনো ও আধুনিক কালের ব্রেড্‌লি সাহেব এই মতবাদে বিশ্বাসী। আমরা এখন তাঁদের মতবাদ বিচার করে দেখব।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক জিনো মনে করেন, দেশ ও কালকে অনন্তভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যদি দেশ অনন্তভাগে ভাগ করা যায় তবে কোন রকমের গতিই সম্ভব হবে না। গতি বলতে এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে যাওয়াই বোঝায়। কিন্তু এই দুই বিন্দুর মধ্যে অনন্ত সংখ্যক বিন্দুই থাকতে পারে, কারণ দেশ অনন্তভাগে ভাগ করা যায়। সুতরাং এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে যাওয়া কখনই সম্ভব হবে না। যদি কোন একটা তীর দিয়ে কোন একটা বিশেষ দূরত্ব ভেদ করতে হয় তবে তাও সম্ভব হবে না। প্রথমতঃ তীর দিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্বের খানিকটা অংশ ভেদ করতে হবে। তা করতে গেলে খানিকটা অংশ, আবার তার খানিকটা

১। Fourth dimension

অংশ এমন করে অনন্তকাল ধরেই ভেদ করে যেতে হবে, আর তার ফলে নির্দিষ্ট দূরত্ব কখনই ভেদ করা যাবে না।

কাল সম্বন্ধেও একই কথা বলা যেতে পারে। যে কোন কালকেই অনন্ত খণ্ডে ভাগ করা যায়। আচিলেস্ যদি কচ্ছপকে ১০ মিনিট আগে দৌড়োতে দেয় তবে আচিলেস্ (কচ্ছপের চেয়ে যতই দ্রুত দৌড়োক না কেন) কখনই কচ্ছপকে ধরতে পারবে না। মনে করা যাক কচ্ছপ ১০ মিনিটে 'ক' বিন্দু থেকে 'খ' বিন্দু পর্যন্ত ছুটে গেছে। আচিলেস 'ঘ' বিন্দুতে পৌঁছোতে পৌঁছোতে কচ্ছপ 'গ' বিন্দুতে চলে যাবে। আচিলেস্ 'গ' বিন্দুতে পৌঁছোলে কচ্ছপ 'ঘ' বিন্দুতে চলে যাবে। এমনি করে কখনই আচিলেস্ কচ্ছপকে ধরতে পারবে না।

দেশ ও কালের ধারণা থেকে এই রকম ধরণের অসঙ্গতি ও অসম্ভাব্যতা দেখা দেয় বলে জিনোর মতে দেশ ও কালের ধারণা সত্য নয়।

আধুনিক কালে ব্রেড লিও দেশ ও কালের ধারণার মধ্যে নানারকম স্ববিরোধ দেখিয়েছেন। তাঁর মতে একদিক থেকে দেশ ও কাল সম্পর্ক মাত্র নয়, আবার অন্যদিক থেকে দেশ ও কাল সম্পর্ক ছাড়া অন্য কিছুও হ'তে পারে না। একই সঙ্গে দেশ ও কাল সম্পর্ক ও সম্পর্ক নয় হ'তে পারে না। সুতরাং ব্রেড্লির মতে দেশ ও কাল আভাস মাত্র (appearance), সত্য নয়।

এখন ব্রেড্লির বক্তব্য অনুধাবন করার চেষ্টা করা যাক।

(ক) দেশ একটা সম্পর্ক মাত্র নয়

সম্পর্কিত হওয়ার মত দুটো বস্তু না থাকলে কখনও সম্পর্ক হয় না। দেশ বিভিন্ন বিস্তৃত অংশ নিয়েই গড়ে উঠেছে। এই বিস্তৃত অংশগুলো একান্ত ভাবেই নিবেট (solid), কখনই সম্পর্ক মাত্র নয়। ডান বাম প্রভৃতি দৈশিক সম্পর্ক বিভিন্ন দেশকেই সম্পর্কিত করে। এই বিভিন্ন দেশগুলো সম্পর্কমাত্র নয়। দেশ যদি শুধু একটা সম্পর্ক হ'ত তবে সম্পর্কিত বস্তু ছাড়াই এই সম্পর্ক ভাবতে হ'ত। যখনই সম্পর্কিত বস্তুগুলো গ্রহণ করা হয় তখনই বোঝা যায় দেশ কখনও কতকগুলো সম্পর্কের সম্পর্কমাত্র হতে পারে না। দেশ সম্পর্ক মাত্র নয়।

(খ) দেশ একটা সম্পর্ক ছাড়া অন্য কিছু হ'তে পারে না

যে কোন দেশই কতকগুলো অংশের সমষ্টি হবে। যদি এই অংশগুলো দেশ না হয় তবে অংশের সমষ্টি কখনই দেশ হ'তে পারে না। দেশের অংশ বিস্তৃতই হবে। যদি তা বিস্তৃত হয়, তা'হলে আবার তার অংশ থাকবে, এই অংশের আবার অংশ থাকবে ; এমনি করে শেষাংশ আর কখনই পাওয়া যাবে না। যে কোন বিস্তৃত জিনিসই একটা সমষ্টি। এই সমষ্টি আবার কতগুলো বিস্তৃতিরই সম্পর্ক। এই বিস্তৃতিগুলোও আবার কতগুলো বিস্তৃতির সম্পর্ক। এমনি

করে চিরকালই বিস্তৃতির সম্পর্ক পাওয়া যাবে। দেশ একটা সম্পর্ক বা বিভিন্ন সম্পর্কের সম্পর্ক, তার সম্পর্ক, তার সম্পর্ক—এর আর শেষ নেই।

অনুরূপ ভাবে যুক্তি করেই ব্রেড্‌লি দেখিয়েছেন যে, কাল একটা সম্পর্কমাত্র নয় আবার তা সম্পর্ক ছাড়াও অন্য কিছু হতে পারে না। সুতরাং দেশের মত কালও স্ববিরোধযুক্ত বলে সত্য নয়, আভাস মাত্র। অবশ্য ব্রেড্‌লি মনে করেন, এই সমস্ত আভাসই পরমতত্ত্ব ও পরম সত্য পরব্রহ্মের কোলে স্থান পায়। ব্রেড্‌লির পরব্রহ্ম (Absolute) কিছুই প্রত্যাখ্যান করে না, সবই নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নেয়। **তাই ব্রেড্‌লির মতে দেশ ও কাল দেশকালোত্তীর্ণ পরব্রহ্মের আভাস মাত্র।** (Space and Time and the appearance of a Reality which is spaceless and timeless.)

সমালোচনা :—আমাদের মনে হয়, জিনো ও ব্রেড্‌লি উভয়েই দেশ ও কালকে কতগুলো অংশের সমষ্টি মনে করেছেন বলে নানা রকমের জটিলতা ও সমস্যা দেখা দিয়েছে। আসলে দেশ ও কাল কতগুলো অংশের সমষ্টিমাত্র নয়। দেশ এক ও অদ্বিতীয়। বিভিন্ন দেশ এই অদ্বিতীয় দেশেরই খণ্ডিত প্রকাশ। কালও একান্তভাবেই নিরবচ্ছিন্ন। আমরা যে কালকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করি তা আসলে আমাদেরই সৃষ্টি। বস্তুতঃ কালে কোন ভাগ নাই। ফরাসী দার্শনিক বার্গস ত এ-কথাই বলেছেন। তাঁর মতে কাল এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। এই প্রবাহ বুদ্ধি দিয়ে জানতে গেলেই নানা খণ্ডিত অংশের সৃষ্টি হয়। এই খণ্ডিত অংশ আমাদের বুদ্ধির সৃষ্টি। আসলে কালের মধ্যে কোন ছেদ বা বিভাগ নেই। কাল সম্পূর্ণভাবে ছেদ ও ভেদহীন। কালের এই ধারণা নিলে জিনো বা ব্রেড্‌লির কোন সমস্যাই দেখা দেয় না। সুতরাং জিনো বা ব্রেড্‌লির সমস্যা আসলে কোন সমস্যাই নয়। এগুলো দেশ ও কাল সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত কতগুলো জঞ্জাল বিশেষ। আধুনিক দার্শনিকেরা এই জঞ্জাল পরিষ্কার করে চিন্তার পথ সহজ করে নিয়েছেন।

সপ্তম অধ্যায়

দ্রব্য ও কারণ

(Substance and Cause)

সাধারণ দৃষ্টিতে দ্রব্য :

সাধারণতঃ লোকে জগৎটাকে কতগুলো পরস্পরনিরপেক্ষ বস্তুর সমষ্টি বলে মনে করে। টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি সবই পরস্পরনিরপেক্ষ বস্তু। এই জাতীয় প্রত্যেক বস্তুতেই রূপ, রস, গন্ধ, আকার, আয়তন, ঘনত্ব প্রভৃতি গুণের মধ্যে কতগুলো গুণ নিশ্চয়ই থাকে। বিভিন্ন গুণের আধার বস্তুগুলিকে সাধারণতঃ দ্রব্য বলা হয়।

এই সমস্ত দ্রব্য শত পরিবর্তনের মধ্যেও কম বেশী অপরিবর্তিত থাকে। টেবিলের রঙ্ চটে যেতে পারে, নানা রকমের অত্যাচারের ফলে টেবিলের স্বাভাবিক আকার বিকৃত হতে পারে; কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও লোকে টেবিলকে টেবিলই বলবে। একজন লোক বেড়িয়ে এসে ক্লান্ত হ'য়ে শুয়ে পড়লেন। বেড়ানো আর শোওয়া—নিশ্চয়ই দুটো ভিন্ন অবস্থা। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে একই ব্যক্তির যে দুই ভিন্ন অবস্থা, তা স্বীকার করতে হয়। অবস্থার পরিবর্তনে ব্যক্তির কোন পরিবর্তন হয়নি। শত পরিবতনের মধ্যে যা মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে তারই নাম দ্রব্য।

অপরিবর্তিত থাকে বলে দ্রব্যকে ক্রিয়াশীলতার উৎস বলা যেতে পারে। অপরিবর্তিত দ্রব্য আছে বলেই পরিবর্তন সম্ভব। পরিবর্তনের কখনও পরিবর্তন হয় না।

সাধারণ দৃষ্টিতে দ্রব্যকে গুণের আধার বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হ'ল — দ্রব্যের সঙ্গে গুণের এই সম্পর্ক কি যুক্তিগ্রাহ্য? চিনি বলতে তার মিষ্টত্ব, শ্বেতত্ব প্রভৃতি গুণের সমষ্টি ছাড়াও আর একটু কিছু বুঝি। এই 'আর একটু কিছু' হচ্ছে সেই জিনিস যার এই সব গুণগুলো আছে। এরই নাম দ্রব্য। কিন্তু চিনির সমস্ত গুণ বাদ দিলে ত' আর কিছুই থাকে না। তবে গুণের আধার দ্রব্য কোথায়?

সাধারণ দৃষ্টিতে দ্রব্য সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা হয় তা যুক্তিগ্রাহ্য নয় বলে নানা রকমের দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব হয়েছে। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা দ্রব্যের এক রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রত্যক্ষবাদীদের মতে দ্রব্যের রূপ অন্য

রকমের। কাণ্ট দ্রব্যের অন্যরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই বিষয়ে হেগেলের মত একটু অন্য রকমের। আমরা এখন এই সব বিভিন্ন মত আলোচনা করব।

বুদ্ধিবাদীদের মতে দ্রব্য

বুদ্ধিবাদীদের মতে যা স্বনির্ভর ও অন্যনিরপেক্ষ স্থিতিসম্পন্ন তার নাম দ্রব্য। অন্যনিরপেক্ষতা দ্রব্যের স্বরূপলক্ষণ। গুণ দ্রব্যের ওপরই নির্ভরশীল। দ্রব্য ছাড়া গুণ থাকতে পারে না। সুতরাং গুণ দ্রব্য নয়।

ডেকার্টে মনে করেন, ঈশ্বর, মন ও জড়—এই তিনটিই দ্রব্য। মন ও জড় ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল। কারণ ঈশ্বরই এদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মন ও জড় কি করে ঈশ্বরসাপেক্ষ হয়েও দ্রব্য হয়—তা বোঝা গেল না। ডেকার্টের মতে অন্যনিরপেক্ষতাই দ্রব্যের স্বরূপ লক্ষণ। এই লক্ষণ অনুসারে একমাত্র ঈশ্বরই দ্রব্য হতে পারে, কারণ একমাত্র ঈশ্বরই কারও ওপরই নির্ভরশীল নয়। ডেকার্টের দ্রব্যের সংজ্ঞা থেকে স্পিনোজা এই সিদ্ধান্তই করেছেন। তাঁর মতে ঈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য। মন ও জড় ঈশ্বরের অসংখ্য গুণের মধ্যে পরিচিত দুটি গুণ। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য ও সত্তা। অন্য সমস্তই ঈশ্বরের ওপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল। এইভাবে স্পিনোজা বিশ্বের চরম সত্যতা অস্বীকার করলেন। রাম, শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব মিথ্যা প্রতিপন্ন হ'ল। কিন্তু মানুষ এরকম দর্শনে তৃপ্ত রইল না। যেখানে দার্শনিকের ব্যক্তিত্বই নেই সেখানে তাঁর কথার মূল্য কি? বিশেষতঃ সত্য যদি এক পূর্ণ ও অনন্ত দ্রব্য হয় তবে ত' কোন পরিবর্তন ও গতিই সম্ভব নয়। এক পূর্ণ তত্ত্বের কখনও পরিবর্তন হয় না, কারণ পরিবর্তন হ'লে পূর্ণ আর পূর্ণ থাকে না। যা অনন্ত তারও পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তন হ'লে অনন্তের যে অন্ত হয়। কিন্তু দুনিয়ার পরিবর্তন ত' হামেসাই দেখা যায়। সুতরাং এই পরিবর্তন অস্বীকার করলে চলবে কেন?

সেজন্য লাইব্‌নিজ্‌ দ্রব্যের সংজ্ঞাই বদলে দিলেন। তাঁর মতে অন্য-নিরপেক্ষভাবে থাকতে পারাই দ্রব্যের লক্ষণ নয়, অন্যনিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে পারাই দ্রব্যের স্বরূপ। এই অর্থে দ্রব্য এক নয়, বহু। বহু দ্রব্যই একসঙ্গে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে। লাইব্‌নিজ্‌ এই দ্রব্যের নাম দিয়েছেন 'চিৎপরমাণু'[১]। চিৎপরমাণু অবিভাজ্য। যে-কোন জড়াত্মক বস্তুই বিভাজ্য। সেজন্য লাইব্‌নিজের 'চিৎপরমাণু' জড়াত্মক নয়, চেতন।

১। Monad

প্রত্যক্ষবাদীদের মতে দ্রব্য

প্রত্যক্ষবাদীদের মতে প্রত্যক্ষই জানার একমাত্র উপায়। প্রত্যক্ষ দুই দিক থেকে হ'তে পারে—সংবেদনের দিক[১] আর অন্তর্দর্শনের দিক।[২] সংবেদনের দিক থেকে বাইরের বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। অন্তর্দর্শনে মানসিক অবস্থার জ্ঞান হয়।

সংবেদনের সাহায্যে আমরা বস্তুর গুণ জানতে পারি। গুণাতিরিক্ত কোন অপরিবর্তিত সত্তার পরিচয় সংবেদনে পাওয়া যায় না। সুতরাং বস্তুর মধ্যে গুণাতিরিক্ত দ্রব্য বলে কিছু নেই।

অন্তর্দর্শনের সুখ, দুঃখ, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি কতগুলো মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কোন অপরিবর্তিত সত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং মনের দিক থেকেও দ্রব্য বলে কিছু নেই। যে কোন সার্থক প্রত্যক্ষবাদীদের পক্ষে এই সিদ্ধান্তই সম্ভব। কোন সার্থক প্রত্যক্ষবাদীই দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু অনেক প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদের মধ্যেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

জন লক গুণের আধার হিসেবে দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, আমরা যখনই যে কোন বস্তু দেখি না কেন তখনই সোজাসুজি তার কতগুলো গুণ পাই। কিন্তু গুণগুলো ত' আর হাওয়ায় ভাসতে পারে না। এরা কোথাও না কোথাও থাকবে। লক এই সমস্ত গুণের আধার হিসেবে দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। এই দ্রব্য কখনই জানা যায় না। আমরা বস্তুর এই গুণই শুধু জানতে পারি। সে জন্যই লক দ্রব্যের নাম দিয়েছেন "অজ্ঞাত তত্ত্ব"।[৩]

সাধারণ লোকের মতই লক তিন জাতীয় দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণের আধার হিসেবে জড় দ্রব্য; সুখ, দুঃখ প্রভৃতি গুণের আধার হিসেবে আত্মা;[৪] আর সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি গুণের অধিষ্ঠান হিসেবে ঈশ্বর—এই তিন জাতীয় দ্রব্য।

বার্কলি জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে বহির্বিশ্বে গুণ ছাড়া গুণের আধার হিসেবে কোন কিছু জানা যায় না। লকের "অজ্ঞাত তত্ত্ব"

১। From Sensation

২। From Reflection

৩। Know-not-what

৪। জড় দ্রব্য—Physical substance আত্মা—Soul substance

মানার কোন অর্থ নেই। যা জানি না তা আছে, এমন কথা বলা যায় না। কোন কিছু আছে বললে তার সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান সর্বদাই প্রকাশ পায়। সুতরাং 'অজ্ঞাত তত্ত্ব' আছে, এমন কথা বলা যায় না।

বহির্বিশ্বে যদি কোন 'অজ্ঞাত তত্ত্ব' না থাকে তবে অনুরূপ যুক্তিতে অন্তর রাজ্যেও আত্মা বলে কোন 'অজ্ঞাত তত্ত্ব' থাকতে পারে না। কিন্তু বার্কলি সহজ যুক্তি মানতে রাজী নন। তিনি বিভিন্ন ধারণার আধার হিসেবে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তিনি বলেন, অনুভূতির[১] মধ্য দিয়ে এই আত্মাকে জানা যায়। বার্কলি ঈশ্বরের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করেন।

হিউম জড় দ্রব্য বা আত্মা কোন কিছুর অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, বহির্বিশ্বে যেমন রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণ ছাড়া কোন অজ্ঞাত তত্ত্ব জানা যায় না, তেমনি আমাদের অন্তর-রাজ্যেও সুখ, দুঃখ প্রভৃতি কতগুলো মানসিক অবস্থা ছাড়া আত্মা বলে কোন অপরিবর্তিত তত্ত্ব পাওয়া যায় না। সুতরাং জড়দ্রব্য ও আত্মা বলে কিছুই নেই। হিউম ঈশ্বরের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে সংবেদন ও অন্তর্দর্শনই জ্ঞানলাভের দুই পথ। সংবেদন ও অন্তর্দর্শনে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। সুতরাং ঈশ্বর নেই।

আমরা আগেই দেখেছি, কোন সার্থক প্রত্যক্ষবাদীই দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারেন না। হিউম একজন সার্থক প্রত্যক্ষবাদী হিসেবে সমস্ত রকম দ্রব্যের অস্তিত্বই অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে দুনিয়ায় পরিবর্তমান পরস্পর-অসংলগ্ন কতগুলো গুণই আছে ; গুণের আধার বলে কিছু নেই।

কাণ্টের মতে দ্রব্য ঃ

কাণ্ট মনে করেন, যদি আমরা কোন অপরিবর্তিত সত্তায় বিশ্বাস না করি তবে পরস্পর-অসংলগ্ন পরিবর্তমান গুণ কখনই জানা যায় না। এমন একটা 'জিনিস' থাকবেই যাকে অবলম্বন করে পরিবর্তমান গুণ বা অবস্থা থাকতে পারে। পরিবর্তন বোধগম্য করতে হ'লে এক অপরিবর্তিত সত্তায় বিশ্বাস করতে হয়। অপরিবর্তিত বলে কিছু না থাকলে পরিবর্তন হ'তে পারে না। কিন্তু দুনিয়ায় আমরা কতগুলো পরিবর্তমান গুণই পাই। অপরিবর্তিত কোন সত্তা জগতে দেখা যায় না। সুতরাং কাণ্ট মনে করেন, অপরিবর্তিত সত্তা বা দ্রব্য প্রাক্-অভিজ্ঞতাসিদ্ধ জ্ঞানের আকারই হবে।[২] দ্রব্য জ্ঞানের একটা

১। Notion

২। A-priori category of the Understanding

আকার। কোন প্রত্যক্ষের ওপরই তা নির্ভরশীল নয়। যখনই আমরা পরিবর্তমান গুণগুলোকে জানি তখনই এই জ্ঞানের আকার দিয়েই জানি। এই অপরিবর্তিত সত্তা বা দ্রব্যের মাধ্যমে জানি বলেই পরিবর্তমান গুণগুলোর পরিবর্তমানতার একটা অর্থ বোঝা যায়। দ্রব্য আমাদের মন-নিরপেক্ষ বিষয়গত সত্তা নয়। আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানে যে সমস্ত পরিবর্তন দেখি তা অর্থপূর্ণ করার জন্য দ্রব্য একান্তভাবেই আবশ্যক। এই দ্রব্য জ্ঞানের আকার বিশেষ। আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই দ্রব্যের সত্যতা স্বীকার করা যেতে পারে। দ্রব্যের জ্ঞাননিরপেক্ষ কোন আত্যন্তিক সত্তা নেই।

কাণ্ট দ্রব্যের আত্যন্তিক সত্তা অস্বীকার করেছেন। কারণ তাঁর মতে জ্ঞান-নিরপেক্ষ বস্তু-স্বরূপ[১] আছে। এই বস্তু-স্বরূপে দ্রব্যের কোন ব্যবহার হ'তে পারে না। একমাত্র জ্ঞানের বিষযেই দ্রব্যের ব্যবহার হয। জ্ঞানের বিষয় বস্তু-স্বরূপ নয, অবভাস মাত্র[২]। কাণ্ট জ্ঞানের বিষয বা অবভাস ও বস্তু-স্বরূপের মধ্যে একটা পার্থক্য করেছেন এবং বলেছেন, দ্রব্যের কোন বস্তু-স্বরূপগত সত্তা নেই।

হেগেল মনে করেন, অবভাস ও বস্তু-স্বরূপের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। মানব মন ও বস্তু-স্বরূপ উভযই এক পরব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ। সুতরাং মনের বা জ্ঞানের আকার বস্তু-স্বরূপের আকারও বটে। মনের আকারে আকারিত অবভাস আর বস্তু-স্বরূপে কোন তফাৎ নেই। সুতরাং মনের বা জ্ঞানের আকার দ্রব্য বস্তু-স্বরূপেরও আকার বটে।

দ্রব্য গুণের আধার মাত্র নয। হেগেল মনে করেন, দ্রব্য ছাড়া যেমন গুণ থাকতে পারে না, গুণ ছাড়াও তেমনি দ্রব্য থাকতে পারে না। দ্রব্য ও গুণের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। প্রত্যেক বাস্তবতত্ত্বেরই অচ্ছেদ্য দুই দিক রয়েছে—এক সত্তার দিক আর একটা গুণের দিক। এদের একটা ছাড়া আর একটা সম্পূর্ণ অর্থহীন। প্রত্যেক দ্রব্যই এই সত্তা ও গুণের অচ্ছেদ্য সমষ্টি। দ্রব্য তার বিচিত্র ও পরিবর্তমান গুণের মধ্য দিযে নিজেকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে। দ্রব্য ও গুণ সম্পূর্ণ একও নয়, আবার তারা সম্পূর্ণ পৃথকও নয়। আসলে দ্রব্য ও গুণের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটা ঐক্য আছে। দ্রব্যের এই ঐক্য গুণের পার্থক্যের মধ্য দিয়েই বিকশিত ও পরিপূর্ণ হয়।

১। Thing in-itself
২। Phenomenon

আমাদের ধারণা—হেগেলের এই মতবাদই দ্রব্য সম্বন্ধে একমাত্র গ্রহণযোগ্য মতবাদ। দ্রব্যকে গুণের আধার বললে তার পরিচয় আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানে পাওয়া যায় না। দ্রব্য গুণাতিরিক্ত স্বনির্ভর সত্তা বললে গুণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু যদি হেগেলের মত সত্তা ও গুণের সমষ্টিকেই দ্রব্য বলা হয় তবে কোন অসুবিধা হয় না। আমরা প্রত্যক্ষজ্ঞানের সত্তা ও গুণ অচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধই দেখতে পাই। বিচিত্র গুণের মধ্য দিয়েই সত্তার প্রকাশ ও পরিপূর্ণতা—একথাও স্বীকার করতে হয়। সুতরাং সব দিক থেকেই হেগেলের মতবাদ আমাদের গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

দ্রব্য সম্বন্ধে কয়েকজন অত্যাধুনিক দার্শনিকের অভিমত

আমরা দেখেছি, গুণ ছাড়া দ্রব্য থাকতে পারে না, আবার দ্রব্য ছাড়াও গুণ থাকতে পারে না। দ্রব্য ও গুণের মধ্যে এক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। দ্রব্য গুণের মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। দ্রব্য ও গুণের সমাবিষ্ট রূপই বাস্তব তত্ত্ব[১]।

আধুনিক কালে ব্রেড্‌লি এই ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তাঁর মতে—দ্রব্য ও গুণ এই আকারের সাহায্যে বস্তু-স্বরূপকে জানা যায় না। দ্রব্য ও গুণের ধারণার মধ্যে স্ববিরোধ আছে। যা স্ববিরোধযুক্ত তা কখনও সত্য হ'তে পারে না। সুতরাং দ্রব্য ও গুণ কখনই বাস্তবতত্ত্ব হ'তে পারে না। 'আকাশ নীল' এই বচনে 'আকাশ' দ্রব্য আর 'নীল' গুণ। এই বচনে দ্রব্য যদি গুণ থেকে একান্ত পৃথক হয় তবে 'আকাশ নীল' একথা বলার কোন অর্থই হয় না। 'রাম রাম' এমন কথা কি কেউ বলে? হয় দ্রব্য ও গুণ এক হবে, না হয়ত এরা পৃথক হবে। কিন্তু যদি এই দুই সম্ভাবনার কোনটাই সম্ভব না হয়—তবে দ্রব্য ও গুণকে মিথ্যা ধারণাই বলতে হয়। আগেই দেখান হয়েছে দ্রব্য গুণ থেকে পৃথকও হ'তে পারে না, আবার তা একও হ'তে পারে না। সুতরাং দ্রব্য ও গুণ কোন বাস্তবতত্ত্ব হ'তে পারে না। এরা প্রকাশ বা আভাসমাত্র।[২] অবশ্য ব্রেড্‌লির মতে সমস্ত আভাসই শেষ পর্যন্ত চরমতম পরব্রহ্মের কোলে ঠাঁই পায়। পরব্রহ্ম কিছুই মিথ্যা বা তুচ্ছ বলে প্রত্যাখ্যান করেন না। পূর্ণের প্রসাদে সকল অপূর্ণেরই পূর্ণের মধ্যে একপ্রকার সদ্‌গতি হয়।

১। Real Principle
২। Appearance

ব্রেড্‌লির এই মতবাদের বিরুদ্ধে বলতে গেলে দুটো কথাই বিশেষ করে মনে পড়ে।

প্রথমতঃ—দ্রব্য ও গুণ যদি মিথ্যা বা আভাসমাত্র হয়, তবে তা চরমতত্ত্ব পরব্রহ্মের মধ্যে স্থান পায় কি করে? সত্যের মধ্যে কি মিথ্যা থাকতে পারে? ব্রেড্‌লির মতে পরব্রহ্ম সৎ ও সত্য। এই পরব্রহ্মের মধ্যে কি ভাবে দ্রব্য ও গুণের মত মিথ্যা বস্তুর স্থান হ'তে পাবে—তা আমরা বুঝি না।

দ্বিতীয়তঃ—ব্রেড্‌লি মনে করেছেন, দ্রব্য ও গুণ হয় এক হবে না হয়ত তারা একান্তভাবেই পৃথক হবে। এই দুই সম্ভাবনা ছাড়া ব্রেড্‌লি তৃতীয় সম্ভাবনা স্বীকার করেন না। কিন্তু আমরা দ্রব্য ও গুণের যে সম্পর্ক স্বীকার করেছি তাতে এই তৃতীয় সম্ভাবনার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। আমাদের মতে দ্রব্য ও গুণ একান্তভাবে একও নয়, আবার তারা একান্তভাবে পৃথকও নয়। দ্রব্য ও গুণের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটা ঐক্য আছে। গুণের বৈচিত্র্যের মধ্যেই দ্রব্যের ঐক্য সম্যকভাবে বিকশিত ও পরিপূর্ণ হয়। সুতরাং দ্রব্য ও গুণের এই সম্পর্ক স্বীকার করলে ব্রেড্‌লির মতবাদ গ্রাহ্য হ'তে পারে না।

আলেকজেণ্ডারের মতে দেশ-কাল[১] বা শুদ্ধ গতিই[২] পৃথিবীর আদিম উপাদান। এই দুনিয়ার সমস্ত বস্তুই শুদ্ধগতির কোন না কোন পরিণতি বিশেষ। গতিই জাগতিক সমস্ত বস্তুর যথার্থ সত্তা। সুতরাং কোন বস্তুই একেবারে গতিহীন হ'তে পারে না। তবে নিজ সীমার মধ্যে বস্তু যে তার কাঠামো কম বেশী বজায় রেখে চলে তাকেই দ্রব্য বলা যেতে পারে। যে কোন বস্তুকে দু'টি বিভিন্ন দিক থেকে দেখা যেতে পারে—একটা হ'ল স্থিতির দিক, আর একটা হ'ল গতির দিক। বস্তুকে যখন স্থিতির দিক থেকে দেখি তখন তার নাম দ্রব্য, আর যখন গতির দিক থেকে দেখি তখন তা কারণ।

রাসেলের মতে দ্রব্য নামক আকার সাধারণ জ্ঞানের আলোচ্য 'বস্তু'[৩] নামক ধারণার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। তিনি মনে করেন, চিরস্থায়ী বস্তু বলে কিছু নেই। আধুনিক কালে পদার্থবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান উভয়ই এই চিরস্থায়ী দ্রব্যের ধারণা অবাস্তব বলে প্রতিপন্ন করেছে। তাঁর মতে বিশ্বের সরলতম উপাদান[৪] হচ্ছে ঘটনা[৫]। ঘটনাই বিশ্বের সমস্ত বস্তুর একমাত্র একক।

১। Space-Time
২। Pure Motion
৩। Object
৪। Simplest elements
৫। Events

সমস্ত বস্তুই প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। দুনিয়ায় অপরিবর্তিত সত্তা বলে কিছু নেই।

সমালোচনা :—আলেকজেণ্ডার ও রাসেলের মতের বিরুদ্ধে একটা কথা আমাদের অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়। দুনিয়ার গতিই চরমতত্ত্ব একথা কি যুক্তি দিয়ে বোঝা যায়? গতি ও স্থিতি পরস্পর সাপেক্ষ। স্থিতি না থাকলে গতি হয় না, আবার গতি না থাকলে স্থিতি থাকে না। কিন্তু স্থিতি নেই, শুধু গতি আছে—একথা ভাবা যায় না। স্থিতি গতিরই একটা বিশেষ রূপ তাও বোঝা যায় না। স্থিতি ও গতির মধ্যে পার্থক্য এত সুস্পষ্ট যে স্থিতি কখনই গতির এক বিশিষ্ট প্রকাশ হ'তে পারে না।

রাসেল বলেন, ঘটনাই বস্তুর একক। কিন্তু, যা না ঘটে তাকে ত ঘটনা বলা যায় না। আর যার খানিকটা স্থিতি আছে তাইত ঘটতে পারে। সুতরাং স্থিতি না হ'লে ঘটনা বোঝা যায় না। আমাদের মনে হয়, দুনিয়ায় গতি ও স্থিতি দুইই সমানভাবে আছে। আমরা দ্রব্যের যে ধারণা গ্রহণ করেছি তাতে স্থিতি ও গতির এক অপূর্ব সমন্বয় হয়েছে। আমাদের মতে দ্রব্য গুণের পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই তার স্বকীয়তা, বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণতা লাভ করে। দ্রব্যের স্থিতি গুণের পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সার্থক হ'য়ে ওঠে।

দ্রব্যের ধারণার উৎপত্তি :

সাধারণ লোক মনে করে, দ্রব্যের ধারণা প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকেই লাভ করা যায়। জড় দ্রব্য বহিঃপ্রত্যক্ষের মধ্য দিয়েই জানা যায়। আন্তঃপ্রত্যক্ষ আত্মার অস্তিত্ব প্রকাশ করে। কিন্তু সার্থক **প্রত্যক্ষবাদীরা বলেন,** প্রত্যক্ষের মধ্য দিয়ে আমরা কোন দ্রব্যই পাই না। প্রত্যক্ষে কতগুলো গুণের পরিচয়ই পাওয়া যায়। গুণাতিরিক্ত কোন চিরস্থায়ী দ্রব্য প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। প্রত্যক্ষবাদীরা একথা ঠিকই বলেছেন। অবশ্য লক প্রত্যক্ষবাদী হয়েও জড়দ্রব্য, আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তবে তিনি যে সার্থক প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক ছিলেন না—একথা সবাই স্বীকার করে। হিউম সমস্ত রকম দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। তিনিই সত্যিকারের স্ববিরোধ-বিমুক্ত প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক।

হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে দ্রব্যের ধারণা আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রত্যক্ষ-জ্ঞান থেকেই লাভ করেছিলেন। আমরা এখন এই ধারণা বংশানুক্রমে জন্মের সঙ্গে

সঙ্গেই পেয়ে থাকি। আমাদের পক্ষে দ্রব্যের ধারণা প্রত্যক্ষনির্ভর নয়, এই ধারণা সহজাতই বটে।

আমরা আগেই দেখেছি যে, প্রত্যক্ষজ্ঞান থেকে কোন দ্রব্যের ধারণা পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রত্যক্ষ থেকেই দ্রব্যের ধারণা লাভ করেছিলেন—একথা মানা যায় না।

অপরোক্ষানুভূতিবাদীদের[১] ধারণা, আমরা আত্মসচেতনতার[২] মধ্যে সোজাসুজি দ্রব্যের ধারণা লাভ করি। আমরা যখনই আত্মসচেতন হই, তখনই বুঝি আমাদের মধ্যে এক চিরস্থায়ী আত্মা আছে। নিজেদের আত্মার চিরস্থায়িত্ব বুঝতে পেরে প্রকৃতিতেও কোন কোন চিরস্থায়ী বস্তু আছে, এমন কথা আমাদের মনে হয়।

হিউম মনে করেন, অন্তর্দর্শনের মধ্যে কোন চিরস্থায়ী আত্মারই পরিচয় পাওয়া যায় না। সুখ, দুঃখ প্রভৃতি কতগুলো পরিবর্তমান মানসিক গুণই অন্তদর্শনে লাভ করা যায়। সুতরাং অপরোক্ষানুভূতিবাদীরা যে বলেন, আত্ম-সচেতনতায় চিরস্থায়ী আত্মার পরিচয় পাওয়া যায়, এ কথা মানা যায় না।

পূর্বের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে দ্রব্যের ধারণা কোন রকমের প্রত্যক্ষ থেকেই লাভ করা যায় না। **কাণ্টও** একথার সত্যতা স্বীকার করেন। তাঁর মতে দ্রব্যের ধারণা অভিজ্ঞতার প্রাক্‌সিদ্ধ আকার।[৩] অপরিবর্তিত দ্রব্যের ধারণা না থাকলে অভিজ্ঞতায় পরিবর্তমান যে সমস্ত গুণ পাই তা বোধগম্য হয় না। অপরিবর্তিত কিছু থাকলেই পরিবতন বোঝা যায়। সুতরাং কাণ্টের মতে দ্রব্য প্রাক্-অভিজ্ঞতাসিদ্ধ জ্ঞানের আকার বিশেষ। এই আকার প্রত্যেক মানুষের মনেই থাকে। জ্ঞানের সময় এই আকারের ব্যবহার হ'য়ে থাকে। সুতরাং কাণ্টের মতে দ্রব্য মনের এক আকার বিশেষ।

হেগেল বলেন, মনের আকার বস্তুরও আকার; কারণ, মন ও বস্তু একই পরব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ। সুতরাং দ্রব্য শুধু জ্ঞানের বিষয়ের পক্ষেই সত্য নয়, দ্রব্য বস্তুস্বরূপের পক্ষেও সত্য।

এই বিস্তৃত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তই করব যে, দ্রব্যের ধারণা প্রত্যক্ষজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে না। দ্রব্যের ধারণা প্রাক্-অভিজ্ঞতাসিদ্ধ। তবে এই ধারণা শুধু মনের আকার নয়, বস্তুস্বরূপেরও আকার।

১। Intuitionists

২। Self-consciousness

৩। A-priori category

কারণ (Cause)

জাগতিক সমস্ত বস্তু ও ঘটনা পারস্পরিক বিভিন্ন সম্পর্কে আবদ্ধ। কতগুলো ক্ষেত্রে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর বা ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সম্পর্ক সাধারণ সংযোগ সম্পর্ক মাত্র। আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানে যত কাক দেখেছি, সবই কালো। কিন্তু ভবিষ্যতে কোনদিন একটা সাদা কাক দেখব না এমন কথা বলা যায় না। কাকের সঙ্গে কালো রঙের সম্পর্ক সাধারণ সংযোগ সম্পর্ক মাত্র। আকাশে ধূমকেতু উঠলো—রাজা মারা গেলেন। আকাশের ধূমকেতুর সঙ্গে রাজার মৃত্যুর সম্পর্ক একান্তভাবেই আকস্মিক। আকাশে ধূমকেতু দেখা দেওয়া সত্ত্বেও রাজা মারা না গেলে আমরা আশ্চর্য হ'তাম না। কিন্তু আগুনের সামনে ঘি রাখলে যদি তা না গলে তবে সত্যিই আশ্চর্য হই। বৃষ্টি হ'ল অথচ মাটি ভিজল না—এমন ভোজবাজি কখনই সত্য হ'তে পারে না। আমাদের অভিজ্ঞতায় যতবার বৃষ্টি হ'তে দেখেছি, ততবারই ত' মাটি ভিজেছে। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে বৃষ্টি হ'লেও মাটি ভিজবে। আগুন পোড়ায়, জল তেষ্টা মেটায়—এই জাতীয় ব্যতিক্রমহীন পারস্পরিক সম্পর্কও প্রত্যক্ষজ্ঞানে পাওয়া যায়। এই রকম ব্যতিক্রমহীন অপরিবর্তনীয় সম্পর্কগুলোকে সাধারণ সম্পর্ক বলা যায় না। এই সম্পর্কের নাম কার্যকারণ সম্পর্ক।

এখানে প্রশ্ন উঠবে—কার্যই বা কি আর কারণই বা কি? উত্তরে বলা যায়—যার জন্য কিছু ঘটে তার নাম কারণ আর যা ঘটে তাই কার্য। "আগুন পোড়ায়"—এই জ্ঞানে আগুন কারণ আর পোড়ানো তার কার্য।

এতক্ষণ যা হ'ল তা কার্য ও কারণের স্বরূপ ও তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রাথমিক কথা মাত্র। বিভিন্ন দার্শনিকেরা কার্য-কারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য আলোচনা করলে বোঝা যাবে যে, কার্য-কারণ সম্পর্ক যত সহজ বলে মনে হচ্ছে আসলে তা তত সহজ নয়। আমরা এই কার্য-কারণ সম্পর্কের স্বরূপ বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

সাধারণ জ্ঞানের দৃষ্টিতে 'কারণ'

সাধারণ লোক কারণ বলতে শক্তি[১] বোঝে। যা সক্রিয়ভাবে কার্য উৎপন্ন করে তারই নাম কারণ। কারণ যেন একটা শক্তির ব্যবহার করে, আর তার ফলেই কার্যের উৎপত্তি হয়। দার্শনিক জন লকও এই অর্থেই

১। Power

'কারণ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। সাধারণ লোকের মত তিনিও মনে করেন, কারণ কার্যোৎপাদনের শক্তিবিশেষ। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আমরা যখন কোন কাজ করি তখন আমাদের শক্তির ব্যবহার করতে হয়। নিষ্ক্রিয়ভাবে চুপচাপ বসে থাকলে কোন কাজই হয় না। অনুরূপভাবে সাধারণ লোক মনে করে, বাইরের জগতেও কার্য উৎপন্ন করতে শক্তির দরকার হয়। সুতরাং শক্তিই কারণ। কার্য-কারণের মধ্যে একটা নিশ্চযাত্মক ও সার্বত্রিক[১] সম্পর্ক রয়েছে। একটি বিশেষ কারণই চিরকাল একটি বিশেষ কার্যকে উৎপন্ন করতে পারে। ঘি আগুনের কাছে রাখলে তা গলবেই—জমবে না।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, কোন দ্রব্যের অন্তর্নিহিত শক্তি[২] কি করে অন্য এক দ্রব্যের অন্তর্নিহিত শক্তির রূপ গ্রহণ করে, তাই কার্যকারণ সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়। কারণ ও কার্যের অন্তর্নিহিত শক্তি সমপরিমাণবিশিষ্ট ও তাদের অন্তর্নিহিত বস্তুর[৩] পরিমাণও সমান।

সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে কাযের অব্যবহিত পূর্বে উৎপন্ন শক্তিকে 'কারণ' বলা হয়। এই শক্তির জন্য অন্য যে সমস্ত উপকরণের অপেক্ষা আছে তা সাধারণ লোকে কারণের আওতায় ফেলে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা দ্রব্যের অন্তর্নিহিত শক্তি ও এই শক্তি যে সমস্ত উপকরণের অপেক্ষা করে তাদের সমস্তই 'কারণ' শব্দে বোঝান।

আরিস্টটলের মতে 'কারণ'

প্রাচীন গ্রীস দেশের দার্শনিক আরিস্টটল 'কারণ'-এর স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে কোন একটা কার্যের উৎপত্তি আমরা চার রকম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারি। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি কার্যকে দেখার ফলে তার কারণকেও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। আরিস্টটল মনে করেন, একটি কার্যের চতুর্বিধ কারণ থাকতে পারে। আরিস্টটল এই চতুর্বিধ কারণের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য মার্বেল পাথর থেকে মার্বেলের প্রতিমূর্তি নির্মাণরূপ কার্যটি গ্রহণ করেছেন। আরিস্টটল মনে করেন, প্রত্যেক কার্যেরই উপাদান কারণ, নিমিত্ত কারণ,

১। Universal and necessary

২। Energy

৩। Mass

আকার কারণ ও উদ্দেশ্য কারণ[১]—এই চতুর্বিধ কারণ আছে। উদ্ধৃত উদাহরণে যে মার্বেল পাথর দিয়ে মূর্তি নির্মিত হ'য়েছে তার নাম উপাদান কারণ শিল্পী মূর্তি নির্মাণের জন্য যে শক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছেন তা মূর্তি নির্মাণরূপ কার্যের নিমিত্ত কারণ। শিল্পী মূর্তির যে আকার মনে মনে ঠিক করে সেই আকার অনুসারে মূর্তি গড়েছেন, তার নাম আকার কারণ। আর সর্বশেষে মূর্তি যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্মিত হ'য়েছে তার নাম উদ্দেশ্য কারণ। পরবর্তী কালে আরিস্টটল নিমিত্ত কারণকে উপাদান কারণের ও উদ্দেশ্য কারণকে আকার কারণের অন্তর্ভূক্ত করে উপাদান কারণ ও আকার কারণ—এই দুই জাতের কারণেরই মৌলিকতা স্বীকার করেছেন। একটি কার্যের কারণ কত রকম দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় তার চরম নিদর্শন দার্শনিক আরিস্টটলের এই মতবাদ থেকে বোঝা যায়। দার্শনিক বিচারে আরিস্টটলের এই মত সহজে উপেক্ষা করা যায় না।

প্রত্যক্ষবাদীদের অভিমত

প্রত্যক্ষবাদীদের মতে সংবেদন ও অন্তর্দর্শন জ্ঞানলাভের দুই পথ। সংবেদন ও অন্তর্দর্শনে যা না পাওয়া যায় তা আছে বলে বলা যায় না আরিস্টটলের আকার কারণ বা উদ্দেশ্য কারণ সংবেদন বা অন্তর্দর্শনে পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রত্যক্ষবাদীদের ধারণা, আকার কারণ বা উদ্দেশ্য কারণ বলে কিছু নেই।

প্রত্যক্ষবাদীরা মনে করেন, কোন ঘটনার নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনাকেই কারণ বলা যায়। কারণ সব সময়েই কার্যের আগে থাকে। নিয়ত পূর্ববর্তিতা ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক কার্যকারণের মধ্যে নেই।

সাধারণতঃ লোকে মনে করে, কার্য ও কারণের মধ্যে একটা নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক[২] আছে। কারণ কার্যকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। প্রত্যক্ষবাদীরা বলেন, কার্য ও কারণের মধ্যে কোন নিশ্চয়াত্মক সম্পর্কের প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং কার্য ও কারণের মধ্যে কোন নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক নেই। দুধ খেলে স্বাস্থ্য ভাল হয়। দুধ খাওয়া ও স্বাস্থ্য ভাল হওয়ার মধ্যে একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে, একথা বলার অর্থ এই যে, অতীতে আমরা দুধ খাওয়ার পর

১। উপাদান কারণ—Material Cause, নিমিত্ত কারণ—Efficient Cause, আকার কারণ—Formal Cause, উদ্দেশ্য কারণ—Teleological or Final Cause,

২। Necessary Connection

স্বাস্থ্য ভাল হ তে দেখেছি, ভবিষ্যতেও আশা করি দুধ খেলে স্বাস্থ্য ভাল হবে। কিন্তু দুধ খেলে স্বাস্থ্য ভাল হবেই এমন কথা নিশ্চিত ক'রে বলার মত কোন সঙ্গত কাবণ প্রত্যক্ষ করে কখনই পাওযা যায না।

দর্শনের ইতিহাসে প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক হিউমের কারণতত্ত্ব এক বিশিষ্ট স্থান অধিকাব ক'বে আছে। প্রত্যক্ষবাদীদের মতে কার্যকারণ সম্পর্কের স্বরূপ কি, তার পবিপূর্ণ প্রকাশ হিউমেব কাবণতত্ত্বে পাওযা যায। আমরা এখন হিউমের কাবণতত্ত্ব আলোচনা কবব।

হিউমের কারণতত্ত্ব

হিউমেব মতে সংবেদন ও ধাবণা[১] ছাডা কোন কিছুই সত্য হ'তে পাবে না। ধারণা সংবেদন বা মুদ্রণেবই অস্পষ্ট রূপ মাত্র। সুতরাং সংবেদন বা মুদ্রণই একমাত্র সত্য। যাব সংবেদন হয না তার সত্যতাও স্বীকার কবা যায না। অভিজ্ঞতায সংবেদনগুলো বিচ্ছিন্ন হযেই আসে। এই বিচ্ছিন্ন সংবেদনগুলোকে সমাবেশেব নিযমে[২] নিযমিত ক'রেই আমবা বস্তুব জ্ঞান লাভ করি। কার্য-কারণ সম্পর্ক সমাবেশেব একটি নিযম। আমাদেব জীবনে ও সমস্ত বৈজ্ঞানিক আলোচনায কার্য-কারণ সম্পর্কের বিশেষ ব্যবহাবিক প্রযোজন আছে। কিন্তু এই কার্য-কাবণ সম্পর্কের কোন তাত্ত্বিক তাৎপর্য নেই।

কার্যকারণ সম্পর্কেব স্বরূপ কি ?—এই প্রশ্নেব আলোচনা প্রসঙ্গে হিউম যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, দর্শনের ইতিহাসে তা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আমরা এখন হিউমের এই অভিমতই আলোচনা করব।

হিউম বলেছেন, কাযকারণ সম্পর্কের তিনটি বিভিন্ন দিক আছে। একদিক থেকে মনে হয, কাবণ ও কার্যের মধ্যে একটা পৌর্বাপর্য[৩] আছে। কার্য কারণের পরেই ঘটে। অন্যদিক থেকে কার্য ও কারণ পাশাপাশি[৪] থাকে। যখনই কার্য দেখি তখনই কারণও দেখি। আবার অন্যদিকে মনে হয, কার্য ও কারণের মধ্যে যেন একটা নিশ্চযাত্মক সম্পর্ক[৫] আছে। একই কারণ চিরকাল একই কার্য নিশ্চিতভাবেই উৎপন্ন করবে এমন ধারণা আমরা সর্বদাই পোষণ করি।

১। Impression and Idea
২। Laws of Association
৩। Succession
৪। Contiguous
৫। Necessary Connection

হিউম প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক। তাঁর মতে যা প্রত্যক্ষ করা যায় না তা সত্য নয়। কার্য ও কারণের মধ্যে যে পৌর্বাপর্য সম্পর্ক আছে, কার্য ও কারণ যে পাশাপাশি থাকে—এ সব ত' আমরা হামেসাই দেখি। সুতরাং কার্য ও কারণের পৌর্বাপর্য ও তাদের পাশাপাশি থাকা হিউম অস্বীকার করেন না। কিন্তু কার্য ও কারণের মধ্যে কোন নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক আমরা প্রত্যক্ষ করি না। সুতরাং হিউম কার্য ও কারণের মধ্যে কোন নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক স্বীকার করতে প্রস্তুত নন।

হিউম বলেন, কার্য ও কারণের মধ্যে যদি কোন নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক থাকত তবে কারণের ধারণাকে বিশ্লেষণ করলেই কার্যের ধারণা পাওয়া যেত। কিন্তু বস্তুতঃ তা পাওয়া যায় না। সুতরাং কার্য ও কারণের মধ্যে একটা নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক আছে একথা স্বীকার করা যায় না। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা আরও পরিষ্কার করা যায়। আমরা মনে করি, পাউরুটি মাখন খেলে শরীর পুষ্ট হয়। কিন্তু যে লোক 'পাউরুটি মাখন খেলে শরীর পুষ্ট হয়' একথা জানে না, সে লোক 'পাউরুটি মাখন খাওয়া' ধারণাটি যতই বিশ্লেষণ করুক না কেন, 'পুষ্ট হয়' এমন ধারণা পাবে না। সুতরাং 'পাউরুটি মাখন খাওয়া'র সঙ্গে 'পুষ্ট হওয়া'র কোন নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক স্বীকার করা যায় না।

'পাউরুটি মাখন খেলে শরীর পুষ্ট হয়'—এই জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকেই লাভ করা যায়। 'পাউরুটি মাখন খাওয়া' ও শরীর পুষ্ট হওয়া'র মধ্যে একটা পৌর্বাপর্য সম্পর্ক আছে। পাউরুটি মাখন খাওয়ার পরই শরীর পুষ্ট হয়। 'পাউরুটি মাখন খাওয়া' ও 'শরীর পুষ্ট হওয়া'—এই দু'টি ঘটনা পাশাপাশি ঘটে তাও আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু এদের মধ্যে একটা নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক প্রত্যক্ষ কর যায় না। তবে লোকে যে বলে এদের মধ্যে একটা নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক আছে, তার মানে কি? এই প্রশ্নের উত্তরে হিউম বলেন, অভিজ্ঞতায় যখন আমরা বারবার পাউরুটি মাখন খেলে শরীর পুষ্ট হতে দেখি, তখন এই ঘটনা-পারম্পর্য সম্পর্কে আমাদের একটা অভ্যাসজাত জ্ঞান হয়। আমরা মনে করি, পুনরায় যদি কেউ পাউরুটি মাখন খায় তবে সেও পুষ্ট হবে। অভ্যাসজাত এই মানসিক আশাই[১] কার্য কারণের নিশ্চয়াত্মক সম্পর্কের আসল রূপ। আমরা যে বলি 'পাউরুটি মাখন খেলে শরীর পুষ্ট হবে'—এটা আমাদের অভ্যাসজাত একটা মানসিক আশামাত্র। আমাদের আশা সাধারণতঃ সফল হয়। কিন্তু

১। Expectation due to habit.

এই আশা যে সর্বদাই সফল হবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং কার্যকারণ সম্পর্কের কোন বস্তুগত নিশ্চয়তা[১] থাকতে পারে না। নিশ্চয়তার ধারণা আমাদেব অভ্যাসজাত আশা মাত্র।

ওপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, হিউমের মতে কার্যকারণ সম্পর্কের জ্ঞান একমাত্র অভিজ্ঞতা থেকেই লাভ করা যায়। কার্য ও কারণের মধ্যে পৌর্বাপর্য সম্পর্ক আছে, কিন্তু কোন বস্তুগত নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক নেই। একটি বিশেষ কার্য যে একটা বিশেষ কারণ থেকে হবে—এই ধারণা আমাদের একটা আশা মাত্র।

সমালোচনা : প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক মিল কার্যকারণ সম্পর্কের নিশ্চয়তা স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে কারণ কার্যের অন্যনিরপেক্ষ[২] পূর্ববর্তী ঘটনা। কারণ যদি কার্যের অন্যনিরপেক্ষ পূর্ববর্তী ঘটনা হয় তবে কারণ দেখা দিলেই কার্য নিশ্চিত ভাবেই উৎপন্ন হবে। সুতরাং কার্য ও কারণের সম্পর্ক যে নিশ্চয়াত্মক—একথা স্বীকার করতেই হবে। প্রত্যক্ষবাদীরা সাধারণতঃ কার্য ও কারণেব নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক স্বীকার করেন না, কারণ প্রত্যক্ষ করে কোন নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক জানা যায় না, আর প্রত্যক্ষবাদীদের মতে প্রত্যক্ষই জ্ঞান লাভের একমাত্র পথ হওয়ায় যা প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না তা মানাও উচিত নয়। কিন্তু কার্য ও কারণের মধ্যে নিশ্চযাত্মক সম্পর্ক অস্বীকাব করা যায় না তা মিলের মত প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকের নিশ্চয়াত্মক সম্পর্কের স্বীকৃতি থেকেই বোঝা যায়। কার্য ও কারণের মধ্যে নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক আছে, অথচ যখন প্রত্যক্ষ করে তা জানা যায় না, তখন প্রত্যক্ষই জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ একথাও স্বীকার করা যায় না। সোজা কথায় প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকেরা প্রত্যক্ষ দিয়ে কার্য-কারণ-সম্পর্কের স্বরূপ নির্ধারণের জন্য প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য কোন উপায় অবলম্বন করতে হবে।

কাণ্ট মনে করেন, কার্যকারণতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে পাওয়া যায় না। সমস্ত রকম প্রত্যক্ষের আগেই মনে যদি কার্য-কারণের ধারণা না থাকত-তবে মানুষ একটা জিনিস দেখলেই তার কারণ খুঁজত না। যেহেতু আমাদের মনে কার্য-কারণের ধারণা আছে, সেজন্যই একটা বিশেষ ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ঘটনা দেখে আমরা তার কারণ খুঁজি। কোন এক বিশেষ কার্যের কারণ

১। Objective necessity.
২। Unconditional.

প্রত্যক্ষ করেই পাওয়া যায়। কিন্তু সার্বিক কার্যকারণ তত্ত্বের ধারণা[১] সমস্ত প্রত্যক্ষের আগেই আমাদের মনে থাকে। সার্বিক কার্যকারণ তত্ত্বের ধারণা মনে না থাকলে কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে কার্যের কারণ আবিষ্কারের প্রবৃত্তি আমাদের কখনই হত না। সুতরাং কাণ্টের মতে কার্যকারণ তত্ত্ব অভিজ্ঞতার প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞানের আকার।[২] এই আকার মনে না থাকলে বিশেষ কার্যকারণের জ্ঞানই হতে পারে না।

কাণ্ট আরও বলেন যে, পৌর্বাপর্যের প্রত্যক্ষ কখনও কখনও আমাদের নিয়ম অনুসরণ করে। কখনও কখনও আমাদের খুশীমত অনুভব বা সংবেদনের পৌর্বাপর্য আমরা ভাবতে পারি না, বস্তুই অনুভব বা সংবেদনের পৌর্বাপর্য নিয়ন্ত্রিত করে। সেই ক্ষেত্রে পৌর্বাপর্যের বস্তুগত নিশ্চয়তা স্বীকার করতেই হয়। যেখানে সংবেদনের পৌর্বাপর্য এরকম নিশ্চয়াত্মক সেখানেই কার্য-কারণ সম্পর্কের উদ্ভব হয়। সুতরাং কার্য-কারণ সম্পর্কের বিষয়গত নিশ্চয়তা অস্বীকার করা যায় না।

কাণ্ট উদাহরণ দিয়ে তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। আমরা যখন কোন একটা বাড়ী দেখি তখন ভিৎ থেকে সুরু করে ছাতে অথবা ছাত থেকে সুরু করে ভিতে দৃষ্টিক্ষেপ করতে পারি। কিন্তু চলন্ত জাহাজের গতিপথ লক্ষ্য করার সময় এরকম করা যায় না। তখন এক বিশেষ পারম্পর্যই অবলম্বন করতে হয়। জাহাজ যেদিক থেকে যেদিকে যাচ্ছে আমরা সেদিক থেকে সেদিকেই দৃষ্টিক্ষেপ করতে পারি। যেদিকে যাচ্ছে সেদিক থেকে যেখান থেকে যাচ্ছে সেদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলে জাহাজের গতিপথের যথাযথ ধারণা হয় না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা যা পরপর দেখি তার পারম্পর্য আমাদের ওপর নির্ভর করে না, বস্তুর ওপরই করে। কাণ্ট এই জাতীয় পারম্পর্যের নাম দিয়েছেন—'বস্তুগত পারম্পর্য'।[৩] এই ক্ষেত্রে জাহাজের পরবর্তী অবস্থান পূর্ববর্তী অবস্থানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী অবস্থান না থাকলে পরবর্তী অবস্থান হতে পারে না। যেখানে এরকম পূর্ববর্তী ঘটনা পরবর্তী ঘটনা নিয়ন্ত্রিত করে সেখানেই কার্যকারণ সম্পর্কের উদ্ভব হয়। সুতরাং কার্যকারণ সম্পর্কের বস্তুগত নিশ্চয়তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

১। Idea of the universal law of causation
২। A-priori category of Knowledge
৩। Objective Succession

কাণ্টের মতে কার্যকারণ সম্পর্কের বিষয়গত নিশ্চয়তা

আমরা এইমাত্র দেখলাম যে, কাণ্ট কার্যকারণ সম্পর্কের বস্তুগত নিশ্চযতা স্বীকার করেছেন। কাণ্টের দর্শনে বস্তু বা বিষয় বলতে জ্ঞানের বিষয় বোঝায়। কাণ্ট মনে করেন, জ্ঞানই জ্ঞানের বিষয় গঠন করে। সুতরাং কাণ্ট বস্তুগত বা বিষয়গত নিশ্চযতা বলতে জ্ঞানগত নিশ্চযতা বোঝেন। কাণ্ট যখন বলেন, কার্যকারণ সম্পর্কের বিষয়গত নিশ্চযতা আছে, তখন তিনি জ্ঞানগত নিশ্চযতাই বোঝাতে চান। কার্যকারণের আকার মনে না থাকলে কোন বিষয়েরই জ্ঞান হয় না। বিষয়ের জ্ঞানের জন্য কার্যকারণের আকার অপরিহার্য। একমাত্র এই অর্থেই কাণ্টের মতে কার্যকারণ সম্পর্কের বিষয়গত নিশ্চযতা আছে। কাণ্ট মনে করেন, কার্যকারণতত্ত্ব প্রাক-অভিজ্ঞতা-সিদ্ধ জ্ঞানের আকার। কার্যকারণ তত্ত্ব না হলে কোন অভিজ্ঞতাই হয় না। কিন্তু কার্যকারণ তত্ত্ব কোন অভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভরশীল নয়। যেহেতু জ্ঞানের আকার শুধু জ্ঞানের বিষয়েই প্রযোজ্য, সুতরাং কার্যকারণ তত্ত্ব বস্তু-স্বরূপ[১] সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়।

হেগেলের মত

হেগেল মনে করেন, মানুষের মন ও জগৎ একই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ। সুতরাং মনের বা জ্ঞানের আকার জগতেরও আকার। তাই জ্ঞানের আকার কার্যকারণ তত্ত্ব জগতেরও আকার বলে মানতে হবে। অর্থাৎ কার্যকারণ তত্ত্বের নিশ্চযতা জাগতিক বস্তুনিচয়ের সম্পর্কের নিশ্চযতাও সূচনা করে। সুতরাং কার্যকারণ সম্পর্কের নিশ্চযতা শুধু জ্ঞানগত নিশ্চযতা নয়, বস্তুগত নিশ্চযতাও বটে। এই ভাবে হেগেল কার্যকারণ সম্পর্কের কাণ্টীয় জ্ঞানগত নিশ্চযতাকে বস্তুগত নিশ্চযতায় পরিণত করেছেন।

কয়েকজন আধুনিক দার্শনিকের মতে কার্যকারণ তত্ত্ব

কয়েকজন আধুনিক দার্শনিক কার্যকারণ তত্ত্ব নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। এঁদের অধিকাংশ আলোচনাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে। অধ্যাপক হোয়াইটহেড্, আলেকজেণ্ডার ও রাসেল—এই সব আধুনিক দার্শনিকদের অন্যতম। আমরা অতি সংক্ষেপে তাঁদের মতবাদ আলোচনা করব।

১। Thing-in-itself

অধ্যাপক হোয়াইট্‌হেড্‌ হিউমের মতবাদ খণ্ডন ক'রেই কার্যকারণ সম্বন্ধে নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি মনে করেন, আমরা যদি হিউমের মত পরস্পরবিচ্ছিন্ন সংবেদনগুলোকেই আসল সত্য বলে মনে করি তবে কার্য-কারণ সম্পর্কের স্বরূপ বুঝব না। জগৎ যদি পরস্পরবিচ্ছিন্ন কতগুলো সংবেদনেরই রাজত্ব হয় তবে এদের কোন সত্য সম্পর্কই স্বীকার করা যায় না। হোয়াইট্‌হেডের মতে ঘটনা-প্রবাহই[১] চরমতত্ত্ব। এই প্রবাহে প্রত্যেক জিনিসই প্রত্যেক জিনিসের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমরা যে জগৎকে কতগুলো পরস্পরবিচ্ছিন্ন বস্তুর সমষ্টি বলে মনে করি তা আমাদের ভ্রান্তিরই ফল। তাঁর মতে—দুই পূর্বাপর অবিচ্ছিন্ন ঘটনার সম্পর্কই কার্যকারণ সম্পর্ক। পূর্বের ঘটনার নাম কারণ, আর পরের ঘটনার নাম কার্য। এই দুই ঘটনা একান্তভাবেই অবিচ্ছিন্ন। দুই ঘটনার মধ্যে যে কার্যকারণ সম্পর্ক তা বিষয়গত, আত্মগত নয়।

আলেকজেণ্ডার সম্পূর্ণ অন্যরকমভাবে কার্যকারণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে কারণতা বস্তুর আকার-বিশেষ। বস্তু দেশ-কাল বা গতির এক গ্রন্থিবিশেষ[২]। প্রত্যেক বস্তুই দুই দিক থেকে দেখা যায়—স্থিতির দিক আর গতির দিক। যখন বস্তুকে স্থিতির দিক থেকে দেখি তখন তার নাম 'দ্রব্য', আর যখন গতির দিক থেকে দেখি তখন তার নাম 'কারণ'।

রাসেল হিউমের মতই কার্য-কারণ-সম্পর্কের মধ্যে কোন নিশ্চয়তা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে কার্য-কারণ-সম্পর্ক একটা সাধারণ পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষ[৩]। একটা বিশেষ পরিমাণের সঙ্গে একটা বিশেষ পরিমাণের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে একথাই কার্য-কারণ-সম্পর্ক ঘোষণা করে। কারণ কার্যকে নিশ্চিত-ভাবে উৎপন্ন করে—এমন কোন কথা কার্য-কারণ-সম্পর্কের মধ্যে নেই।

সমালোচনা: অধ্যাপক হোয়াইট্‌হেড্‌ কার্য-কারণ-সম্পর্কের সত্যস্বরূপের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কার্য-কারণ-সম্পর্ক যে নিশ্চয়াত্মক ও এই নিশ্চয়াত্মক সম্পর্ক যে বিষয়গত, হোয়াইট্‌হেড্‌ একথা স্বীকার করেছেন। এই দিক থেকে হোয়াইট্‌হেডের বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করতেই হবে।

আলেকজেণ্ডার কার্য-কারণ-সম্পর্কের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি। রাসেল কার্য-কারণ সম্পর্কের মধ্যে কোন নিশ্চয়তাই স্বীকার

১। Process
২। Complex
৩। Ordinary Correlation

করেন না। আমরা হিউমের মতবাদ সমালোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি যে, কার্য-কারণ সম্পর্কের নিশ্চয়তা স্বীকার করতেই হয়। সুতরাং রাসেলের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

দ্রব্যত্ব ও কারণত্ব (Substantiality and Causality)

সাধারণতঃ লোকে মনে করে, কোন একটি দ্রব্য শক্তি প্রযোগ ক'রে অন্য একটি দ্রব্যকে উৎপন্ন করে। সুতরাং দ্রব্য ছাড়া কারণ থাকতে পাবে না। কথাটা অন্য ভাবেও ভাবা যেতে পারে। দ্রব্য বলতে অমেরা পরিবর্তনের মধ্যেও যা অপরিবর্তিত থাকে ও পরিবর্তনের মধ্যে যা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তাকেই বুঝি। সুতরাং পরিবর্তন-নিরপেক্ষভাবে দ্রব্য বোঝা যায় না। কারণ কার্য সূচনা করে। কার্য পরিবর্তন ছাড়া কখনই সিদ্ধ হয না। সুতরাং পরিবর্তনই কার্যের প্রাণ। এই দিক থেকে দ্রব্যত্ব ও কাবণত্বেব সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্ট।

দ্রব্য অপেক্ষাকৃত অপবিবর্তন সূচনা করে। কারণ পরিবর্তনেরই দ্যোতক। পবিবর্তন ও অপবিবর্তন একান্তভাবে পরস্পব সাপেক্ষ। আলো না থাকলে যেমন অন্ধকাব বোঝা যায না, আবার অন্ধকাব না থাকলে যেমন আলো বোঝা যায না, ঠিক তেমনি পবিবর্তন ছাডা অপরিবর্তনের কোন অর্থ নেই, আবার অপরিবর্তন ছাডা পবিবর্তনও বোধগম্য হয় না। সুতরাং কারণ ছাড়া দ্রব্য হয় না, আবাব দ্রব্য ছাডা কারণ হয না।

দার্শনিক কাণ্ট দ্রব্যকেই কাবণ বলেন। তাঁর মতে কারণ কার্য উৎপন্ন করে। কার্য উৎপন্ন করতে হলে সক্রিয় হতে হয়। নিষ্ক্রিয় থেকে কোন কার্যই করা যায না। দ্রব্যই সক্রিয হতে পারে। সুতরাং দ্রব্যই কারণ। অন্যভাবে বলা যায় যে কোন কার্যই পরিবর্তন সূচনা কবে। পরিবর্তনের আধার এমন জিনিসই হতে পারে যা নিজে পরিবর্তিত হয না। পরিবর্তনের কখনই পরিবর্তন সম্ভব নয। সুতরাং অপবিবর্তিত দ্রব্যই কার্যের কাবণ হতে পারে।

আধুনিক কালের দার্শনিক আলেকজেণ্ডারও দ্রব্য ও কারণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে জাগতিক সমস্ত বস্তুই দেশ-কাল বা শুদ্ধ গতির গ্রন্থিমাত্র। প্রত্যেক বস্তুই দু'টি বিভিন্ন দিক থেকে দেখা যেতে পারে—একটি গতির দিক, আর একটি স্থিতির দিক। গতির দিক থেকে দেখলে বস্তুর নাম কারণ, আর স্থিতির দিক থেকে দেখলে তার নাম দ্রব্য। সুতরাং যা-ই দ্রব্য, তা-ই কারণ। দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতার জন্যই একই বস্তুকে দ্রব্য ও কারণ বলে মনে হয়।

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, দ্রব্যত্ব ও কারণত্ব অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে জড়িত। একটি ছাড়া আর একটি কখনই হয় না।

যান্ত্রিক কার্য ও উদ্দেশ্যমূলক কার্য
(Mechanical Causation and Teleological Causation)

যান্ত্রিক কার্য ও উদ্দেশ্যমূলক কার্যের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। যান্ত্রিক কার্য বলতে আমরা এমন কার্য বুঝি যা নিয়তই পূর্ববর্তী কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যন্ত্রই যান্ত্রিক কার্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যন্ত্রের প্রত্যেকটি অংশের কাজ পূর্ববতা অন্য আর একটি অংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হাতল ঘোরালেই ইঞ্জিন চলতে থাকে, কিন্তু হাতল না ঘোরালে ইঞ্জিন চলে না। শুধু তাই নয়। প্রতি মুহূর্তে যন্ত্রের প্রত্যেক আবর্তন পূর্ববর্তী আর এক আবর্তনের পরই সংঘটিত হয়। যান্ত্রিক কার্যের মধ্যে একটা অন্ধ অবশ্যম্ভাবিতা আছে। যান্ত্রিক কার্যের বেলায় কারণ থাকলেই অতি অবশ্য কার্য সংঘটিত হয়। যন্ত্র একবার চালু করে দিলে বন্ধ না করা পর্যন্ত যন্ত্র চলবেই। যান্ত্রিক কার্যে কোন বুদ্ধি, বিচার বিশ্লেষণ বা উদ্দেশ্যের বালাই নেই। যান্ত্রিক কার্য যান্ত্রিক ভাবেই সংঘটিত হয়।

উদ্দেশ্যমূলক কার্য পূর্ববর্তী কোন ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। এই ক্ষেত্রে কার্যের উদ্দেশ্যই কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। ছাত্র যখন পরীক্ষা পাশের পড়া পড়ে তখন পরীক্ষা পাশের উদ্দেশ্যই তাকে কার্যে প্রণোদিত করে। উদ্দেশ্যমূলক কার্যে যান্ত্রিক কার্যের মত কোন অন্ধতা নেই। এই জাতীয় কার্যে বুদ্ধি, বিচার-বিশ্লেষণ বা আদর্শের স্থান আছে। দেশপ্রেমিক যখন দেশের উন্নতির জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দেয় তখন তার কাজ উদ্দেশ্যমূলক কাজই বটে। সে ভেবে চিন্তেই দেশ সেবার পথ বেছে নেয়। কোন্ পথে গেলে সহজে সিদ্ধি আসবে তাও সে নিজেই ঠিক করে। সুতরাং এই কাজে যান্ত্রিকতা বা অন্ধতার কোন স্থান নেই।

জড়বাদীরা[১] যান্ত্রিক কার্যে বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে দুনিয়ার সব কিছুই যান্ত্রিক ভাবে ঘটে যাচ্ছে। এখানে উদ্দেশ্য বা আদর্শের কোন স্থান নেই। জড় থেকে যান্ত্রিক ভাবে জীবনের[২] উৎপত্তি হয়েছে; আর জীবন যান্ত্রিক ভাবেই

১। Materialists
২। Life

মনের সৃষ্টি করেছে। আকাশে সূর্য ওঠে, আবার সূর্য ডোবে। ফুল ফোটে ফুল ঝরে। সন্ধ্যায় অন্ধকার নেমে আসে, আবার ভোরের আলো দেখা দিতেই পাখী ডেকে ওঠে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপের পর বর্ষার স্নিগ্ধতা দেখা দেয়। শীতের রিক্ততার পর বসন্তের পূর্ণতা আসে। জগতের এই যে সব বিচিত্র ঘটনা তা যান্ত্রিক ভাবেই ঘটে যাচ্ছে। দুনিয়া জুড়ে নির্বোধ জড়ের যান্ত্রিক খেলা চলেছে। এখানে চৈতন্যের কোন প্রতিষ্ঠা নেই।

ভাববাদীরা উদ্দেশ্যমূলক কার্যে বিশ্বাসী। তাঁরা মনে করেন, জগৎ জুড়ে এক ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার লীলা চলেছে। এই সুন্দরী ধরণী নির্বোধ জড়ের সৃষ্টি হ'তে পারে না। এক বিরাট শিল্পী এক বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তা যদি না হ'ত তবে যেখানে যা প্রয়োজন সেখানে তা এমন ভাবে থাকত না। এ জগৎ কোন খেয়ালী শিল্পীর সৃষ্টি নয়। এ জগতের শিল্পী এক নিখুঁত শিল্পী। এক অসীম অনন্ত চৈতন্য বিশ্বের ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে নিজের উদ্দেশ্য সফল ক'রে চলেছেন। তিনিই এই নিখুঁত শিল্পী। তিনি অসীম; কিন্তু সীমার মধ্যে তিনি ধরা দেন। তিনি অরূপ; কিন্তু রূপের মধ্যেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। তিনি পূর্ণ, কিন্তু অপূর্ণও তাঁর প্রসাদ বঞ্চিত নয়। এই অসীম অরূপ পূর্ণ চৈতন্যই জগতের কারণ। এই ভাববাদীদের মতে কারণতায় আর চরমতায় কোন তফাৎ নাই। যিনি কারণ, তিনিই চরম।[১]

১। Causality implies finality.

অষ্টম অধ্যায়

সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষা

(Nature of Truth and Test of Truth)

জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সাধারণতঃ বচনের মারফৎই প্রকাশিত হ'য়ে থাকে। সত্য ও মিথ্যা বচনেরই[১] গুণ। অর্থাৎ একটি বচনই সত্য বা মিথ্যা হ'তে পারে। যদি এমন কোন জ্ঞান থাকে যা বচনের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না তবে সেই জ্ঞান সম্বন্ধে সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলা যায় না। শুদ্ধ সংবেদন বা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোন গুণের প্রথম পরিচিতি কোন বচন নয়। নবজাত শিশুর হয়ত এরকম ধরণের কোন শুদ্ধ সংবেদন হ'তে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা এই জাতীয় সংবেদনকে জ্ঞান বলি না। এই জাতীয় সংবেদনের সত্যাসত্যও কিছু হ'তে পারে না। যদি আমরা বলি 'ফুলটি লাল' তবেই আমাদের কথার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। কারণ ফুলটি লাল হ'তেও পারে, আবার নাও হ'তে পারে। কিন্তু শুধু 'লাল' বল্‌লে ও কি 'লাল' বা কোথায় 'লাল' না বল্‌লে কথার সত্যাসত্যের কোন প্রশ্ন ওঠে না। ঠিক তেমনি, এমন যদি কোন অতীন্দ্রিয় জ্ঞান থাকে যেখানে উদ্দেশ্য বিধেয়ের দ্বৈতত্ব অর্থাৎ বচন নেই সেখানেও সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলা যায় না। অবশ্য অতীন্দ্রিয় জ্ঞান যে তর্কবিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞান নয়, একথা সবাই স্বীকার করবেন। আমরা দর্শনে তর্কবিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞান নিয়েই অলোচনা করি। সুতরাং অতীন্দ্রিয় জ্ঞান আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। আমরা তর্কবিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞানেরই সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করি। তর্কবিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞান কখনই বচন ছাড়া হয় না। সুতরাং জ্ঞানের সত্যাসত্য নির্ণয় বলতে আমরা বচনের সত্যাসত্য নির্ণয় বুঝি।

বচনে সাধারণতঃ কোন কিছু সম্বন্ধে কিছু বলা হয়। বচন সর্বদাই সত্যতা দাবী[২] করে। তবে তা মিথ্যাও হ'তে পারে। বচনে হয় আমরা বলি এটা এমন, নয়ত বলি এটা এমন নয়। যখন বলি এটা এমন তখন ভাবাত্মক[৩] বচন পাই। আর যখন বলি এটা এমন নয় তখন নিষেধাত্মক বচন[৪] পাওয়া যায়। যিনি বচন ব্যবহার করেন, তিনি মনে করেন বচন নিশ্চয়ই সত্য। বক্তা সত্য মনে না করলে কোন বচন ব্যবহার করতে পারেন না। সুতরাং প্রত্যেক বচনই সত্যতা দাবী করে। তবে হয়ত বস্তুতঃ তা সত্য নাও হ'তে

১। বচন—Judgment

২। Truth Claim

৩। Affirmative Judgment

৪। Negative Judgment

পারে। এখন প্রশ্ন হ'ল—বচনের সত্যতা বলতে আমরা কি বুঝি? যখন কেউ বলেন—'সব মানুষই মরণশীল', তখন আমরা বলি বচনটা সত্য; কিন্তু কেউ যদি বলে 'সব মানুষই সৎ', তবে বলি বচনটা মিথ্যা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—প্রথম বচনটা কেন সত্য হ'ল, আর দ্বিতীয়টাই বা মিথ্যা হ'ল কেন? অর্থাৎ প্রথম বচনটির সত্যতা বলতে ও দ্বিতীয়টির মিথ্যাত্ব বলতে আমরা কি বুঝি, তা-ই নির্ণয় করতে হ'বে। এই প্রশ্নের উত্তর পেলে সত্যের প্রকৃতি জানা যাবে।

সত্যের পরীক্ষা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এখানে প্রশ্ন হ'ল: 'সব মানুষই মরণশীল'—এই বচন যে সত্য তা জানা যায় কি করে? কি করেই বা বোঝা যায় যে, 'সব মানুষই সৎ'—এই বচনটি মিথ্যা? অর্থাৎ সত্য বা মিথ্যা কি ক'রে জানা যায় তা-ই এখানে নির্ণয় করতে হবে। সত্যতা ও সত্যতার জ্ঞান এক কথা নয়। সত্যের প্রকৃতি নির্ণয় করতে আমরা সত্যতার স্বরূপ আলোচনা করি। কিন্তু সত্যতার জ্ঞান লাভ করতে হলে সত্যতার পরীক্ষা জানা আবশ্যক। সুতরাং সত্যের প্রকৃতি ও সত্যের পরীক্ষা এক জিনিস হতে পারে না।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল সত্যের প্রকৃতি ও সত্যের পরীক্ষার পার্থক্য খুব পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, বচনের সত্যতা জানা একটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র, বচনের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব না জানা গেলেও বচন সত্য বা মিথ্যা হ'তে পারে। অর্থাৎ বচন আপনিতেই সত্য বা মিথ্যা হবে। কেউ জানলেও হবে, না জানলেও হবে। সুতরাং সত্যের প্রকৃতি সত্যের পরীক্ষার ওপর নির্ভর করে না।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সত্যতা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সত্যের প্রকৃতি ও সত্যের পরীক্ষা দুইই জানা দরকার। আমরা এই অধ্যায়ে এই দু'টি প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা করব।

সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষার রূপ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাঁরা সকলেই একই মতবাদে বিশ্বাস করেন না। দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা মোটামুটি চারটি বিভিন্ন মতবাদ দেখতে পাই। এদের নাম স্বতঃপ্রতীতিবাদ, সঙ্গতিবাদ, প্রয়োগবাদ ও অনুরূপতাবাদ।[১] আমরা এখানে এই সমস্ত বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে আলোচনা করব।

১। স্বতঃপ্রতীতিবাদ—Self-evidence theory; সঙ্গতিবাদ—Coherence theory. প্রয়োগবাদ—Pragmatic theory; অনুরূপতাবাদ—Correspondence theory.

স্বতঃপ্রতীতিবাদ (Self-evidence Theory)

স্বতঃপ্রতীতিবাদ মতে বচনের সত্যতা স্বতঃই প্রতীত হয়। যে বচন সন্দেহই করা যায় না তাই সত্য। "৩+৪=৭"—এই বচন কেউ কখনও সন্দেহ করতে পারে না। সুতরাং এই বচনের সত্যতা স্বতঃই জানা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল—সব বচনের সত্যতাই কি এভাবে জানা যায়? এর উত্তরে স্বতঃপ্রতীতিবাদীরা বলেন, সন্দেহাতীত বচন থেকে নিশ্চয়াত্মকভাবে[১] যে সমস্ত বচন এসেছে তাদের সত্যতা সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সুতরাং যে সমস্ত বচন সন্দেহ করা যায় ব'লে মনে হয় তাদের যদি সন্দেহাতীত বচনের সঙ্গে নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ থাকে তবে এই সমস্ত বচনও সন্দেহাতীত হবে। এমনি ক'রেই যে সমস্ত বচনের সত্যতা স্বতঃই ধরা পড়ে না তাদের সত্যতা স্বতঃপ্রতীত-সত্যতা-সম্পন্ন বচনের মাবফৎ জানা যায়।

ডেকার্টের মতে যে সমস্ত বচন স্পষ্ট ও পরিস্ফুট[২] তাই সত্য। স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতা সত্যতার লক্ষণ। স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতার অভাব মিথ্যাত্ব সূচনা করে। স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতা দেখেই আমরা বচনের সত্যতা নির্ণয় করি। সুতরাং ডেকার্টের মতে স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতা সত্যেব রূপ, আবার তাই সত্যতা পরীক্ষার উপায়। আত্মজ্ঞানেই[৩] এই স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতা সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। ডেকার্টে বলেন, সব কিছুই সংশয় করা যায়, কিন্তু সংশয়কর্তা আত্মাকে কখনই সংশয় করা যায় না। আত্মাই সংশয় করে। সুতরাং আত্মাকে সংশয় করা সম্ভবই নয়। আত্মাকে সংশয় করতে গেলে সংশয়ের কর্তা হিসেবে আত্মাকে স্বীকার করতে হয়। সুতরাং ডেকার্টে বলেন, আত্ম-জ্ঞানের সত্যতা স্বতঃই প্রতীত হয়। আত্মজ্ঞান থেকে নিশ্চয়াত্মকভাবে ঈশ্বরের জ্ঞানলাভ করা যায়। সুতরাং ঈশ্বর-জ্ঞানের সত্যতারও স্বতঃপ্রতীতি স্বীকার করতে হয়। ঈশ্বর-জ্ঞানের সত্যতা থেকে নিশ্চয়াত্মক ভাবে ঈশ্বর-সৃষ্ট জগতের জ্ঞানের সত্যতাও প্রকাশিত হয়। সুতরাং ডেকার্টের মতে আত্মজ্ঞানের নিশ্চয়তা থেকেই ঈশ্বর-জ্ঞানের নিশ্চয়তা আর ঈশ্বর-জ্ঞানের নিশ্চয়তা থেকেই ঈশ্বর-সৃষ্ট জগৎ-জ্ঞানের নিশ্চয়তা লাভ করা যায়।

স্পিনোজাও ডেকার্টের মতো স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতাকে সত্যের লক্ষণ ব'লে স্বীকার করেন। তিনিও মনে করেন যে, বচনের স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতা দেখেই

১। Necessarily

২। Clear and distinct

৩। Self-Knowledge or Self-Consciousness.

তার সত্যতা নির্ণয় করা যায়। তবে স্পিনোজা ডেকার্টের মতো আত্ম-জ্ঞানের সত্যতাকেই সবচেয়ে নিশ্চয়াত্মক ব'লে মনে করেন না। তাঁর মতে ঈশ্বর-জ্ঞানই সবচেয়ে নিশ্চয়াত্মক। ঈশ্বর-জ্ঞান থেকেই আত্ম-জ্ঞান ও জগৎ-জ্ঞানের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। জন লক্ আত্মজ্ঞানের নিশ্চয়তা ব্যাপারে স্বতঃপ্রতীতিবাদ স্বীকার করেন। ডেকার্টের মতোই তিনি মনে করেন, আত্মজ্ঞানের সত্যতা স্বতঃই প্রতীত হয়।

আত্মজ্ঞানের সত্যতা যে স্বতঃই প্রতীত হয়—একথা আমরাও অস্বীকার করি না। আমাদের আত্মা যে সত্য তা আমরা স্বতঃই জানতে পারি। আত্মাকে সংশয় করতে গেলে আত্মজ্ঞানের সত্যতা স্বীকার করতে হয়—এ বিষয়ে ডেকার্টের সঙ্গে আমাদের কোন মতান্তর নেই। কিন্তু আত্মজ্ঞান যেভাবে নিশ্চয়াত্মক, অন্য কোন জ্ঞানই সেভাবে নিশ্চয়াত্মক নয়। আত্মজ্ঞানের নিশ্চয়তা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু অন্য সমস্ত জ্ঞানের নিশ্চয়তাই সংশয় করা যায়। ডেকার্টে নিজেই ত' অন্য সমস্ত জ্ঞানের সত্যতা সংশয় ক'রে একথার সত্যতা প্রমাণ করেছেন। তিনি প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, এমন কি অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞানকে পর্যন্ত সংশয় করেছেন। সুতরাং এই সমস্ত জ্ঞানের সত্যতা স্বতঃপ্রতীত হয়, এমন কথা বলা যায় না। যদি এদের সত্যতা স্বতঃপ্রতীত হ'ত তবে এদের সম্বন্ধে কোন সংশয়ই সম্ভব হ'ত না।

কোন বচনেরই স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতা সকলের কাছে সমান নয়। একটা বচন যার কাছে স্পষ্ট ও পরিস্ফুট অন্যের কাছে তা স্পষ্ট ও পরিস্ফুট নাও হ'তে পারে। সূর্য যে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে তা একদিন স্পষ্ট ও পরিস্ফুট জ্ঞান ব'লেই স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু আজকাল এ-জ্ঞান কারও কাছেই সত্য নয়। সুতরাং তা স্পষ্ট ও পরিস্ফুটও নয়। কাজেই স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতা সর্বজনগৃহীত সত্যের লক্ষণ ব'লে বিবেচিত হতে পারে না।

আধুনিক কালে লস্কি বলেন, জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব অপরোক্ষ জ্ঞানেই জানা যায়। বস্তুর বিষয়গত প্রকাশই জ্ঞানের সত্যতা। জ্ঞানের মিথ্যাত্ব বলতে বস্তুর জ্ঞাতাকেন্দ্রিক প্রকাশই বোঝায়। 'শঙ্খ সাদা' এই জ্ঞানে শঙ্খের প্রকাশ বিষয় অনুযায়ীই হ'য়েছে। সুতরাং এই জ্ঞান সত্য। আবার যখন বলা হয় 'শঙ্খ হলদে' তখন শঙ্খের জ্ঞাতাকেন্দ্রিক প্রকাশই দেখতে পাওয়া যায়। শঙ্খ বস্তুতঃ হলদে নয়। ব্যক্তিবিশেষের কাছেই শঙ্খের এই রূপ প্রকাশ পায়। এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, লস্কির মতে জ্ঞান যখন বিষয়কে ঠিক

ঠিক প্রকাশ করে তখনই তা সত্য হয়; আর জ্ঞান যখন বিষয়কে ঠিক ঠিক প্রকাশ করে না তখন তা হয় মিথ্যা। সুতরাং লস্কির মতে বিষয়-অনুযায়িতাই সত্যতা। তবে তাঁর মতে সত্যতা অপরোক্ষ জ্ঞানেই জানা যায়। অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় অনুযায়িতা আমরা সোজাসুজিই জানতে পারি। সুতরাং জ্ঞানের পরীক্ষা হিসেবে লস্কি স্বতঃপ্রতীতিবাদ স্বীকার করেন।

লস্কি বিষয়-অনুযায়িতাকে সত্যতা বলেছেন। এবিষয়ে আমরাও লস্কির সঙ্গে একমত। আমরাও মনে করি, জ্ঞান যখন বিষয়ের সঙ্গে মেলে তখনই তাকে সত্য বলা যায়; জ্ঞান যদি বিষয়ের সঙ্গে না মেলে তবে তাকে মিথ্যাই বলতে হয়। জ্ঞান হয় বিষয়ের সঙ্গে মেলে, না হয় মেলে না। সুতরাং জ্ঞান স্বাভাবিক ভাবেই হয় সত্য, না হয় মিথ্যা। কিন্তু আমাদের মতে জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব স্বতঃই প্রতীত হয় না। লস্কি বলেন, জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব আমরা সোজাসুজিই জানি। এ বিষয়ে লস্কির সঙ্গে আমরা একমত নই। যদি জ্ঞানের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব স্বতঃই জানা যেত তবে ডুনিয়ায় সংশয় ব'লে কিছু থাকত না। যখন কোন বস্তু আমরা জানি তখন যদি সোজাসুজি সেই জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব জানতাম, তবে সেই বিশেষ জ্ঞান সত্য না মিথ্যা, এরকম কোন সংশয়ই আমাদের মনে উঠত না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্ঞান সত্য না মিথ্যা, এ নিয়ে আমাদের সংশয় থাকে। অন্ধকার রাত্রে রজ্জুতে সাপ দেখে ত' আমরা হামেসাই পালাই। যদি রজ্জুতে সর্প দেখেই বুঝতাম যে, জ্ঞান মিথ্যা, তবে নিশ্চয়ই মিথ্যা সাপের ভয়ে আমরা ছুটতাম না। সুতরাং বচনের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব স্বতঃই প্রতীত হয়, এমন কথা বলা যায় না।

আমরা আগেও বলেছি আবার এখনও বলি যে কেবল আত্মজ্ঞানের বেলাতেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। আত্মজ্ঞানের সত্যতা আমাদের কাছে স্বতঃই প্রতীত হয়। আত্মজ্ঞান এমনই নিশ্চয়াত্মক যে তার সত্যতা কখনই সংশয় করা যায় না। সুতরাং স্বতঃপ্রতীতিবাদ শুধু আত্মজ্ঞানের বেলাতেই খাটে, অন্যত্র এই মতবাদ সত্য নয়।

সঙ্গতিবাদ বা সম্বাদবাদ
(The Coherence Theory)

হেগেল ও হেগেলপন্থী ভাববাদী দর্শনে সঙ্গতিবাদ বা সম্বাদবাদ এক বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। হেগেল ও হেগেলপন্থীদের মতে সঙ্গতিই[১] সত্যের

১। Coherence

প্রকৃতি আর সঙ্গতি দিয়েই সত্যের পরীক্ষা হয়। বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক আলেকজেণ্ডারও সত্যের পরীক্ষার জন্য সঙ্গতিবাদেরই সমর্থন করেন। অবশ্য তাঁর মতে সত্যের প্রকৃতি সঙ্গতিবাদ নির্ণয় করতে পারে না। তিনি মনে করেন, অনুরূপতাই[১] সত্যের প্রকৃতি সূচনা করে। জ্ঞান যখন বিষয়ের সঙ্গে মেলে বা বিষয়ের অনুরূপ হয় তখনই জ্ঞানে 'সত্যতা' গুণ থাকে। জ্ঞানের এই 'সত্যতা' গুণ জানতে গেলে সঙ্গতির আশ্রয় নিতে হয়। রাসেল জ্ঞানের প্রকৃতি নির্ণয়ে অনুরূপতাবাদ[২] স্বীকার করেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্গতি যে সত্যের পরীক্ষা হিসেবে গৃহীত হ'তে পারে তা তিনি অস্বীকার করেন না। আমরা প্রথমে সংগতি সম্বন্ধে রাসেল ও আলেকজেণ্ডারের মত আলোচনা ক'রে হেগেল ও হেগেল-পন্থীদের মতবাদ আলোচনা করব।

রাসেল বলেন, অনিশ্চিত মতের ক্ষেত্রে[৩] সঙ্গতি সত্যের পরীক্ষা হিসেবে গৃহীত হতে পারে। কতগুলো অনিশ্চিত মত যখন পরস্পর সঙ্গতিসম্পন্ন হয় তখন প্রত্যেকটি মত আলাদা আলাদা এমনিতে যতটা অনিশ্চিত হয় তারা একত্রে ততটা অনিশ্চিত আর হয় না। এই ক্ষেত্রে সঙ্গতি অনিশ্চিত মতের খানিকটা নিশ্চয়তা সূচনা করে। এমনি করেই বিজ্ঞানে অনিশ্চিত মতের সঙ্গতি থেকে কতকটা নিশ্চয়তার উৎপত্তি হয়। দর্শনেও অনেক ক্ষেত্রে অনিশ্চিত মতের সঙ্গতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কতগুলো অনিশ্চিত মত সঙ্গতিসম্পন্ন হ'লে অতি সহজে তাদের উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাসেল বলেন, সঙ্গতি অনিশ্চয়তা হ্রাস করে বটে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা উৎপন্ন করতে পারে না। যে সমস্ত মতের মধ্যে সঙ্গতি হচ্ছে, তাদের কোন একটা যদি নিশ্চিত হয়, তবে সব মতই নিশ্চিত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

অধ্যাপক আলেকজেণ্ডার সত্যের পরীক্ষার জন্য সঙ্গতির ব্যবহারের পক্ষপাতী। তিনি মনে করেন, কোন একটা বচনের সত্যতা অন্য বচনের সঙ্গে তার সঙ্গতি থেকেই নির্ণয় করা যায়। অবশ্য বচনের 'সত্যতা গুণ' সঙ্গতির ওপর নির্ভর করে না। বচন যদি বস্তুস্বরূপের[৪] সঙ্গে মেলে তবেই বচন সত্য হয়। তবে বচনের এই সত্যতা জানার জন্য সঙ্গতিরই ব্যবহার করতে হয়।

১। Correspondence

২। Correspondence theory

৩। In the case of probable opinions. রাসেলের এই মতবাদ তাঁর 'The Problems of Philosophy' নামক গ্রন্থের ২১৭ থেকে ২১৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।

৪। Reality

আমাদের সামাজিক জীবনে যে সমস্ত বচন প্রচলিত আছে তাদের সঙ্গে যখন কোন বচন মেলে তখন আমরা সেই বচনকে সত্য ব'লে জানতে বা মানতে পারি। সবাই যদি 'আকাশ সবুজ নয়, নীল' বলে, তবেই আকাশ নীল হয় না; আকাশ বস্তুতঃ নীল ব'লেই তা নীল। কিন্তু সবাই যখন আকাশকে নীল বলবে তখনই 'আকাশ সবুজ নয়, নীল' এই বচনকে সত্য ব'লে জানা যাবে।

আমরা যখন এই অধ্যায়ের উপসংহার করব তখন দেখা যাবে যে, সত্যের পরীক্ষার জন্য অনেক উপায়ের মধ্যে সঙ্গতিকে অন্যতম বলে মানতে আমরা রাজী আছি। সুতরাং রাসেল ও আলেকজেণ্ডারের সঙ্গে এ বিষয়ে আমাদের কোন মতানৈক্য নেই। অন্যদিকেও তাঁদের মতো আমরা মনে করি যে, অনুরূপতাই সত্যের প্রকৃতি সূচনা করে। সুতরাং রাসেল ও আলেকজেণ্ডারের সঙ্গে আমাদের অনেক বিষয়েই মতৈক্য আছে। তবে আলেকজেণ্ডার মনে করেন, একমাত্র সঙ্গতি দিয়েই সত্য নির্ণয় করা যায়। আমরা মনে করি, সত্য নির্ণয়ের আরও কয়েকটি উপায় আছে। এইখানেই আলেকজেণ্ডারের সঙ্গে আমাদের মতভেদ।

এখন আমরা হেগেল ও হেগেল-পন্থীদের সঙ্গতিবাদ বা সম্বাদবাদ আলোচনা করব। এঁদের মতে সঙ্গতি শুধু সত্য পরীক্ষার উপায় নয়; সত্যের প্রকৃতিও সূচনা করে।

হেগেল ও হেগেল-পন্থীদের মতে কোন বচনই স্বতন্ত্রভাবে সত্য বা মিথ্যা কিছুই হ'তে পারে না কোন বচন যখন অন্যান্য বচনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে তখনই সেই বচনে 'সত্যতা' গুণ উৎপন্ন হয়। সোজা কথায় কোন বিশেষ বচন যখন অন্য বচনের স:ঙ্গ সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে সংবদ্ধ মণ্ডলী[১] গ'ড়ে তোলে তখনই তা সত্য হয়। সংবদ্ধ মণ্ডলী গড়তে না পারলে কোন বচনই সত্য হ'তে পারে না। সঙ্গতি, সংবদ্ধতা বা সম্বাদ আর সত্যতা একই কথা। যখন আমরা বলি 'দুধ সাদা' তখন এই বচন স্বতন্ত্রভাবে সত্য বা মিথ্যা কিছুই নয়। কিন্তু যখন এই বচন অন্যান্য বচনের সঙ্গে মিলে একটা সঙ্গতিপূর্ণ মণ্ডলী রচনা করে তখনই তা সত্য হয়।

সব বচনই একই রকম মণ্ডলী রচনা করতে পারে না। যে বচনের মণ্ডলীর পরিধি যত বেশী বিস্তৃত সে বচন তত বেশী সত্য। আর যে বচনের মণ্ডলীর পরিধি যত বেশী সঙ্কুচিত সে বচনের সত্যতা তত বেশী কম। সুতরাং সমস্ত

১। Coherent system

বচনের সত্যতাই এক রকমের নয। কোন বচনের সত্যতা বেশী, কোন বচনের কম। বচনের সঙ্গতির মণ্ডলী বিস্তৃত হ'তে হ'তে চরম বিস্তৃতি লাভ করলেই চরম সত্য পাওয়া যায। সঙ্গতির মণ্ডলী চরম বিস্তৃতি লাভ করলে স্বযংসম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ সুসংবদ্ধ, পবম অভিজ্ঞতা[১] লাভ করা যায। এই পরম অভিজ্ঞতাই চবম সত্য ও পরম তত্ত্ব। কিন্তু আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায কখনই চবম সঙ্গতি পাওযা যায না। সুতরাং সাধাবণ কোন অভিজ্ঞতাই চরম সত্য নয। অভিজ্ঞতায চবম অসঙ্গতিও পাওযা যায না। কোন বচনের চবম অসঙ্গতি না থাকলে তাকে চরম মিথ্যা বলা যায না। সুতরাং সাধাবণ অভিজ্ঞতায কোন বচনই চরম সত্য নয, আবাব চবম মিথ্যাও নয। চরম অভিজ্ঞতার দিক থেকে প্রত্যেক বচনই আপেক্ষিক মিথ্যা,[২] আবার চরম মিথ্যাত্বের দিক থেকে প্রত্যেক বচনই আপেক্ষিক সত্য[৩]। ব্রেড্‌লি বলেন, ভ্রমও সত্য ; তবে তা আংশিক সত্য। যে হেতু তা আংশিক সত্য সেজন্যই লোকে তাকে ভ্রম বলে। আবার অন্যদিক থেকে সমস্ত সত্যই আংশিক মিথ্যা, কারণ চরম সঙ্গতি সাধারণ কোন সত্যেই নেই।

সমালোচনা : হেগেল ও হেগেল-পন্থীরা বলেন, কোন বচনই স্বতন্ত্রভাবে সত্য নয ; অন্য বচনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হযেই তা সত্য হয। কিন্তু, আমাদের ব্যবহারিক জীবনে আমরা ত' স্বতন্ত্রভাবেই প্রত্যেক বচনের সত্যতা নির্ণয করি। প্রত্যেক বচনই স্বতন্ত্রভাবে সত্য বা মিথ্যা। যদি কোন বচন স্বতন্ত্রভাবে সত্য না হয তবে অন্য বচনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলেই তা সত্য হতে পারে না। সত্যতা বচনের আগন্তুক গুণ নয। যে বচন সত্য তাতে সত্যতা স্বতঃই থাকে। যদি তা না থাকত তবে কখনই কোন অবস্থাতেই বচন সত্য হতে পারত না। কারণ যাতে যা নেই তাতে তা কখনই হয় না।[৪] সত্যতার মত মিথ্যাত্বও বচনে স্বতঃই থাকে। যে বচন মিথ্যা তা স্বতঃই মিথ্যা। তবে বচনের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব স্বতঃই জানা যায় না। এই জন্যই নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয।

দ্বিতীযতঃ, হেগেল ও তাঁর শিষ্যদের মতে সমস্ত বচনই আংশিক সত্য ও আংশিক মিথ্যা। কিন্তু আমরা ব্যবহারিক জীবনে সত্য ও মিথ্যাকে সম্পূর্ণ বিপরীত বলেই জানি। যা সত্য তা কখনই মিথ্যা নয ; আবার যা মিথ্যা তা কখনই সত্য নয। "৭+৩=১০"—এই বচনকে কেউই আংশিক সত্য ও আংশিক মিথ্যা বলবেন না। এই বচন সম্পূর্ণ সত্য।

১। Absolute Experience
২। Relative y false
৩। Relatively true
৪। Ex nihilo nihil fit

সত্য ও মিথ্যা যদি সম্পূর্ণ বিপরীত না হত তবে কোন লোকব্যবহারই সম্ভব হত না। আমরা ব্যবহারিক জীবনে মিথ্যাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেই পরিহার করি ; আর সত্যকে সম্পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করি। কিন্তু সবই যদি আংশিক সত্য ও আংশিক মিথ্যা হয়, তবে কোন কিছুই বর্জনের প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং হেগেল ও তাঁর শিষ্যদের মতবাদ লোকব্যবহারের বিরুদ্ধাচরণ করে। তাঁরা হয়ত বলবেন যে, সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা 'সত্যতা' পদের বিচার করেন না। কিন্তু এখানে আমরা ব্যবহারিক জীবনের 'সত্যতা' নিয়েই আলোচনা করছি। সুতরাং এই ক্ষেত্রে কোন পারমার্থিক সত্যতা-বোধে আমরা তৃপ্ত হতে পারি না।

তৃতীয়তঃ, হেগেল ও তাঁর শিষ্যদের মতে সঙ্গতি সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষা উভয়ই প্রকাশ করে। তাঁরা বলেন, সঙ্গতিপূর্ণ বচনই সত্য। যদি প্রশ্ন করা যায়—এ কথা জানি কি ক'রে ? উত্তরে তাঁরা বলবেন, বচনের সঙ্গতি দিয়েই। এখানে চক্রক দোষের[১] উৎপত্তি হয়েছে। সঙ্গতিই যে সত্যতা তা সঙ্গতি দিয়ে জানা যায় না। জানতে গেলে চক্রক দোষের উৎপত্তি হয়।

চতুর্থতঃ, বচনে সব সময়েই কোন না কোন বিষয়ের প্রতি নির্দেশ থাকে। বিষয় ছাড়া বচন হয় না। বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিই বচনের সত্যতা ; বিষয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিই বচনের মিথ্যাত্ব। হেগেল-পন্থী জোয়াকিমও বিষয়ের সঙ্গে বচনের সঙ্গতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, সমস্ত চিন্তাতেই উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের আপেক্ষিক নিরপেক্ষতা থাকে। সুতরাং চিন্তার সত্যতা খানিকটা পরিমাণে বিষয়ের সঙ্গতির ওপর নির্ভর করবেই।

আমরা বচনের সত্যতা নির্ণয়ের জন্য সঙ্গতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি। কোন বচন যখন অন্য বচনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তখন তাকে সত্য বলে জানা যায়। কিন্তু সেজন্য এই জাতীয় সঙ্গতিই বচনের সত্যতা সৃষ্টি করে না। বচনের সত্যতা বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতির ওপরই নির্ভর করে। বচন যখন বিষয়ের সঙ্গে মেলে তখনই তা সত্য ; আর যখন বিষয়ের সঙ্গে মেলে না তখনই তা মিথ্যা।

প্রয়োগবাদ (Pragmatic Theory)

উইলিয়ম জেমস, এফ্. সি. এস সিলার ও জন ডিউই সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষা হিসেবে প্রয়োগবাদ প্রচার করেছেন। এঁরা সকলেই সত্যের প্রকৃতি

১। Vicious Circle

ও সত্যের জ্ঞান ব্যাপারে জীবনের উপযোগিতার প্রাধান্য স্বীকার করেন। সত্য জীবনের প্রয়োজনে আসে, প্রয়োজনই সত্য নির্ণয়ের মাপকাঠি—এসব কথা এঁরা সকলেই বলেন। কিন্তু প্রয়োগবাদের ব্যাখ্যায় এঁদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। সেজন্য আমরা এই তিনজন দার্শনিকের মতবাদ পৃথক পৃথক আলোচনা করব।

উইলিযম জেম্সেব মতে ধারণাব[১] কোন স্বতঃপ্রামাণ্য[২] নেই। সত্যতা ধারণার এক আগন্তুক গুণ বিশেষ। ঘটনাচক্রে ধারণা সত্যে পরিণত হয়। ধারণার সত্যতা একটি ঘটনা বিশেষ। প্রমাণ বা সত্যতা-পরীক্ষায় সাফল্যই[৩] এই ঘটনা। কোন ধারণার প্রামাণ্য পবীক্ষা করতে গিযে যখন আমরা দেখি যে, ধারণাটি জীবনের কাজেব সহায়ক হয় তখনই ধারণাটি সত্য হয। কোন ধাবণা জীবনের কাজের সহাযক হলেই ধারণার সত্যতা-পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করা যায। একটি উদাহবণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হতে পারে। কোন এক স্থানে জলের ধাবণা তখনই সত্য হয যখন সেখানে গিযে জলে হাত পা ধুয়ে ক্লান্তি দূব করা যায। জল যখন ক্লান্তি দূর করে তখনই জলের ধাবণার সত্যতা-পরীক্ষায সাফল্য লাভ কবা যায। এরকম ভাবে সর্বত্রই ধারণার সত্যতা-পরীক্ষায সাফল্যেব ওপরই ধারণার সত্যতা নির্ভর করে। তবে সর্বত্রই যে ধাবণার সত্যতা ধারণার সত্যতা-পরীক্ষার সাফল্যের ওপরই সোজাসুজি নির্ভর কবে—এমন নয়। কোথাও কোথাও কোন ধাবণা যখন অন্য সত্য ধারণার সঙ্গে মেলে তখন তাকে সত্য বলা যায়।। অবশ্য এই ধারণা যে সত্য ধারণাব সঙ্গে মেলে তা সত্যতা-পরীক্ষায় সাফল্যের ওপরই নির্ভর করে। সুতরাং এই বিশেষ ধারণার ক্ষেত্রে সত্যতা পরোক্ষভাবে সত্যতা-পরীক্ষায় সাফল্যের ওপরই নির্ভর করছে। আমাদের দেয়ালে যে ঘড়ি দেখি তার সত্যতা এমনিতেই ঠিক হয়। দেয়ালে ঘড়ির প্রয়োজন না বুঝেই ও তার সময়জ্ঞাপন না দেখেই আমরা তা সত্য বলে ধরে নিই। এই ক্ষেত্রে অন্য সত্য ধারণার সঙ্গে ঘড়ির ধারণা মেলে বলেই এরকম করে থাকি। সুতরাং ধারণার সত্যতা সত্যতা-পরীক্ষায় সাফল্যের ওপরই নির্ভর করে; তবে সত্যতা-পরীক্ষা সোজাসুজিও হতে পারে, আবার তা পরোক্ষ-ভাবেও হতে পারে। যখন কোন ধারণার সত্যতা-পরীক্ষায় সাফল্য পরোক্ষ-

১। Idea

২। Intrinsic Validity

৩। Verification

ভাবে স্থির করা হয়, তখন সেই ধারণা অন্য সত্য ধারণার সঙ্গে মেলে ও এই সমস্ত অন্য ধারণার সত্যতা-পরীক্ষায় সাফল্য আমরা সোজাসুজিই জানি।

সিলারের মতে ধারণার সত্যতা তাদের সাফল্যের উপরই নির্ভর করে যখন আমরা কোন ধারণা পোষণ করি তখন সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি। যদি এই ভবিষ্যৎবাণী সফল হয় তবেই ধারণা সত্য হয়ে ওঠে। যে কোন ধারণা থেকে আমরা যে কোন ভবিষ্যৎবাণী করি না কেন তাদের সবারই সত্যতার দাবী[১] আছে। তবে এই সত্যতার দাবী পূর্ণ হয় তখনই যখন ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মনে করুন, একটা গন্ধ পাওয়া গেল। যদি বলা যায়, অদূরের বাগান থেকে ফুলের গন্ধ আসছে, তবে বুঝতে হবে—এই ধারণার একটা সত্যতার দাবী আছে। কিন্তু আমরা যদি বাগানে গিয়ে দেখি, সত্যিই সেখানে সুগন্ধি ফুল ফুটে রয়েছে, তবেই আমাদের ধারণা আসলে সত্য হবে।

ডিউই, জেম্স ও সিলারের মতই ধারণার স্বতঃপ্রামাণ্যে বিশ্বাস করেন না। তিনি মনে করেন, সত্যতা সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত অনুসন্ধানেরই ফল[২]। অনুসন্ধান-প্রক্রিয়ার ফলকেই সত্যতা বলা হয়। কোন একটা সন্দেহ উপস্থিত হলেই আমরা সন্দিগ্ধ বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণের জন্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। যখন অনুসন্ধান শেষ হয় তখন আর সন্দেহ থাকে না। সন্দেহের নিরসন হলেই সত্যতার উৎপত্তি হয়। উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। সেই গন্ধের উদাহরণই নেওয়া যাক। মনে করুন, বেড়াতে গিয়ে পথে একটা মিষ্টি গন্ধ পাওয়া গেল। সন্দেহ হল—পথের পাশের বাড়ীটার বাগান থেকেই বোধ হয় গন্ধটা আসছে। অনুসন্ধান শুরু হ'ল। চলতে চলতে বাগানে গিয়ে অনেক ফুল দেখা গেল। অপূর্ব তাদের গন্ধ। তখন আর নিজের ধারণা সম্বন্ধে সন্দেহ রইল না। সন্দেহ নিরসনের ফলে ধারণার সত্যতা উৎপন্ন হ'ল।

সমালোচনা : প্রয়োগবাদীরা কেউই ধারণার স্বতঃপ্রামাণ্যে বিশ্বাস করেন না। ধারণা থেকে উপযোগী ফল পেলেই সে ধারণা সত্য হয়—মোটা-মুটি একথা সব প্রয়োগবাদীই বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে ধারণার সত্যতা-পরীক্ষার সাফল্যই সত্যতা। আমাদের মনে হয়, ধারণার সত্যতা-পরীক্ষার

১। Truth Claim

২। Truth is the outcome of competent and controlled enquiry or nvestigation.

সাফল্য কোন কোন ক্ষেত্রে ধারণার সত্যতা নির্ণয় করতে পারে। কিন্তু ধারণার সত্যতা-পরীক্ষার সাফল্যই সত্যতা নয়। প্রয়োগবাদীরা ধারণার সত্যতা ও সেই সত্যতা-পরীক্ষা—একই জিনিস বলে মনে করেন। কিন্তু আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই আলোচনা করে দেখেছি যে, সত্যতা ও তার পরীক্ষা এক নয়। সুতরাং প্রয়োগবাদীদের সত্যতা ও সত্যতার পরীক্ষার একত্রীকরণ যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

প্রয়োগবাদীদের মতে সত্যতা ধারণার আগন্তুক গুণ। কিন্তু আমরা মনে করি, ধারণার সত্যতা স্বতঃই ধারণার মধ্যে থাকে। যদি তা না থাকত তবে কোন পরিবেশেই কখনই ধারণা সত্য হতে পারে না। যাতে যা নেই তাতে তা কখনই হয় না। ধারণার সত্যতা স্বতঃই ধারণাতে থাকে। কিন্তু আমরা তা স্বতঃই জানতে পারি না। ধারণার সত্যতা জানার জন্য নানাবিধ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে ধারণার সাফল্য দেখে তার সত্যতা বিচার করা যায়। কিন্তু সর্বত্রই ধারণার সত্যতা এই উপায়ে নির্ণয় করা যায় না। অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণা-স্বীকার করার ফলেও জীবনের সাফল্য আসে। সুতরাং সাফল্য-লাভই সত্যতার একমাত্র মাপকাঠি নয়। সত্যতার অনেক পরীক্ষার মধ্যে ধারণার সাফল্যকে কোন কোন ক্ষেত্রে একটি পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

অনুরূপতাবাদ (The Correspondence Theory)

বচনের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে যত মতবাদ হয়েছে তাদের মধ্যে অনুরূপতাবাদই সবচেয়ে জনপ্রিয়। এই মতবাদ অনুসারে বচন-নির্দিষ্ট ধারণা যদি বস্তুর সঙ্গে মেলে বা বস্তুর অনুরূপ হয় তবেই বচনকে সত্য বলা যায়; আর যদি ধারণা বস্তুর সঙ্গে না মেলে বা বস্তুর অনুরূপ না হয়, তবে বচন হয় মিথ্যা। সাধারণ লোক এইভাবেই ধারণার সত্যতা ও মিথ্যাত্ব ঠিক ক'রে থাকে। সুতরাং অনুরূপতাবাদকে সাধারণ লোকের মতবাদ[১]ও বলা যেতে পারে। 'অনুরূপতার' ঠিক অর্থ কি এ-নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। আমরা এখন 'অনুরূপতা' শব্দের বিভিন্ন দার্শনিক-ব্যাখ্যা আলোচনা করব।

(১) **সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের[২] মতে** বিষয় বা বস্তু সোজাসুজিই জানা যায়। জ্ঞান হওয়ার সময় জ্ঞাতা মন ও জ্ঞেয় বস্তুর মাঝখানে কিছুই

১। Common-sense theory

২। Naive Realists

থাকে না। বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হলেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুতরাং বিষয় সরাসরিই জানা যায়। এই মতবাদ অনুসারে জ্ঞান বিষয়ের অনুরূপ হয়, কারণ জ্ঞান সম্পূর্ণভাবেই বিষয়-নির্দিষ্ট হয়। বিষয় না থাকলে কোন জ্ঞানই হতে পারে না।

এই অর্থে 'অনুরূপতা' শব্দ ব্যবহার করলে মিথ্যাজ্ঞান বা অপ্রমার কোন স্থান থাকে না। সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা মনে করেন, প্রত্যেক জ্ঞানই বিষয়ের অনুরূপ হয়, কারণ বিষয় না থাকলে সেই বিষয়ের কোন জ্ঞানই হতে পারে না। এই অবস্থায় সর্বত্রই জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশ করে। সব জ্ঞানই বিষয়ের অনুরূপ। সুতরাং সব জ্ঞানই সত্য। কিন্তু আমরা জানি, আমাদের জীবনে হামেসাই ভ্রান্তজ্ঞানের উদ্ভব হয়। সুতরাং সরল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের অর্থে 'অনুরূপতা' শব্দটি গ্রহণ করা যায় না।

(২) **জন লকের মতো প্রতীকবাদীদের[১] মতে** বিষয় বা বস্তু সরাসরি জানা যায় না। ধারণাই আমরা সরাসরি জানি। ধারণা বস্তুর প্রতীক বিশেষ। যখন ধারণার সঙ্গে বস্তু মেলে তখন ধারণা সত্য হয়, আর যখন মেলে না তখন হয় মিথ্যা। যদি ধারণা বস্তুর ঠিক ঠিক প্রতীক বা প্রতিবিম্ব হয় তবেই ধারণাকে সত্য বলা যেতে পারে। সুতরাং এই মত অনুসারে 'ধারণা বস্তুর অনুরূপ'—এই কথায় 'ধারণা বস্তুর সঠিক প্রতীক বা প্রতিবিম্ব'—এই অর্থই প্রকাশ করে।

ধারণা যদি বস্তুর সঠিক প্রতীক হলেই বস্তুর অনুরূপ হয়, তবে এই অনুরূপতা কখনই জানা যাবে না। লক বলেন, আমরা সরাসরি বস্তুর প্রতীক বা ধারণাই জানি, বস্তু বা বিষয় জানি না। বস্তু বা বিষয় যদি সরাসরি না জানা যায় তবে কোন বিশেষ ধারণা বস্তুর সঠিক প্রতীক কি না তাও জানা যায় না। যে ব্যক্তিকে আমরা কখনও দেখি নি তার ছবি[২] ঠিক তার প্রতিবিম্ব কি না, তা আমরা বলতে পারি না। ঠিক তেমনি, যে বস্তু আমরা সরাসরি জানি না, কোন ধারণা সে বস্তুর সঠিক প্রতীক কি না, তাও বলতে পারি না। সুতরাং জন লকের অর্থে 'অনুরূপতা' শব্দ গ্রহণ করলে তা কখনও জানা যাবে না।

(৩) **নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা[৩]** 'অনুরূপতা' বলতে তাদাত্ম্য বা ঐক্য সম্পর্ক[৪] বোঝেন। তাঁদের মতে জ্ঞানের বিষয় আর জ্ঞানে কোন তফাৎ নেই। জ্ঞানের বিষয় আর জ্ঞান একই জিনিস।

১। Representationists
২। Photo
৩। Neo-Realists
৪। One-one relation

নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের কথা যদি ঠিক হয় তবে আমরা যখন 'টেবিলের ওপর কোন বই' জানি, তখন আমাদের 'বই'এর জ্ঞান 'টেবিল'এব জ্ঞানের ওপর থাকা উচিত। কিন্তু এমন অদ্ভুত ব্যাপারের কল্পনাও কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক করতে পারেন না। সুতবাং তাদাত্ম্য অর্থে 'অনুরূপতা' শব্দও কখনই গ্রহণ করা যায় না।

(৪) **বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা**[১] মনে ক'বন, বিষয় সোজাসুজি জানা যায় না। সরাসরি বিষযেব কতগুলো প্রভাবই জানা যায। এই প্রভাব-গুলোব নাম স্বভাববিমিশ্র বা আন্তব সত্তা[২]। এই স্বভাব-বিমিশ্র বস্তুও নয, আবাব মনেব ধারণাও নয। এগুলো বুদ্ধিগ্রাহ্য পদার্থ বিশেষ।[৩] স্বভাব-বিমিশ্র দেখেই আমরা বস্তুব কল্পনা ক'রে নিই। বস্তুর সঙ্গে স্বভাববিমিশ্রের যখন মিল হয, তখন কল্পনা হয সত্য ; আব যখন মিল হয না, তখন কল্পনা হয মিথ্যা।

বস্তু দেশে ও কালে থাকে। স্বভাববিমিশ্র বুদ্ধিগ্রাহ্য পদার্থ। সুতবাং তা দেশে বা কালে থাকে না। কাজেই বুদ্ধিগ্রাহ্য স্বভাববিমিশ্র কি ক'রে দেশ-কালস্থিত বস্তুর অনুরূপ হতে পাবে, তা বোঝা যায না। আজ এই অনুরূপতা যদি বোঝা না যায তবে বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা জ্ঞানের সত্যতা কিছুতেই প্রমাণ করতে পাববেন না। কাবণ তাঁদের মতে স্বভাববিমিশ্র বস্তুর অনুরূপ হলেই জ্ঞান সত্য হয। সুতরাং বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদেব 'অনুরূপতা' জ্ঞানের সত্যতা প্রমাণ করতে পারে না।

ওপবের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সবল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী, প্রতীকবাদী নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী ও বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের প্রদত্ত অর্থে 'অনুরূপতা' শব্দ ব্যবহার করা যায় না। নৈযাযিক জনসন, 'অনুরূপতা' বলতে 'অনুযায়িতা'[৪] বোঝেন। আমাদেব মনে হয, এই অর্থে 'অনুরূপতা' শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। জ্ঞান যদি বস্তু অনুযাযী হয তবে জ্ঞানকে সত্য বলা যায়। আর জ্ঞান যখন বস্তু অনুযাযী হয় না তখনই তা মিথ্যা। বিষয় অনুযায়িতা বা অনুরূপতাই সত্যের প্রকৃতি। তবে এই প্রকৃতি অনুরূপতা দিযে জানা যায় না। সত্যতা জানতে গেলে কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্গতি, কোন কোন ক্ষেত্রে ধারণার সাফল্য বা অর্থক্রিয়াকারিত্ব দেখেই জানতে হয়।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষা-নির্ণয় প্রসঙ্গে যে মতবাদ গ্রহণ করেছেন, আমাদের তা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। তিনি বলেন, বচন যখন

১। Critical Realists
২। Character-Complex or Essence
৩। Logical entities
৪। Accordance

বস্তু বা ঘটনার অনুযায়ী হয় তখনই তা সত্য। যখন এই বচন অন্য বচন বা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি লাভ করে তখনই আমরা তাকে সত্য বলে জানি। আমরা না জানলেও বচন সত্য হতে পারে। 'বৃষ্টি হচ্ছে' এই বচন সত্যিই বৃষ্টি হতে থাকলে সত্য হবে। এমন হতে পারে যে, তখন আমি ঘুমিয়ে আছি, বৃষ্টি যে হচ্ছে, তা আমি দেখলাম না। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও 'বৃষ্টি হচ্ছে' এই বচন সত্য। তবে এই বচনের সত্যতা আমি জানব তখনই যখন দেখব—মাটি ভিজে, গাছের পাতা থেকে জল ঝরছে বা এমন কিছু। অর্থাৎ বচনের সত্যতা বিষয়ের অনুরূপতার ওপরই নির্ভর করে; বচনের সত্যতা জানতে গেলে অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার সঙ্গতি দেখতে হয়। কতগুলো বচনের সত্যতা অবশ্য সরাসরিই জানা যায়। 'আমার জ্বর হয়েছে' এই বচনের সত্যতা আমি গায়ে হাত দিলেই বুঝতে পারি। তবে এই জাতীয় বচনের সংখ্যা খুবই কম।

সিদ্ধান্ত ঃ

সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষা নিয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করেছি। আলোচনা মনোযোগ দিয়ে অনুসরণ করলেই আমাদের বক্তব্য বোঝা যাবে। আমাদের মতে জ্ঞানের সত্যতার প্রকৃতি বিষয়-অনুরূপতা বা বিষয়-অনুযায়িতা বলেই গ্রহণ করা উচিত। জ্ঞান যখন বিষয়ের সঙ্গে মেলে তখনই তা সত্য, আর যখন মেলে না তখন তা মিথ্যা। সমস্ত জ্ঞানই হয় বিষয়ের সঙ্গে মিলবে, নয়ত মিলবে না। সুতরাং জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব স্বতঃই জ্ঞানে থাকে। সত্যতা বা মিথ্যাত্ব জ্ঞানের কোন আগন্তুক গুণ নয়। তবে জ্ঞানের সত্যতা পরীক্ষা করতে গেলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে হয়। আত্মজ্ঞানের বেলায় জ্ঞানের সত্যতা স্বতঃই প্রতীত হয়। স্বত.প্রতীতিবাদ প্রসঙ্গে আমাদের এই মতবাদ আমরা আলোচনা করেছি। জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে সঙ্গতি বা সম্বাদ জ্ঞানের সত্যতা পরীক্ষার উপায় হিসেবে গৃহীত হতে পারে। যখন কোন বিশেষ জ্ঞান অন্যান্য জ্ঞানের সঙ্গে মেলে তখন সেই জ্ঞানের সত্যতা নির্ণীত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে জ্ঞানের শুভফল দেখেও জ্ঞানের সত্যতার বিচার হতে পারে। **সুতরাং আমাদের মতে সত্যতা আর অনুরূপতা একই কথা। সত্যতা জানতে গেলে ক্ষেত্রের বিভিন্নতা অনুসারে স্বতঃপ্রতীতিবাদ, সঙ্গতিবাদ বা প্রয়োগবাদ ব্যবহার করা যেতে পারে।**

নবম অধ্যায়

জড় ও জড়বাদ

(Matter and Materialism)

সাধারণ লোক দেশস্থিত সমস্ত বস্তুকেই জড়ীয়[১] বলে মনে করে। বস্তুর শত পরিবর্তন সত্ত্বেও তার যে অংশের পরিবর্তন হয় না জড়[২] বলতে তাই বোঝায়। দেশস্থিত সমস্ত বস্তু যে অপরিবর্তিত উপাদান থেকে সৃষ্টি হয় তারই নাম জড়। এখন প্রশ্ন হল—বস্তুর আদিম উপাদান এই জড়ের রূপ কি ?

আমরা যদি দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করি তবে দেখব খ্রীষ্টজন্মের ছয়শত বৎসরেরও আগে গ্রীস দেশে বস্তুর আদিম উপাদানের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জড় সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদ এখন নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য মনে হবে না। কিন্তু সভ্যতার প্রথম যুগে মানুষ জড় সম্বন্ধে কি ভাবত, এই সব মতবাদ থেকে তার একটা পরিচয় পাওয়া যাবে। মানুষের প্রাথমিক চিন্তা হিসেবে গ্রীক দার্শানকদেরএই সব মতবাদের একটা মূল্য আছে। আমরা সেজন্য প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতে বস্তুর আদিম উপাদানের প্রকৃতিই প্রথম আলোচনা করব।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতে জড়ের প্রকৃতি

খ্রীষ্টজন্মের ছয়শত বছর আগে গ্রীস দেশের আইওনিয়া নামে এক দ্বীপে থেলিস প্রচার করেন, জলই বস্তুর আদিম উপাদান। তিনি চারদিকে জলবেষ্টিত এক দ্বীপে বাস করতেন। সুতরাং স্থলের চেয়ে জলের প্রাধান্যই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সে জন্যই নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই থেলিস বলেছিলেন, জল নিশ্চয়ই পৃথিবীর আদিম উপাদান হবে। কিন্তু, জলকে পৃথিবীর আদিম উপাদান বললে নানারকমের অসুবিধে দেখা দেয়। জল নিজেই একটি বস্তু। সুতরাং এই জল পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত বস্তুর কি ক'রে আদিম উপাদান হবে, তা ঠিক বোঝা যায় না। সেজন্যই পরবর্তী দার্শনিক য়্যানাক্‌সিম্যাণ্ডার আদিম উপাদানের নাম দিলেন 'অসীম'[৩]। তিনি মনে করলেন, অসীম নিরাকার উপাদান থেকেই সসীম সাকার বস্তুর সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। কিন্তু, য়্যানাক্‌সিমেনস এই মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি তুললেন।

১। Material ২। Matter

৩। The unbounded

তিনি বললেন, যা অনির্দিষ্ট তা নানারকমের নির্দিষ্ট বস্তুর সৃষ্টি করবে কি ক'রে ? অনির্দিষ্ট ত' নির্দিষ্টের উপাদান হতে পারে না। সেজন্যই তিনি বললেন, বায়ুই বস্তুর আদিম উপাদান। বায়ু অনির্দিষ্ট নয়, কিন্তু তা জলের মত একান্ত সীমিতও নয়। সুতরাং বায়ুকেই আদিম উপাদান বলা যেতে পারে। হিরাক্লাইটাস এই মতে তুষ্ট নন। তিনি অগ্নিকেই জগতের আদিম উপাদান বললেন।

হিরাক্লাইটাসের পর এম্পেডোক্লেস পূর্বের সমস্ত মতগুলো সমন্বিত করতে চেষ্টা করলেন। তাঁর মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ—এই চতুর্ভূতই সমস্ত বস্তুর আদিম উপাদান। যে কোন বস্তুই মাটি, জল, আগুন ও বাতাসের সমন্বয়ের ফলেই গঠিত হয়েছে। তবে এই গঠন-প্রক্রিয়ার সঞ্চালক হিসেবে তিনি 'অনুরাগ'[১] ও 'বিরাগ'[২] এই দুই শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। পরবর্তী কালে হয়ত বৈজ্ঞানিকদের কাছে এই 'অনুরাগ' 'আকর্ষণ' ও 'বিরাগ' 'বিকর্ষণ' হয়ে দেখা দিয়েছিল।

এম্পেডোক্লেসের পর ডেমোক্রাইটাস ও লিউকিপ্পাসের মতো পরমাণু-বাদীদের[৩] আবির্ভাব হয়। এঁদের মতে সমস্ত বস্তুরই আদিম উপাদান কতগুলো পরমাণু।[৪] এই পরমাণুগুলোর মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য[৫] নেই। এদের পার্থক্য কেবল আকার[৬] ও আকৃতির[৭] বিভিন্নতায়। সমস্ত পরমাণুই সমসাত্ত্বিক[৮] অদৃশ্য ও অবিভাজ্য। কোন পরমাণুকেই আর ক্ষুদ্রতর অংশে ভাঙ্গা যায় না। পরমাণুই বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ। পরমাণুদের মধ্যে কোন স্বতঃ গতি[৯] নেই। গতি বাইরে থেকেই পরমাণুদের ওপর কাজ ক'রে থাকে।

এই সব দার্শনিকদের পর য়্যানাক্সাগোরাস পরমাণুদের এক নূতন ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক পরমাণুর সঙ্গেই অন্য পরমাণুর গুণগত পার্থক্য আছে। জগতে কত বিচিত্র বস্তুর সমাবেশই আমরা দেখতে পাই। এই সমস্ত বিচিত্র বস্তুর আদিম উপাদান পরমাণুগুলোও যদি গুণের দিক থেকে বিচিত্র না হয় তবে জাগতিক বৈচিত্র্যের কোন ব্যাখ্যাই দেওয়া যায় না। সুতরাং এক পরমাণু অন্য পরমাণু থেকে গুণের দিক থেকে ভিন্ন, একথা বলতেই হবে। বস্তুর প্রকৃতি

১। Love
২। Hate
৩। Atomists
৪। Atoms
৫। Qualitative difference
৬। Size
৭। Shape
৮। Homogeneous
৯। Intrinsic Motion

আর বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে যেটি সর্বপ্রধান তার দ্বারাই নির্ণীত হয়ে থাকে। স্বর্ণের মধ্যে অনেক পরমাণুই থাকে, তবে অন্য পরমাণুর চেয়ে স্বর্ণের পরমাণুই এখানে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। দুনিয়ায় যত গুণ আছে ঠিক তত প্রকারেরই পরমাণু আছে। এই সব পরমাণুর মধ্যে কোন সঞ্চালক শক্তি নেই। য্যানাক্সাগোরাস্ মনে করেন, চেতস[১] বলে এক পদার্থ এই সব পরমাণুর মধ্যে বাইরে থেকে গতি সঞ্চারিত করে। চেতসের পরিচালনাতেই পরমাণুগুলো একত্রিত হয়ে এই সুন্দর বিশ্বের সৃষ্টি করেছে। জগতের চেতনা চেতসের পরিচলনারই ফল।

য্যানাক্সাগোরাসের পর প্রাচীন গ্রীক দর্শনে এক নূতন যুগের আবির্ভাব হয়। এই যুগের প্রখ্যাত দার্শনিক প্লেটো ও আরিস্টটল নূতন ভাবে জড়ের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। আমরা এখন তাঁদের মতবাদই আলোচনা করব।

প্লেটোর দর্শনে ধারণাকেই[২] সত্য বলা হয়েছে। এই জগতের সমস্ত বস্তুই বিভিন্ন ধারণার অনুকৃতি[৩] মাত্র। অনুকরণ করতে গেলে এমন কিছু উপাদান দরকার যাতে ধারণাগুলোর রূপ ফোটানো যেতে পারে। প্লেটো ধারণার অনুকৃতির জন্য যে উপাদান দরকার তারই নাম দিয়েছেন 'জড'। এই উপাদান একান্ত ভাবেই রূপহীন, গুণহীন ও আকারহীন। ধারণার রূপ, গুণ ও আকারের দ্বারাই এই 'জড' রূপায়িত ও আকারিত হয়ে জগতের বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি করে। 'জড' রূপহীন, গুণহীন ও আকারহীন বলে কোন কথা দিয়েই তার পরিচয় দেওয়া যায় না। প্লেটো সেজন্য 'জড'কে 'অনির্বচনীয় শূন্য'[৪] নামে অভিহিত করেছেন। 'জড' সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না বলেই সে যেন শূন্য।

প্লেটোর পর আরিস্টটল জডকে নূতন ভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে সমস্ত জগৎটাই যেন একটি প্রক্রিয়া। সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যেই একটা বিশেষ অবস্থা থেকে আর একটা বিশেষ অবস্থার দিকে গতি আছে। আরিস্টটল একটি উদাহরণ দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। ওক বীজ ওক বৃক্ষে পরিণত হয়। পরিবর্তিত হওয়াই ওক বীজের স্বভাব ও এই পরিবর্তন ওক বৃক্ষেই পর্যবসিত হয়। ওক বীজে ওক বৃক্ষের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। ওক বীজ থেকে ওক বৃক্ষ ছাড়া অন্য কোন বৃক্ষই উৎপন্ন হয় না। আরিস্টটল মনে করেন, অন্য সমস্ত বিশেষ বস্তুই ওক বীজের মত। একদিক থেকে কোন একটা

১। Nous
২। Idea
৩। Copy
৪। Nothing

কিছু পরিবর্তিত হয়, অন্য দিক থেকে এই পরিবর্তন কোন একটা নির্দিষ্ট কিছুতে পরিণতি লাভ করে। আরিস্টটলের মতে যা-ই পরিবর্তিত হয় তারই নাম জড়[১]; আর যার জন্য কোন একটা বিশেষ বস্তু অন্য নির্দিষ্ট বস্তুতে পরিণতি লাভ করে তার নাম আকার[২]। ওক বীজ জড়, কারণ ওক বীজ ওক বৃক্ষে পরিণত হয়। যে অন্তর্নিহিত শক্তির জন্য ওক বীজ অন্য কোন বৃক্ষে পরিণত না হয়ে ওক বৃক্ষে পরিণত হয়, তার নাম আকার। সুতরাং আরিস্টটলের মতে পরিবর্তিত হওয়াই জড়ের লক্ষণ।

আধুনিক দার্শনিকদের মতে জড়ের প্রকৃতি :

আধুনিক দর্শনে ডেকার্টে জডের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে জড মনের ঠিক বিপরীত তত্ত্ব। জডেব বিস্তৃতি আছে, মনের বিস্তৃতি নেই। জডের কোন চেতনা নেই, চৈতন্য ছাডা মন হতেই পারে না। সুতরাং জড ও মন সম্পূর্ণ বিপরীত গুণসম্পন্ন।

ডেকার্টের দর্শনে জড ও বিস্তৃতি সমার্থক শব্দ। তিনি জডের গুণগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। বিস্তার জডের মুখ্যগুণ[৩]। কিন্তু রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি জডের গৌণ গুণ।[৪] অবশ্য মুখ্য ও গৌণ গুণের পার্থক্য সুস্পষ্ট আকারে লকের দর্শনেই দেখা দিয়েছে। লকের মতে অভেদ্যতা, ঘনত্ব প্রভৃতি বস্তুর মুখ্য গুণ; রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি তার গৌণ গুণগুলো যে আধারে থাকে তারই নাম জড়। জড প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। কিন্তু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য গুণের আধার হিসেবে জডের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

বার্কলি গুণের অজ্ঞাত আধার হিসেবে জড়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে যখনই আমরা কোন বস্তু দেখি তখন তার কতগুলো গুণই দেখি, গুণের আধার বলে কিছুই পাই না। যা পাই না বা যা দেখা যায় না তার অস্তিত্ব স্বীকার করারও কোন সঙ্গত কারণ নেই। সুতরাং বার্কলি বলেন, গুণের আধার বলে কোন জড় নেই, বস্তুর কতগুলো গুণই আছে। লক্ বস্তুর গুণগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যে সমস্ত গুণ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয় না লক্ তাদের নাম দিয়েছেন 'মুখ্য গুণ'। বস্তুর অভেদ্যতা, ঘনত্ব, আকৃতি প্রভৃতি এই জাতির অন্তর্গত। রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণ ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন রকমের হয়। সেজন্য লক্ এদের 'গৌণ গুণ' বলেছেন। বার্কলি মনে করেন, গুণের এই রকম দুই

১। Matter
২। Form
৩। Primary Quality
৪। Secondary Qualities

ভাগ মোটেই সঙ্গত নয়। রূপ, রস প্রভৃতি যেমন ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়, তেমনি বস্তুর আকার প্রভৃতিও বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন রকমের হয়। সুতরাং সমস্ত গুণ একই জাতির অন্তর্গত। রূপ, রস প্রভৃতি যেমন বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন হওয়ায় তাদের ব্যক্তি-মনের ওপর নির্ভরশীল বলা হয়, আকার প্রভৃতিও সেই কারণে ব্যক্তি-মনের ওপর নির্ভরশীল হবে। সুতরাং বিশ্বে বস্তু বলে যা দেখি তা ব্যক্তি-মন-নির্ভর কতগুলো গুণের সমষ্টি মাত্র। মন-নির্ভর গুণকে মনের ধারণাও বলা যেতে পারে। সুতরাং দুনিয়ায় মন ও মনের ধারণাই আছে। দুনিয়ায় যা আমরা জড় বলে মনে করি তা সম্পূর্ণভাবেই জড়তামুক্ত। জড় আসলে কতগুলো মনের ধারণার সমষ্টিমাত্র। বার্কলির এই মতবাদ দর্শনের ইতিহাসে 'জড়ের নির্জড়ীকরণ তত্ত্ব'[২] নামে পরিচিত। বার্কলি জড়ের জাড্য দূর করে তাকে নিজড় মনের ধারণায় পরিণত করেছেন।

বার্কলির এই মতবাদের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তিই উত্থাপন করা হয়েছে। আমরা বার্কলির বিজ্ঞানবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই সে সমস্ত যুক্তির আলোচনা করেছি। পুনরুক্তি পরিহারের জন্য আমরা এখানে আর সেই আলোচনা করব না।

লাইব্‌নিজের মতে চিৎপরমাণুই জগতের একমাত্র দ্রব্য। এই চিৎপরমাণু চেতনধর্মী। গতিশীলতাই তার প্রাণ। সব চিৎপরমাণুই গতিশীল হলেও গতিশীলতার মাত্রা সবার মধ্যে সমান নয়। কোন কোন চিৎপরমাণুর গতিশীলতার মাত্রা এত কম যে তাদের স্থিতিশীল বলে ভুল হয়। চিৎপরমাণুর স্থিতিশীলতার ধারণা থেকেই জড়ের ধারণা আসে। সুতরাং জড়ের ধারণা আসলে এক ভ্রান্ত ধারণা। চেতন পরমাণুর অপেক্ষাকৃত কম গতিশীলতা দেখে স্থিতিশীলতা বা জাড্যের এই ধারণার সৃষ্টি হয়।

লাইব্‌নিজের ভাববাদ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই মতবাদের দোষত্রুটি আলোচনা করেছি। এখানে আবার তার পুনরুক্তি না করাই ভালো।

বিজ্ঞানীদের মতে জড়ের প্রকৃতি : নিশ্চল ও সচল জড়বাদ
(Static and Dynamic Theories of Matter)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রসায়নবিদ ডাল্টন নূতনভাবে আবার পরমাণুবাদের পত্তন করেন। তাঁর মতে যে কোন জড়পদার্থ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে

১। Ideas ২। The theory of dematerialisation of matter.

আমরা এমন সমস্ত অণু[১]তে পৌঁছাই যাকে আর ভাঙ্গা যায় না। এ সমস্ত অণুকেই পরমাণু[২] বলা হয়। এই সমস্ত অণুর মধ্যে কোন গতি বা শক্তি নেই। এই পরমাণুগুলো একান্তভাবেই নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয়। এদের কোন কোষ[৩] নেই। সুতরাং এরা অভেদ্য ও অবিভাজ্য। অভেদ্যতাই এই সব পরমাণুর প্রধান গুণ। যদিও পরমাণুর নিজস্ব কোন গতি নেই তবু বাইরে থেকে পরমাণুর ওপর গতি প্রয়োগ করলে এরা এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যেতে পারে। এই সমস্ত পরমাণুর স্বরূপতঃ রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গৌণ গুণ নেই। পরমাণুদের অবস্থান ও পারস্পরিক সংগঠন[৪] থেকেই এই সব গৌণ গুণের উৎপত্তি হয়। দুনিয়ার সমস্ত বস্তুই পরমাণুর সংগঠন ও সংযোজনের ফল। ডাল্টনের এই মতবাদকে **নিশ্চল জড়বাদ**[৫] বলা হয়। কারণ আমরা আগেই দেখেছি, এই মতবাদ অনুসারে পরমাণুর নিজস্ব কোন গতি নেই; পরমাণু স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চল।

এই নিশ্চল জড়বাদ সহজে পরিবর্তন ও গতি ব্যাখ্যা করতে পারে না। পরমাণুগুলো নিশ্চল হওয়ার জন্য নিশ্চল জড়বাদীদের পরমাণুর অতিরিক্ত এক গতির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। এই গতির সঙ্গে পরমাণুর সম্পর্ক কি তা সহজে নির্ণয় করা যায় না। সেজন্যই পরবর্তী কালের বিজ্ঞানীরা পরমাণুকে নিশ্চল বলেন নি। তাঁদের মতে পরমাণু গতি বা শক্তির আধার। নিশ্চল জড়বাদীদের পরমাণু ও গতির দ্বৈত[৬] এমনি ক'রেই সচল জড়বাদীদের জড়ের ধারণায় পরমাণু ও গতির ঐক্যে পরিণত হয়েছে।

সচল জড়বাদের বিভিন্ন রূপ
(Different Forms of Dynamic Theory of Matter)

(১) ভাশ্চভিচ্ ও ফেরাডে মনে করেন, বস্তুর আদিম উপাদান নিষ্ক্রিয় ও অভেদ্য পরমাণু নয়। তাঁদের মতে, বস্তুর আদিম উপাদান কতগুলো 'শক্তি-কেন্দ্র বিশেষ'[৭]। এই সমস্ত শক্তি-কেন্দ্র থেকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি উদ্ভূত হয়ে ঈথার সমুদ্রের মধ্যে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে।

(২) পরবর্তী কালে লর্ড কেলভিন্ বলেছেন, পরমাণুগুলো ঈথার সমুদ্রের কতগুলো আবর্তনচক্র[৮] মাত্র। এই আবর্তনচক্রগুলো আবর্তনের দ্রুততার

১। Minute Particle
২। Atom
৩। Pore
৪। Arrangement
৫। Static theory of Matter
৬। Dualism
৭। Centres of Force
৮। Whirlpools

জন্য এমন ঘন আকার ধারণ করে যে, তাদের অভেদ্য ও অচ্ছেদ্য বলে মনে হয়। হেলম্‌হল্‌চ (Helmholtz) গাণিতিক নিয়ম অনুসারে এই আবর্তনচক্রের গুণাবলী ব্যাখ্যা ক'রে লর্ড কেল্‌ভিনের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

(৩) অস্টওয়াল্ড ও অন্যান্য অনেকের মতেই পরমাণু ফেরাডের শক্তিকেন্দ্র বা কেল্‌ভিনের আবর্তনচক্রের চেয়ে অনেক বেশী জটিল। তাঁদের মতে প্রত্যেক পরমাণু এক একটি 'শক্তিগৃহ'[১] বিশেষ। এই শক্তিগুলো অত্যন্ত জটিল ও সাধারণতঃ তারা সাম্যাবস্থাতেই থাকে। কিন্তু শক্তির সাম্যাবস্থা ব্যাহত হ'লে তাদের প্রচণ্ড শক্তি ব্যবহার করার ক্ষমতা হয়।

(৪) রাদারফোর্ড ও বোর পরমাণুর অন্য আর এক চিত্র অঙ্কিত করেছেন: তাঁদের মতে প্রত্যেক পরমাণুতেই বিদ্যুৎশক্তির খেলা দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রস্থলেই ধনাত্মক বিদ্যুৎশক্তি[২] থাকে। এই ধনাত্মক বিদ্যুৎশক্তিকে ঘিরে ঋণাত্মক বিদ্যুৎশক্তি[৩] বা ইলেকট্রন ঘুরতে থাকে। সমস্ত ব্যাপারটা একটি তুলনা দিয়ে বোঝান যেতে পারে। সৌরমণ্ডলে সূর্যকে কেন্দ্রে রেখে কতগুলো গ্রহ ও উপগ্রহ তার চারিদিকে ঘুরতে থাকে। পরমাণুও সৌরমণ্ডলের মতই একটি বিদ্যুৎমণ্ডল। এই মণ্ডলের কেন্দ্রে ধনাত্মক বিদ্যুৎশক্তি ও চারিদিকে ঋণাত্মক বিদ্যুৎশক্তি দেখতে পাওয়া যায়। কেন্দ্রের ধনাত্মক বিদ্যুৎশক্তিকে সাধারণতঃ নিউক্লিয়াস বলা হয়। কখনও কখনও নিউক্লিয়াসকে প্রোটন নামেও পরিচয় দেওয়া হয়।

অধুনা দেখা গিয়েছে যে, প্রোটন ও ইলেকট্রন ছাড়াও পজিট্রন ও নিউট্রন নামে পরমাণুর আরও দুটি উপাদান আছে। পজিট্রন ও ইলেকট্রনের বস্তু পরিমাণে[৪] সমান। কিন্তু পজিট্রন ইলেকট্রনের মত ঋণাত্মক বিদ্যুৎশক্তি নয়। পজিট্রন ধনাত্মক বিদ্যুৎশক্তিসম্পন্ন।

(৫) অত্যন্ত আধুনিক কালে আপেক্ষিকতত্ত্ব ও কোয়াণ্টামবাদ জড় সম্বন্ধে প্রাচীন চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। এতদিন পদার্থবিদ্যায় শক্তিকে[৫] ভরের[৬] মাধ্যমে বোঝবার চেষ্টা হয়েছে। এমন আপেক্ষিকবাদী ও কোয়াণ্টাম-বাদীরা ভরকে শক্তির রূপান্তর বলে প্রচার করতে আরম্ভ করেছেন। আপেক্ষিকবাদীরা দেখিয়েছেন যে, কোন জিনিসেরই ভর সর্বদা সমান থাকে না। দ্রুতগতির ফলে ভর খুব বৃদ্ধি পায়। আপেক্ষিকবাদীদের মতে সব

১। শক্তিগৃহ—Magazine of force
২। Positive electric charge
৩। Negative electric charge
৪। Mass
৫। Energy
৬। Mass

গতিই আপেক্ষিক। যে কোন বস্তুর তুলনায় বিভিন্ন পর্যবেক্ষকগণের বিভিন্ন আপেক্ষিক গতি। সুতরাং বিভিন্ন পর্যবেক্ষক বস্তুর ভরের বিভিন্ন হিসেব দেন। আপেক্ষিকবাদীরা বলেন, এই সব হিসেবই যুক্তিযুক্ত। কোন পর্যবেক্ষক যদি কোন বস্তুর তুলনায় আপেক্ষিকভাবে স্থির থাকেন তবে তিনি বস্তুর ভরের যে হিসেব দেবেন তাই ভরের মূল হিসেব বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

কোয়াণ্টামবাদ শক্তি ও ভরের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরও বদলে দিয়েছে। কোয়াণ্টামবাদীরা প্রমাণ করেছেন যে, বিকিরণের ফলে যতটা শক্তির ক্ষয় হয়, ঠিক ততটাই ভরেরও ক্ষয় হয়। সুতরাং শক্তির সঙ্গে ভরের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ভরকে শক্তির রূপান্তর বলেই কল্পনা করা যেতে পারে।

জড় সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানীদের এই সব মতবাদ থেকে বোঝা যাচ্ছে, জড় অচ্ছেদ্য, কঠিন ও নিশ্চল কোন সত্তা নয়। শক্তিই জড়ের আসল রূপ। সুতরাং জড় বলতে সাধারণতঃ আমরা যা বুঝি আসলে জড় তা নয়। আধুনিক বিজ্ঞানীরা জড়ের নিশ্চলতা দূর ক'রে তার যা আসল রূপ সেই শক্তিরূপ প্রকাশ করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানীরা জড়কে সত্যিই নির্জড়ীকৃত[১] করে ফেলেছেন। আমরা এতদিন জড় বলতে যে নিশ্চল কঠিন পদার্থ বুঝতাম, জড় আদপেই তা নয়। সেজন্য কেউ কেউ রসিকতা ক'রে বলেন, **আমরা আজকাল জড়ের এত বেশী পরিচয় পেয়েছি যে, আর আমরা জড়বাদী থাকতে পারি না।** সাধারণতঃ জড়বাদীরা জড়কে নিশ্চল ও কঠিন পদার্থ বলে মনে করেন। কিন্তু আজকাল সেই ধারণা বদলে গেছে। সুতরাং আধুনিক কালে কেউই আর সাধারণ অর্থে জড়বাদী হতে পারেন না।

জড়বাদ (Materialism)

জড়বাদ জড়কেই বিশ্বের চরমতত্ত্ব বলে মনে করে। জড়বাদীদের মতে, প্রাণ, মন প্রভৃতি সমস্ত কিছুই জড়েরই সৃষ্টি। জড় বিস্তৃতি ও অভেদ্যতা—এই দুই গুণ সম্পন্ন। জড়ের কার্যাবলীর জন্য গতির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। জড় ও গতি—এই দুই মিলে যান্ত্রিকভাবে বিশ্বের সমস্ত বস্তু উৎপন্ন করেছে। সৃষ্টির মধ্যে কোথাও কোন উদ্দেশ্য বা আদর্শের স্থান নেই। যন্ত্র যেমন নির্বোধের মত অনবরত কাজ ক'রে যায়, জড় ও গতি তেমনি কাজ ক'রে চলেছে। এই কর্মপ্রণালীর মধ্যে প্রত্যেক পূর্বাবস্থা উত্তরাবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে। যন্ত্রের

১। Dematerialisation of Matter

যেমন কোন স্বাধীনতা নেই, তেমনি এই বিশ্ব-ব্যাপারেও স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। সব কিছুই ছকে বাঁধা নির্দিষ্ট প্রণালীতে ঘটে যাচ্ছে।

প্রথমতঃ, জড়বাদের সপক্ষে প্রায়ই একাধিক যুক্তি উত্থাপন করতে দেখা যায়। জড়বাদীরা বলেন, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। যা প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না তা মানবার কোন অধিকার আমাদের নেই। প্রত্যক্ষের দ্বারা আমরা শুধু জড়ের অস্তিত্বই জানতে পারি। সুতরাং জড়ই একমাত্র সত্য। আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্বই প্রত্যক্ষগোচর হয় না। সুতরাং এই সব আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সত্যতা-স্বীকৃতিও অর্থহীন।

দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে জীবন-কোষ[১] যে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের সমন্বয়ের ফলেই সৃষ্টি হয়, তা জানা গেছে। সুতরাং জীবনকে জড়াতিরিক্ত কোন সত্তা বলে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা নেই। জীবন জড়েরই সৃষ্টি।

তৃতীয়তঃ, অভিজ্ঞতায় দৈহিক বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে মানসিক বিভিন্ন অবস্থার অত্যন্ত নিবিড় সংযোগ দেখতে পাওয়া যায়। দেহ অসুস্থ হলে সকলেই মানসিক অশান্তি ভোগ করে। মস্তিষ্কের সঙ্গে মনের বা মানুষের চেতনার সম্পর্ক আরও নিবিড়। মস্তিষ্কের কোন বিশেষ স্থানে আঘাত লাগলে মানুষের চৈতন্য লুপ্ত হয়। সুতরাং চৈতন্য যে মস্তিষ্কেরই কোন একটা গুণ, প্রভাব বা কার্য তা অস্বীকার করা যায় না।

চতুর্থতঃ, অভিব্যক্তিবাদ[২] আবিষ্কৃত হওয়ার পর জড় থেকে কি ক'রে প্রাণ ও মনের আবির্ভাব হয় তা দেখান সহজ হয়েছে। সুতরাং এখন জড়বাদ গ্রহণের পক্ষে আর কোন বাধাই নেই।

আমরা জড়বাদের এই সমস্ত যুক্তি অতি সহজেই খণ্ডন করতে পারি। জড়বাদের প্রথম যুক্তি অত্যন্ত লঘু বলে মনে হয়। প্রত্যক্ষই যে একমাত্র প্রমাণ নয় তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, প্রত্যক্ষই যে একমাত্র প্রমাণ তা প্রত্যক্ষ করা যায় না। সুতরাং যাঁরা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলেন, তাঁরা নিজেদের মতের প্রামাণ্যই প্রত্যক্ষ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না। কাজেই যাঁরা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলেন, তাঁরা স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য প্রমাণ মানতে বাধ্য। সুতরাং প্রত্যক্ষকেই

১। Protoplasmic cell

২। The theory of Evolution

একমাত্র প্রমাণ মনে ক'রে জড়বাদীরা যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানীরা মৃত জীবন-কোষ বিশ্লেষণ ক'রেই কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস বের করেছেন। সুতরাং জীবনের আসল পরিচয় এই মৃত জীবন-কোষের বিশ্লেষণ থেকে কখনই পাওয়া যাবে না। কাজেই জীবন জড়াতিরিক্ত নয়, এমন কথা বলার কোন সঙ্গত কারণ এখনও পাওয়া যায় নি।

তৃতীয়তঃ, দেহের সঙ্গে মনের নিবিড় সম্পর্ক আছে বলেই মনকে দেহের এক বিশেষ গুণ বা কার্য বলা যায় না। যদি তা বলা যায়, তবে অনুরূপভাবে দেহকেও মনেরই রূপ বা কার্য বলা যেতে পারে। সুতরাং এই যুক্তি জড়বাদীদের সিদ্ধান্তকেই একান্তভাবে সমর্থন করে না। মস্তিষ্কে আঘাত লাগলে চৈতন্য লুপ্ত হয় বলে চৈতন্যকে মস্তিষ্কের কার্যও বলা যায় না। এমন ভাবা অসম্ভব নয় যে, চৈতন্যের প্রকাশ মস্তিষ্কের মধ্য দিয়েই হয়। প্রকাশ-মাধ্যম যখন বিকল হয় তখন চৈতন্য প্রকাশিত হতে পারে না। চৈতন্যের প্রকাশ না হওয়া আর চৈতন্য না থাকা এক কথা নয়। সুতরাং প্রকাশ-মাধ্যমকে চৈতন্যের কারণ বলার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

চতুর্থতঃ, অভিব্যক্তিবাদ কি করে জড় থেকে প্রাণ ও মন আসে তার সদ্ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে বলে আমাদের মনে হয় না। প্রাণের এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যা জড়ের নেই। সুতরাং জড় কি ক'রে প্রাণের উদ্ভব ব্যাখ্যা করবে তা আমরা বুঝি না। মন চৈতন্যযুক্ত। জড় একান্তভাবেই নিশ্চেতন। সুতরাং নিশ্চেতন জড় থেকে চেতন মনের আবির্ভাব ব্যাখ্যা করা যায় না।

জড়বাদীরা জ্ঞান, প্রাণ, মন, নীতি প্রভৃতির ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। আমরা এখন তাঁদের এই সমস্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যা আলোচনা করব।

জড়বাদ ও জ্ঞান

জড়বাদীদের মতে চৈতন্য মস্তিষ্কের গুণ বা কার্য। সুতরাং অভিজ্ঞতা মস্তিষ্ক যন্ত্রের ওপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল। কোন বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হলেই সেই বিশেষ ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুতন্ত্রী সংক্ষুব্ধ হয়। মস্তিষ্ক যন্ত্রে এই সংক্ষোভ প্রবেশ করলেই 'সংবেদন'[১]-এর সৃষ্টি হয়। এই সংবেদনই প্রত্যক্ষ বা জ্ঞান। সুতরাং জড়বাদ জ্ঞানের ব্যাপারে 'সংবেদনবাদ'[২] গ্রহণ করেছে।

১। Sensation ২। Sensationism

জডবাদীদের মতে, বিভিন্ন সংবেদনের মধ্যে কোনরূপ ঐক্য নেই। সংবেদনগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবেই জ্ঞান হিসেবে গৃহীত হ'তে পারে।

সংবেদনবাদ যুক্তিগ্রাহ্য নয়। স্নায়ুতন্ত্রীর সংক্ষোভ মস্তিষ্ক যন্ত্রে প্রবেশ করলে সংবেদন হয বটে, কিন্তু এই সংবেদন কখনই জ্ঞান নয। মন বা চৈতন্য যখন সক্রিযভাবে সংবেদনেব একটা ব্যাখ্যা দেয তখনই সত্যিকারেব জ্ঞান উৎপন্ন হয। কথাটা উদাহরণ দিযে বোঝান যেতে পাবে। মনে করুন, বাইবে একটা আলো দেখা গেল। এই ক্ষেত্রে প্রথমে চক্ষুব সঙ্গে আলোর সংযোগ হওযা মাত্র চক্ষুব স্নাযুতন্ত্রীতে সংক্ষোভ উপস্থিত হবে। এই সংক্ষোভ মস্তিষ্কে গেলেই তা সংবেদন বা একটা কিছুর সংক্ষোভ বলে মনে হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মন বা চৈতন্য এই সংক্ষোভেব হেতুকে আলো বলে ব্যাখ্যা না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত আলোর কোন জ্ঞান হবে না। সুতরাং জ্ঞান হ'তে গেলে সংবেদনের ব্যাখ্যা দবকার। এই ব্যাখ্যা মন বা চৈতন্যই দিযে থাকে। শুধু সংবেদন কখনও জ্ঞান হ'তে পারে না। কাজেই জডবাদীদের জ্ঞানের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

সংবেদনবাদের আব একটা অসুবিধেও আছে। সংবেদনবাদীদের মতে সংবেদনগুলো একান্তভাবেই বিচ্ছিন্ন। কিন্তু, একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন সংবেদন কখনই সম্যক জ্ঞান দিতে পারে না। জ্ঞানের জন্য বিভিন্ন সংবেদনের ঐক্য দরকার। প্রত্যেক সংবেদনে আমরা বস্তুর কোন না কোন গুণের সঙ্গে পরিচিত হই। মনে করুন—একটি কমলালেবু আমাদেব চোখের সামনে রাখা হযেছে। বিভিন্ন সংবেদনের সাহায্যে কমলালেবুর বিভিন্ন গুণ আমাদের জ্ঞান-গোচর হবে। এই গুণগুলো একত্র করলেই কমলালেবুর জ্ঞান হবে। সুতরাং বস্তুর সম্যক জ্ঞানের জন্য সংবেদনেব ঐক্য দবকার। কিন্তু জডবাদীরা এই ঐক্য স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁদের মতে বস্তু-জ্ঞানের কোন ব্যাখ্যাই হতে পারে না।

জড়বাদ ও প্রাণ

জডবাদীদের মতে জড থেকেই প্রাণের উদ্ভব হয়। তাঁরা মনে করেন, প্রাণ কিছু একটা অলৌকিক তত্ত্ব নয়। প্রাণকে জডের চেয়ে একটু জটিল বলা যেতে পারে। কিন্তু জডের সঙ্গে প্রাণের কোন গুণগত পার্থক্য নেই। সুতরাং প্রাণের উৎপত্তি জড থেকে যান্ত্রিকভাবে হবে—একথা মনে করাই যুক্তিযুক্ত।

আমাদের ধারণা, জড থেকে কখনই প্রাণের উৎপত্তি হতে পারে না। গতি বা চলার ক্ষমতাই প্রাণের বিশেষ লক্ষণ। যে-কোন প্রাণীরই গতি আছে।

যখন কোন প্রাণীর একেবারেই গতি থাকে না তখন তাকে মৃত বলা হয়। জড়বাদীদের মতে জড নিশ্চল। সুতরাং এই নিশ্চল জড় থেকে কখনই সদা-চঞ্চল প্রাণের উদ্ভব হতে পারে না। প্রাণী বংশবৃদ্ধি করতে পারে ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারে। প্রাণীর উন্মেষ ভেতর থেকেই সম্ভব হয়। কিন্তু জড়ের এই সমস্ত ক্ষমতা একেবারেই নেই। সুতরাং জড় থেকে প্রাণের উদ্ভব কখনই সম্ভব নয়।

জড়বাদ ও মন

জড়বাদ মন বা চৈতন্যের কোন আধ্যাত্মিক সত্তা স্বীকার করে না। কোন কোন জড়বাদীর মতে মন বা চৈতন্য প্রাণের চেয়েও জটিল। প্রাণ আবার জড়ের চেয়ে জটিল। সুতরাং জড়ের সঙ্গে মন বা চৈতন্যের পার্থক্য শুধু মাত্রাগত, গুণগত নয়। জড় থেকে যেমন প্রাণের উদ্ভব হয়েছে, জড় থেকে তেমনি মন বা চৈতন্যেরও উদ্ভব হয়েছে। অন্যান্য জড়বাদীরা আবার জড় ও চৈতন্যের সম্পর্ক অন্যভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছেন।

কারো কারো মতে মানসিক প্রক্রিয়াগুলো আসলে জড়ীয়ই বটে। মন আর জড়ের মধ্যে স্বরূপতঃ তাদাত্ম্য সম্পর্কই আছে। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে মন আর জড় একই। কুল্পে এই মতবাদকে 'তাদাত্ম্যসূচক জড়বাদ'[১] নামে অভিহিত করেছেন। এই মতবাদ জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের ক্রমাগত পার্থক্যও স্বীকার করে না। তাদাত্ম্যসূচক জড়বাদ জড়বাদের চরমরূপ[২]।

জড়বাদীদের মধ্যে অন্য কেউ কেউ জড় ও মনকে সম্পূর্ণ এক বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে মন বা চৈতন্য মস্তিষ্ক থেকে উত্থিত একটা আলোর চক্রবিশেষ[৩]। লোহায় লোহায় ঘর্ষণে যেমন আগুনের রেখা বেরিয়ে আসে তেমনি মস্তিষ্ক থেকে আলোকরেখার উৎপত্তি হয়। এই আলোকরেখার নামই মন বা চৈতন্য। চৈতন্য জড়ের একটি কার্যবিশেষ। এই মতবাদে চৈতন্যকে উপ-বস্তু[৪] বলে অভিহিত করা হয়েছে। জড়ই আসল বস্তু। জড় থেকে সৃষ্ট চৈতন্যের জড়ের মত বস্তু-সত্তা নেই। সুতরাং চৈতন্যকে উপ-বস্তু বলাই উচিত। কুল্পে এই জাতীয় জড়বাদকে 'কারণবাচক জড়বাদ'[৫] নামে পরিচয় দিয়েছেন। এই মতবাদ অনুসারে জড়ই চৈতন্যের কারণ।

১। Equative Materialism
২। Extreme form
৩। Halo round the brain
৪। Epi-Phenomenon
৫। Causal Materialism

কুল্পের মতো আর এক দলের জড়বাদীরও দেখা পাওয়া যায়। এই সমস্ত জড়বাদীরা মনে করেন, জড় ও চৈতন্য এক নয়, আবার চৈতন্য ও জডের কার্যও নয; চৈতন্য জডের গুণ বিশেষ। কুল্পে এই মতবাদের নাম দিয়েছেন 'গুণবাচক জড়বাদ'[১]।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, কোন জড়বাদীই জডের ওপর মন বা চৈতন্যের প্রাধান্য স্বীকার কবেন না। কারও কারও মতে চৈতন্য জটিল জড় বিশেষ। কেউ বা জড ও চৈতন্যকে একান্ত অভিন্ন বলে মনে করেন। অন্য কেউ চৈতন্যকে জডের কার্য হিসেবে ধরে নিয়েছেন। আবার কেউ চৈতন্যকে জডের গুণ বলে মনে কবেন। এঁদের সকলের মতেই চৈতন্যের কোন স্বতন্ত্র পৃথক সত্তা নেই। আমাদের মনে হয়, চৈতন্য কখনই জড়-নির্ভর হতে পারে না। জড ও চৈতন্য সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। জড নিশ্চেতন। সুতরাং জড কখনও চৈতন্যের আশ্রয় হতে পারে না। জডাতিরিক্ত চৈতন্য না থাকলে জডকে জড বলেই জানা যেত না। কারণ চৈতন্য ছাডা কোন জ্ঞান হয় না। সুতরাং জড়বাদীদের চৈতন্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

জড়বাদ ও নীতি (Matertialism and Morality)

ইচ্ছা বা কৃতির স্বাধীনতা[২] না থাকলে কোন কাজেরই নৈতিক বিচার চলে না। রামবাবু যে কাজ নিজের ইচ্ছায় করেন নি সেই কাজের জন্য তাঁকে দাযী করা যায না। যে কাজের জন্য রামবাবু দাযী নন, সেই কাজ দেখে রামবাবুকে ভাল বা মন্দ কিছুই বলা যাবে না। কোন কাজের ওপর ভালো বা মন্দ বলাই নৈতিক বিচাব। সুতরাং কৃতির স্বাধীনতা ছাডা নীতি সম্পূর্ণ-ভাবেই অর্থহীন।

জড়বাদীদের মতে সমস্ত মানসিক ক্রিয়াই মস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন মানসিক ক্রিযারই স্বাধীনতা নেই। ইচ্ছা বা কৃতি[৩] মানসিক ক্রিযা। সুতরাং জড়বাদীদের মতে ইচ্ছা বা কৃতির স্বাধীনতা নেই। আমরা আগেই দেখেছি, ইচ্ছা বা কৃতির স্বাধীনতা না থাকলে নীতির[৪] কোন অর্থ হয় না। সুতরাং জড়বাদীরা নীতিকে একান্তভাবেই নিরর্থক ক'রে ফেলেছেন। জড়বাদীরা বলেন, যদি নীতির কথা বলতেই হয় তবে ইন্দ্রিয়ের সম্ভোগকেই একমাত্র

১। Attributive Materialism
২। Freedom of will
৩। Will
৪। Morality

আদর্শ বলতে হবে। এই দেহ ছাড়া আমাদের কোন পারমার্থিক সত্তা নেই। সুতরাং দেহের সম্ভোগই আমাদের একমাত্র কাম্য। জড়বাদীদের নৈতিক আদর্শকে ভোগবাদ বা সুখবাদ[১] বলা যেতে পারে।

জড়বাদীদের ভোগবাদ মনুষ্য-জীবনের কোন উচ্চ আদর্শ ই হতে পারে না। দেহের সম্ভোগ আর ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিই যদি আমাদের একমাত্র কাম্য হয়, তবে পশুর সঙ্গে আমাদের কোন তফাৎই থাকে না। আমরা নিজেদের সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব বলে মনে করি। আমাদের কবি বলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। সুতরাং আমাদের আদর্শ কখনই ভোগবাদের মত এত হীন হতে পারে না। জীবনের মহত্তর গুণাবলী অর্জন করার চেষ্টাই আমাদের নিত্য সাধনা হওয়া উচিত।

জড়বাদ ও ধর্ম

ধর্ম মাত্রেই সাধারণতঃ কোন না কোন অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক তত্ত্বে বিশ্বাস করে। জড়বাদীদের মতে, হয় কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নেই, নয়ত তা জড়েরই প্রকারভেদ মাত্র। সুতরাং জড়বাদে ধর্মের কোন স্থান নেই।

ধর্ম মানুষের মনুষ্যত্বকে ধারণ করে। মানুষের মহত্তর গুণাবলীর বিকাশের জন্য ধর্মের প্রয়োজনীয়তা আছে। কাজেই ধর্মকে অস্বীকার করলে মনুষ্যত্বকেই অস্বীকার করতে হয়। সুতরাং ধর্ম-অস্বীকারবাদী জড়বাদকে কখনই শ্রদ্ধার আসনে বসান যায় না।

জড়বাদ ও সত্য

জড়বাদীরা মনে করেন, যা জীবনের প্রয়োজনে আসে তা-ই সত্য। অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব দিয়েই সত্যের বিচার করতে হয়। আমরা অষ্টম অধ্যায়ে সত্যের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে দেখেছি যে, জীবনের প্রয়োজনে আসা আর সত্য এক কথা নয়। এমন অনেক সত্যই আছে যা জীবনের কোন প্রয়োজনেই আসে না। কিন্তু সেজন্য তারা সত্য নয়, এমন কথা বলা যায় না। কারও কারও মতে যা প্রয়োজনে আসে তা অতি তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বস্তু মাত্র; যা মূল্যবান তা কখনই প্রয়োজনের মালিন্যে মলিন হয় না। সুতরাং জড়বাদীর সত্যের স্বরূপব্যাখ্যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

সর্বশেষ জড়বাদের যান্ত্রিক কার্যের বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন করে এই আলোচনার উপসংহার করা যেতে পারে। জড়বাদীদের মতে এই দুনিয়ার

১। Hedonism

সমস্ত কাজই যান্ত্রিকভাবে হয়ে যাচ্ছে। এখানে উদ্দেশ্য, আদর্শ বা বিচার বিবেচনার কোন স্থান নেই। যন্ত্রের মত নির্দিষ্ট গতিতে বিশ্বের কারখানায় কাজ চলেছে। এখানে কোন চিন্তা বা যুক্তির অবকাশ নেই।

আমাদের মনে হয়, দুনিয়াটা নির্বোধ জড়ের খেলা নয়। বিশ্বপ্রকৃতির দিকে তাকালেই এর সৌন্দর্য, মাধুর্য ও গঠনসৌষ্ঠব আমাদের একান্তভাবেই অভিভূত করে। মনে হয় যেখানে যে জিনিসটি দরকার কে যেন সযত্নে সেই জিনিসটি সেখানে সাজিয়ে রেখেছে। আকাশের নীলিমা, গাছের সজীব সবুজ রঙ, সাগরের তরঙ্গমালা, পর্বতের আন্দোলিত গাত্রতট—সবই যেন কোন এক বিরাট শিল্পীর সৃষ্টি। জড় কখনও যান্ত্রিকভাবে এই সুন্দরী ধরণী সৃষ্টি করতে পারে না। ধরণীর স্রষ্টা নিশ্চয়ই কোন চিন্ময় পুরুষ। তাঁর বুদ্ধি ও পরিকল্পনার প্রকাশ জগতের প্রতিটি জিনিসেই লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং জড়বাদীদের যান্ত্রিকতা দুনিয়ার ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে না।

নিসর্গবাদ বা স্বভাববাদ (Naturalism)

আধুনিক কালে জড়বাদ অনেকক্ষেত্রেই নিসর্গবাদ বা স্বভাববাদ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রাচীন জড়বাদীদের মত নিসর্গবাদীরা দুনিয়ার সব কিছুই নিছক জড়ের রূপান্তর বলে মনে করেন না। প্রাচীন জড়বাদীরা জড়কেই সব চেয়ে বেশী প্রাধান্য দেন। নিসর্গবাদীদের মতে শক্তি[১], গতি[২], প্রাকৃতিক নিয়ম[৩] ও কার্যকারণ সম্পর্ক জড়ের চেয়ে কোন অংশে কম প্রয়োজনীয় নয়।

অত্যন্ত আধুনিক কালে নিসর্গবাদীরা প্রাণ ও মনের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে, জড় থেকে যখন প্রাণের অভিব্যক্তি হয় তখন একটা নূতন গুণের উন্মেষ হয়। আবার প্রাণ থেকে যখন মনের উদয় হয়, তখনও এক নূতন গুণের উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিয়ে দিলে যে জল হয় তাতে তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষমতারূপ এক নূতন গুণের উদ্ভব হয়। এই গুণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন কারও মধ্যেই নেই। ঠিক তেমনি জড় থেকে নূতন নূতন গুণের উদ্ভব হয়ে থাকে। প্রাণ ও মন উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন নূতন গুণের আবির্ভাবেই সম্ভব হয়েছে।

১। Energy
২। Motion
৩। Natural Law

নিসর্গবাদ আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলোরও সহজ স্বীকৃতি দিয়েছে। তার ফলে নিসর্গবাদ প্রাচীন জড়বাদের চেয়ে অনেক বেশী উদার ও মোহমুক্ত হয়ে উঠেছে। জানি না অনাগত কালে নিসর্গবাদ আরও বেশী উদার হয়ে 'অধ্যাত্মবাদের[১] কাছাকাছি এসে দাঁড়াবে কি না। যা এখনও চোখের আড়ালে তার সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভালো। সময়মত কাল তার রায়[২] দেবেই। কালের সেই অভিমতের জন্য নির্মোহ মন নিয়ে প্রতীক্ষাই হোক আমাদের প্রার্থনা।

১। Spiritualism
২। Verdict

দশম অধ্যায়

জীবন ও প্রাণ (Life)

দুনিয়ায় আমরা যে সমস্ত জিনিস দেখি তাদের মধ্যে কতগুলো সজীব আর কতগুলো নির্জীব। নির্জীব বস্তু বা জড়ের প্রকৃতি আমরা আলোচনা করেছি। এখন আমরা জীবন বা প্রাণের প্রকৃতি আলোচনা করব।

প্রাণের প্রকৃতি যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে বোঝানো যেতে পারে।

যন্ত্র ও জীবদেহ (Mechanism and Organism)

(ক) সামঞ্জস্য ঃ

(১) যন্ত্রের মতই জীবদেহ কতগুলো অঙ্গের সমষ্টি। যন্ত্রের মধ্যে যেমন বিভিন্ন অঙ্গ পরস্পর এক বিশেষ সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে, জীবদেহও তেমনি বিভিন্ন অঙ্গের এক বিশেষ সমাবেশের ফলেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। (২) জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মতই এক সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরস্পর সন্নিবিষ্ট হয়। কোন বিশেষ যন্ত্র যে বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নির্মিত হয় তার সমস্ত অংশগুলোকেই সেই উদ্দেশ্যকে সার্থক ক'রে তোলার জন্য এক বিশেষ নিয়মে পরস্পর সম্পর্কিত হতে দেখা যায়। জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-গুলোও তেমনি এক সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই একত্র সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকে।

জীবদেহের সঙ্গে যন্ত্রের মিলগুলো আলোচনা করা হল। এবার আমর তাদের পার্থক্যগুলো আলোচনা করব।

(খ) অসামঞ্জস্য ঃ

(১) যন্ত্র মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষ নিজের বুদ্ধিকৌশলে যন্ত্র তৈরী করে। কিন্তু কোন জীবদেহ তৈরী করার ক্ষমতাই মানুষের নেই। জীবদেহ নৈসর্গিক প্রণালীতেই[১] গড়ে ওঠে। জীবদেহের বৃদ্ধিও মানুষের ওপর নির্ভর করে না। জীবদেহের বৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবেই নৈসর্গিক ব্যাপার। সাধারণতঃ জীবদেহ এমনিতেই বৃদ্ধি পায়।

১। Natural Process

(২) কোন যন্ত্রের সমগ্রতা তার অংশগুলোর ওপর নির্ভর করে। কোন একটা অংশ না থাকলে বা বিকল হলে সমগ্র যন্ত্রই বিকল হয়ে যায়। কিন্তু যন্ত্রের অংশগুলো সমগ্রের ওপর নির্ভর না করেও থাকতে পারে। যে-কোন যন্ত্রের যে-কোন অংশের পক্ষেই যন্ত্র ছাড়া এমনিতে থাকা অসম্ভব নয়। জীব-দেহের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। জীবদেহের সমগ্রতাই শুধু দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর নির্ভর করে না, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও দেহের সমগ্রতার ওপর নির্ভর করে। দেহের যে কোন অঙ্গ দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলে তা সম্পূর্ণভাবেই অকেজো হয়ে যায়। আবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ না থাকলে দেহ বলেও কিছু থাকতে পারে না। সুতরাং যন্ত্রের সঙ্গে জীবদেহের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

(৩) যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলোকে একত্র করলেই যন্ত্র পূর্ণাঙ্গ ও কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবদেহের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অঙ্গ একত্র করলে জীবদেহের পূর্ণতা বা কর্মক্ষমতা কিছুই পাওয়া যায় না। জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ দেহের সমগ্রতার মাধ্যমেই সার্থক হয়ে ওঠে। কিন্তু যন্ত্রের পূর্ণতা অংশগুলোর পারস্পরিক বিন্যাসেই লাভ করা যেতে পারে।

(৪) যন্ত্রী যন্ত্র পরিচালনা করেন। যন্ত্রী না হলে যন্ত্র চলে না। কিন্তু যন্ত্রী যন্ত্রের কোন অংশ বা অঙ্গ নয়। যন্ত্রের ভেতরে যন্ত্রীর কোন স্থান নেই। দেহ দেহীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহী দেহের ভেতরই থাকে। সুতরাং দেহের পরিচালনার জন্য কোন বহিঃস্থিত যন্ত্রীর দরকার হয় না।

(৫) যন্ত্রের নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য নেই। মানুষের কোন না কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই যন্ত্র নির্মিত হয়ে থাকে। দেহ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে নিজের উদ্দেশ্যই ধীরে ধীরে সফল ক'রে তোলে। সুতরাং কোন মানুষকে খুশী বা তৃপ্ত করা দেহের উদ্দেশ্য নয়। দেহের উদ্দেশ্য একান্তভাবেই আত্মগত।[১]

(৬) যন্ত্রের আত্মনিয়ন্ত্রণ বা আত্মসংবর্ধনের কোন ক্ষমতা নেই। যন্ত্র সম্পূর্ণভাবেই যন্ত্রীর অধীন। কিন্তু জীবদেহের আত্মনিয়ন্ত্রণ বা আত্মসংবর্ধনের ক্ষমতা আছে। জীবদেহ বাইরে থেকে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ ক'রে আপনিই বৃদ্ধি পেতে থাকে। যন্ত্রের সেই ক্ষমতা আদৌ নেই।

(৭) যন্ত্রের বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা নেই। যে-কোন জীবদেহেরই সেই

১। Internal

ক্ষমতা আছে। যে-কোন জীবই প্রজনন-ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু যন্ত্রের বেলায় এই ক্ষমতার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ওপরের এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, যন্ত্রের সঙ্গে জীবদেহের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। জীবের এমন কতগুলো ক্ষমতা আছে, যা নির্জীব যন্ত্রের নেই। সুতরাং জীবদেহকে কোন জটিল যন্ত্র বলা যুক্তি-সঙ্গত হতে পারে না। জীবন বা প্রাণ জীবদেহের সঞ্জীবনী শক্তি। জীবন বা প্রাণ না থাকলে জীবদেহের কোন তাৎপর্যই থাকে না। যন্ত্রের কোন জীবন বা প্রাণ নেই। এখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে—এই জীবন বা প্রাণের প্রকৃতি কি ?

প্রাণের প্রকৃতি (The Nature of Life)

প্রাণের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। জড়বাদী ও যন্ত্রবাদী দার্শনিকদের[১] মতে, জীবদেহ এক জটিল যন্ত্র বিশেষ। বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া[২] জীবকোষ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন জীবকোষ একত্র সন্নিবিষ্ট হলে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একত্র সন্নিবিষ্ট বলেই জীবদেহের উৎপত্তি হয়। সুতরাং জীবদেহ বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ারই সৃষ্টি। জীবদেহে 'প্রাণশক্তি'[৩] বলে নূতন কিছু নেই। অজৈব পদার্থ ও জীবের মধ্যে কোন গুণগত বা প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই। জীব সাধারণ অজৈব পদার্থ থেকে জটিলতর মাত্র। জীবের গঠনভঙ্গীর জটিলতা ও সূক্ষ্মতা সাধারণতঃ কোন অজৈব পদার্থে দেখা যায় না। সুতরাং জীব ও অজৈব পদার্থের পার্থক্য মাত্রাগত পার্থক্য মাত্র[৪]। বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াই জীবের সৃষ্টি করে। জীব সম্বন্ধে এই মতবাদ যন্ত্রবাদ[৫] নামে পরিচিত।

প্রাণবাদীদের[৬] মতে জীবদেহ জটিল যন্ত্র মাত্র নয়। জীবের জটিলতাই অজৈব পদার্থের সঙ্গে জীবের একমাত্র পার্থক্যও নয়। জীব অজৈব পদার্থ থেকে সম্পূর্ণভাবেই স্বতন্ত্র। জীবের মধ্যে এমন কতগুলো বিশেষত্ব আছে, যা কোন অজৈব পদার্থেই নেই। সুতরাং কোন ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া দিয়েই জীবের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা যায় না। 'প্রাণশক্তি' নামে

১। Materialists and Mechanists
২। Physical and chemical forces
৩। Vital force
৪। Quantitative
৫। Mechanism
৬। Vitalists

এক নূতন শক্তি দিয়েই জীবনকে ব্যাখ্যা করা যায়। এই মতবাদের নাম প্রাণবাদ[১]

প্রাণবাদের প্রথম প্রকাশ আমরা গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটলের লেখার মধ্যে পাই। পরবর্তী কালে মধ্যযুগে এই মতবাদের প্রচণ্ড প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। এই মতানুসারে 'প্রাণতত্ত্ব'[২] নামে এক নূতন তত্ত্ব থেকেই প্রাণের উৎপত্তি। কোন পরীক্ষণের[৩] মধ্যেই এই প্রাণতত্ত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এই তত্ত্ব জড় থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং জড়বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে এই তত্ত্বের কোন আলোচনা হতে পারে না।

আর পরবর্তী কালে জার্মান জীববিদ্যাবিদ্[৪] ড্রিস্ (Driesch) পরীক্ষণ-মূলক প্রমাণের সাহায্য নিয়ে নূতন করে প্রাণবাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর মতে জৈবিক প্রক্রিয়া আর যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। জৈবিক প্রক্রিয়া কোন ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় না। জীবের গঠনভঙ্গিমা আর যন্ত্রের গঠনভঙ্গিমার মধ্যেও মৌলিক পার্থক্য[৫] আছে। সুতরাং জীবকে একটি যন্ত্র বলা যায় না; জীবনের কোন যান্ত্রিক ব্যাখ্যাও সম্ভব নয়। একমাত্র প্রাণতত্ত্ব দিয়েই জীবনের ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ড্রিস্ কখনও কখনও এই প্রাণতত্ত্বকে এক মনস্তত্ত্ব[৬] বলেও পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে, এই মনস্তত্ত্বই জীবদেহের বিশিষ্ট গঠনভঙ্গিমার জন্য দায়ী।

জীবনের প্রকৃতি সম্বন্ধে যন্ত্রবাদ ও প্রাণবাদের এই দ্বন্দ্ব বহুকাল ধ'রে চলে এসেছে। আমরা এখন যন্ত্রবাদ ও প্রাণবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেওয়া হয়, তা আলোচনা ক'রে নিজেদের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করব।

যন্ত্রবাদ বনাম প্রাণবাদ (Mechanism vs. Vitalism)

যন্ত্রবাদীরা নিজেদের বক্তব্যের পক্ষে একাধিক যুক্তি দিয়েছেন। আমরা এখন তাঁদের যুক্তিগুলো আলোচনা করব।

(ক) যন্ত্রবাদীরা মনে করেন, জীবন বা প্রাণ কোন রহস্যজনক বস্তু নয়। যদি প্রাণীর জীবন ধারণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা

১। Vitalism
২। Vital principle
৩। Experimentation
৪। Biologist
৫। Fundamental difference
৬। Psychoid

করা যায, তবেই জীবন বা প্রাণের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। যেহেতু প্রাণ কোন রহস্যজনক বস্তু নয, সুতরাং প্রাণের ব্যাখ্যার জন্য কোন রহস্যজনক তত্ত্বের স্বীকৃতি সম্পূর্ণ অর্থহীন।

(খ) জীববিদ্যার[১] অগ্রগতির ফলে একাধিক জৈবিক প্রক্রিযাই[২] এখন যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায। ইন্দ্রিয সংক্ষোভের[৩] সঙ্গে সংবেদনের[৪] সম্পর্ক, বিভিন্ন মাংসপেশার বৃদ্ধি প্রভৃতি জৈবিক ব্যাপার এখন মোটামুটি যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায। কিছুদিন আগেও মানুষ এই জাতীয ব্যাখ্যার কথা ভাবতে পাবত না। সুতরাং যদিও অনেক জৈবিক প্রক্রিযাই এখনও যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যাত হযনি, তবু আশা করা যায জীববিদ্যার আরও অগ্রগতির ফলে তা অদূর ভবিষ্যতেই সম্ভব হবে।

(গ) বিজ্ঞান সাধারণতঃ যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই[৫] যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করে। আজকেব দিনে পদার্থবিদ্যা ও রসাযনশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হযেছে। এই উন্নতি যান্ত্রিক ব্যাখ্যার উপব নিভর ক'রেই সম্ভব হযেছে। সুতরাং আশা করা যায, অন্য সার্থক বিজ্ঞানও ব্যাখ্যাব'জন্য এই পদ্ধতিই ব্যবহার করবে। জীববিদ্যা জীব নিযে আলোচনা করে। জীবনের গতি-প্রকৃতির যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই তার অগ্রগতি সূচনা করবে। সুতরাং জীবনের ব্যাখ্যা যান্ত্রিক হওয়াই স্বাভাবিক।

(ঘ) বিজ্ঞানীরা দুবোধ্যকে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেন। তাঁদের ধারণা, কোন জিনিসের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিতে পারলেই তা সহজবোধ্য হয। জীবের বিভিন্ন প্রক্রিযার একমাত্র যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই তাদের সহজবোধ্য করতে পারে। সুতরাং জীবনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই বিজ্ঞানের আদর্শ হওযা উচিত। যন্ত্রবাদীদের এই সমস্ত যুক্তির বিপক্ষেই যুক্তি উত্থাপন করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ, যন্ত্রবাদীদের প্রথম যুক্তিব মধ্যে যথেষ্ট সত্যতাই আছে। সত্যিই জীবন কোন রহস্যজনক বস্তু নয। কিন্তু একথা ত' একমাত্র যন্ত্রবাদীদের বক্তব্যই সমর্থন করে না। প্রাণবাদীরা কখনই জীবনকে রহস্যজনক বলে মনে করেন না। তাঁদের ধারণা, জড়ের সঙ্গে জীবনের মৌলিক পার্থক্য আছে। আমরা যন্ত্র ও জীবদেহের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনাপ্রসঙ্গে একথার সত্যতা লক্ষ্য করেছি। জড থেকে জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন বলেই জীবনকে রহস্যজনক বলা

১। Biology
২। Vital functions
৩। Stimulus
৪। Sensation
৫। Mechanical explanation

যায় না। একমাত্র জড়ই রহস্যজনক নয়, একথার পক্ষে কোন সুযুক্তি পাওয়া যাবে না। সুতরাং যন্ত্রবাদীদের প্রথম যুক্তি একমাত্র তাঁদের বক্তব্যই সমর্থন করে না।

দ্বিতীয়তঃ, যন্ত্রবাদীদের দ্বিতীয় যুক্তি আপাতদৃষ্টিতে খুব জোরালো বলেই মনে হয়। সত্যিই যদি জীববিদ্যা বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়ার যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে, তবে অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত জৈবিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যাই যান্ত্রিক হবে—এমন ভাবা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের পূর্ণ ব্যাখ্যা যান্ত্রিক ভাবে না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ত' জীবনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব, এমন কথা জোর ক'রে বলা যায় না। জীবনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব হবে—এ ত' আমাদের একটা বিশ্বাসমাত্র। বিশ্বাস ত' কোন যুক্তি নয়। সুতরাং জীবনের পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব, এমন কথা বলার সময় এখনও আসে নি। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে সময় না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিচারবাদী মানুষের পক্ষে চুপ করে থাকাই উচিত।

তৃতীয়তঃ, যন্ত্রবাদীদের শেষ দুটি যুক্তিকে আদৌ সঙ্গত বলে মনে হয় না। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, কোন বস্তুর যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিতে পারলেই তা সহজ-বোধ্য হয়, তবে একথা মানতেই হবে যে জীবনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়াকে সহজবোধ্য করবে। কিন্তু, আমাদের মনে হয়, বস্তুর একমাত্র যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই বস্তুকে সহজবোধ্য করে, এ একটা বিশ্বাস মাত্র। এই বিশ্বাসের যৌক্তিকতা প্রমাণ-সাপেক্ষ। যন্ত্রবাদীরা এই বিশ্বাসের পক্ষে কোন যুক্তি দেন না। সুতরাং যন্ত্রবাদীদের কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

সর্বশেষ বলা হয়েছে, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা ব্যাখ্যায় যান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, সুতরাং জীববিদ্যাও যান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করবে। এই উপমা[১] মোটেই যুক্তিযুক্ত হয়নি। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার আলোচ্য বস্তুর সঙ্গে জীববিদ্যার আলোচ্য বস্তুর এমনই মৌলিক পার্থক্য যে, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-বিদ্যার পদ্ধতি[২] কখনই জীববিদ্যার পদ্ধতি হ'তে পারে না। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার একটি শাখার আলোচ্য বস্তু নির্জীব বা জড়। জীববিদ্যার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—প্রাণ বা জীবন। প্রাণের সঙ্গে জড়ের মৌলিক পার্থক্যের পরিচয় যন্ত্র ও জীবদেহের সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গেই আমরা লক্ষ্য করেছি। সুতরাং যন্ত্রবাদীদের এই যুক্তি এখন আর গ্রহণ করা যায় না।

১। Analogy ২। Method

যন্ত্রবাদীদের সপক্ষের যুক্তিগুলো যে অকাট্য নয়, তার পরিচয় পাওয়া গেল। এখন আমরা প্রাণবাদীদের স্বমত প্রতিষ্ঠার পক্ষের যুক্তিগুলো বিচার ক'রে দেখব।

(ক) প্রাণবাদীদের মতে, জীবের গঠনবৈচিত্র্য কোন যন্ত্রে লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং জীবনের কোন যান্ত্রিক ব্যাখ্যাও সম্ভব নয়। জীবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোন যান্ত্রিক সম্পর্ক[১] নেই। এদের সম্পর্ক একান্তভাবেই নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য। আমরা যন্ত্রের সঙ্গে জীবদেহের সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে একথার সত্যতা লক্ষ্য করেছি। সুতরাং এখানে আর এই বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। যন্ত্রের নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য নেই। যন্ত্র যন্ত্রীর উদ্দেশ্যই সার্থক ক'রে তোলে। জীব তার সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করে। সুতরাং এই দিক থেকেও জড় ও জীবের পার্থক্য সুস্পষ্ট। কাজেই জীবনের কোন যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

(খ) কোন একটা বিশেষ অবস্থায় প্রাণী কি করবে তা আগে থেকেই বলে দেওয়া যায় না। কিন্তু জড়ের ভবিষ্যৎ কাযক্রম আগেই বলে দেওয়া যায়। প্রাণীর কর্মপ্রণালীর মধ্যে স্বাধীনতা আছে। জড়ের কোন স্বাধীনতা নেই। জড় বস্তুকে আমরা যখন যে ভাবে রাখি তখন তা সে ভাবেই থাকে। কিন্তু প্রাণী স্বেচ্ছায় স্থান পরিবর্তন করতে পারে। সুতরাং প্রাণীকে কখনই একটা যন্ত্র বলে ভাবা যায় না। কাজেই প্রাণের কোন যান্ত্রিক ব্যাখ্যাও হতে পারে না।

(গ) আধুনিক কালে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে শ্বাস-প্রশ্বাসের মত কতগুলো জৈবিক প্রক্রিয়ার কোন যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। সুতরাং জীবনের সমস্ত প্রক্রিয়াই যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, এমন কথা এখন আর বলা যায় না।

(ঘ) চঞ্চলতা বা গতি জীবনের স্বরূপ লক্ষণ। গতি না থাকলে জীবনও থাকতে পারে না। জড়ের কোন নিজস্ব গতি নেই। সাধারণতঃ জড় নিশ্চল। চঞ্চলতা ও নিশ্চলতা সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম। সুতরাং নিশ্চল জড়ের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা কখনই চলমান প্রাণের বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে না।

প্রাণবাদীরা জীবনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি দিয়েছেন, তা খণ্ডন করা যায় না। সত্যিই জীবের গঠনবৈচিত্র্য যন্ত্র থেকে এমনই পৃথক যে,

---

১। Mechanical relation

জীবনের কোন যান্ত্রিক ব্যাখ্যার কথা ভাবাই যায় না। জীবের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু জড়ের কোন স্বাধীনতা নেই। সুতরাং জড় ও জীব সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের। কাজেই জড়ের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা কখনই জীবনেরও ব্যাখ্যা হতে পারে না। প্রাণবাদীদের তৃতীয় যুক্তি যন্ত্রবাদীদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে চরম আঘাত দিয়েছে। যদি শ্বাস-প্রশ্বাসের মত কতগুলো জৈবিক প্রক্রিয়া কখনই যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা না করা যায়, তবে জীবনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যার কোন কথাই উঠতে পারে না। প্রাণবাদীদের চতুর্থ যুক্তিও আমাদের অত্যন্ত সঙ্গত বলে মনে হয়। চলমান জীবনের সঙ্গে নিশ্চল জড়ের কোন মৌলিক ঐক্যই থাকতে পারে না। সুতরাং জীবনের কোন যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়।

ওপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জীবনের কোন যন্ত্রবাদ-সম্মত ব্যাখ্যাই হতে পারে না। প্রাণবাদীরা জড় থেকে জীবনের পার্থক্য দেখিয়ে দিয়ে খুব সঙ্গত কাজই করেছেন। কিন্তু প্রাণবাদীরা এই পার্থক্যের যে রহস্য-জনক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা আমরা গ্রহণ করতে পারি না। প্রাণবাদীরা বলেন, প্রাণতত্ত্বই এই পার্থক্যের জন্য দায়ী। তাঁদের এই কথা সাধন-গ্রহণ-দোষ-দুষ্ট[১]। প্রাণবাদীরা যা প্রমাণ বা সাধন করতে চান তা আগেই ধরে নিয়েছেন। প্রাণের স্বাতন্ত্র্য প্রাণতত্ত্বের জন্যই হয়েছে, একথায় আমাদের জিজ্ঞাসার কোন উত্তর মেলে না। আমরা ত' প্রাণের স্বাতন্ত্র্যের কারণই জানতে চাই। এক্ষেত্রে প্রাণের জন্যই প্রাণের স্বাতন্ত্র্য হয় বললে আসলে প্রশ্নের কোন উত্তরই পাওয়া যায় না। প্রাণবাদী ড্রিস বলেন, মনস্তত্ত্বই[২] প্রাণীর বিশেষ গঠনভঙ্গিমার জন্য দায়ী। কিন্তু কোন পরীক্ষাতেই এই মনস্তত্ত্বের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং ড্রিসের ব্যাখ্যাই বা গ্রহণযোগ্য হবে কি ক'রে?

সিদ্ধান্ত: প্রাণের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। কিন্তু প্রাণতত্ত্ব বা মনস্তত্ত্ব দিয়ে এই বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায় না তাহলে প্রশ্ন উঠে—প্রাণের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায় কি ক'রে? এর উত্তরে হর্ণলি (Hoernle) যা বলেছেন, তা-ই আমাদের কাছে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন, যন্ত্রবাদ ও উদ্দেশ্য-বাদের[৩] সমন্বয়েই প্রাণের ব্যাখ্যা সম্ভব। তাঁর মতে যন্ত্রবাদ ও উদ্দেশ্যবাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। উদ্দেশ্যবাদসিদ্ধ ব্যাখ্যায় কোন রহস্যজনক বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। উদ্দেশ্যবাদীরা জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিন্যাসের মধ্যে একটা উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। হর্ণলি মনে করেন, জীবের গঠনভঙ্গিমায়

১। Involves the fallacy of petitio principii.

২। Psychoid

৩। Teleology

এই উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। পদার্থবিদ্যায় ও রসায়নশাস্ত্রে যে পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়, জীববিদ্যায় সেই পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া যায় না। জীববিদ্যার আলোচ্য বিষয় জীবন পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের আলোচ্য জড়ের চেয়ে উচ্চস্তরের। সুতরাং জীবনের ব্যাখ্যার জন্য কোন উচ্চস্তরের পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার। উদ্দেশ্যমূলক কারণের[১] অস্তিত্বই জীবনের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের জন্য দায়ী। সুতরাং উদ্দেশ্যমূলক কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করলেই আমরা প্রাণের ব্যাখ্যার সার্থক পদ্ধতি লাভ করতে পারি।

জীবকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে কতগুলো ভৌত ও রাসায়নিক পদার্থই[২] পাওয়া যাবে। কিন্তু এই পদার্থগুলো যান্ত্রিকভাবে পরস্পর সংযুক্ত নয়। এদের সংযোগ-প্রক্রিয়ায় এক বিশেষ উদ্দেশ্যের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই পদার্থগুলো এমনভাবে সংযুক্ত হয় যাতে এরা সমগ্র জীবদেহের পরিপুষ্টি ও সম্বর্ধনের পরিপূর্ণ সহায়ক হয়ে ওঠে। সমগ্র দেহের পরিপুষ্টি ও সম্বর্ধনই বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক পদার্থগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য। এই বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই জীব তার বৈশিষ্ট্য লাভ করে। জীবদেহে এই উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব আছে বলেই শ্বাসপ্রশ্বাস, আন্তর বৃদ্ধি,[৩] বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলো সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। কোন একটা বিশেষ অঙ্গের ব্যবহারকে আমরা যান্ত্রিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। কিন্তু সমগ্র দেহের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন অঙ্গের ব্যবহার যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই ব্যাখ্যার জন্য উদ্দেশ্যমূলক কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। সমস্ত জীবই এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সমানভাবে সচেতন নয়। সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই এই উদ্দেশ্য-কারণের অস্তিত্ব সমান মাত্রাতেও দেখা যায় না। মানুষ প্রভৃতি উচ্চস্তরের প্রাণীর মধ্যে এই উদ্দেশ্য-কারণের অস্তিত্ব সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায়। মানুষ এই উদ্দেশ্য-কারণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতনও বটে। উদ্ভিদের মধ্যে উদ্দেশ্য-কারণের অস্তিত্ব সবচেয়ে কম। উদ্ভিদ এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতনও নয়। সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, যন্ত্রবাদীদের ভৌত ও রাসায়নিক পদার্থের এক উদ্দেশ্যমূলক বিন্যাসের ফলেই প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। যন্ত্রবাদ ও প্রাণবাদের অতিরিক্ত আতিশয্য কখনই যুক্তিযুক্ত নয়। প্রাণীতে যন্ত্রবাদীদের ভৌত ও রাসায়নিক

১। Teleological Cause

২। Physico-chemical Substances

৩। Growth from within

প্রক্রিয়াও উদ্দেশ্যবাদীদের উদ্দেশ্য—উভয়েরই অস্তিত্ব আছে। জড় থেকে প্রাণীর স্বাতন্ত্র্য প্রাণীর মধ্যে উদ্দেশ্যমূলক কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করলেই সহজে ব্যাখ্যা করা যায়।

জীবনের উৎস (Origin of Life)

জীবনের প্রকৃতি আলোচনা করা গেল। এখন জীবনের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করতে হবে। জীবনের আবির্ভাব কি করে হ'ল—এই ত প্রশ্ন। দুই দলের দার্শনিক এই প্রশ্নের দু'রকম উত্তর দিয়েছেন। কারও কারও মতে জীব থেকেই জীবের সৃষ্টি হয়। জীবন থেকেই জীবন আসে। এই মতবাদকে জীবজনি[১] তত্ত্ব বলা হয়। আর একদল দার্শনিকের মতে অজৈব পদার্থ থেকেই অভিব্যক্তির ক্রমবিকাশের ফলে জীব বা জীবনের উৎপত্তি হয়েছে। এই মতবাদের নাম অজীবজনি[২] তত্ত্ব।

আমাদের মনে হয়, অজৈব পদার্থ থেকে জীবনের উৎপত্তি হতে পারে না। অজৈব পদার্থের সঙ্গে জীবের মৌলিক পার্থক্য আমরা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই আলোচনা করেছি। সুতরাং অজৈব পদার্থ থেকে জীবনের উৎপত্তির কথা স্বীকার করা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে ডাঃ পাস্টুর ও ডাঃ লিস্টার যে পরীক্ষাকার্য পরিচালনা করেছিলেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। ডাঃ পাস্টুর ও ডাঃ লিস্টার জল সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করে একটা বোতলে রেখে দিয়েছিলেন। অনেক কাল রেখে দেওয়ার পরও তাতে কোন জীবাণুর উৎপত্তি হয়নি। সুতরাং অজৈব পদার্থ থেকে জীব হয় একথা ডাঃ পাস্টুর ও ডাঃ লিস্টারের পরীক্ষা কার্যের পর আর বিশ্বাস করা যায় না। যদি অজৈব পদার্থ থেকে জীব হ'ত, তা' হ'লে নিশ্চয়ই জীবাণুমুক্ত জলে জীবাণুর উদ্ভব হ'ত। সুতরাং জীব থেকেই জীব আসে, জীবনের উদ্ভব হয়—একথাই মানতে হবে। আমাদের অভিজ্ঞতায়ও ত' জীব থেকেই জীবের উৎপত্তি দেখতে পাই। কাজেই জীবের উৎপত্তি প্রসঙ্গে জীবজনি তত্ত্বই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

১। Biogenesis

২। A-biogenesis

একাদশ অধ্যায়

অভিব্যক্তিবাদ

(The Theory of Evolution)

অভিব্যক্তি বলতে যা অব্যক্ত, অপ্রকাশিত ও প্রচ্ছন্ন তার ব্যক্তি, প্রকাশ ও প্রকটতা বোঝায়। যা অব্যক্ত, অপ্রকাশিত ও প্রচ্ছন্ন তা ধীর পরিবর্তনেব মধ্যে দিয়ে ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত, প্রকাশিত ও প্রকট হয়। সুতরাং অভিব্যক্তি ক্রমবিকাশ সূচনা করে। অভিব্যক্তিবাদের মতে জগতের প্রত্যেক জটিল বস্তুই সহজ ও সাধারণ অবস্থা থেকে সুরু করে ক্রমে ক্রমে জটিল হতে হতে বর্তমান অবস্থায এসে পৌছেছে। সরলতা থেকে বস্তুর জটিলতা ক্রমবিকাশের ফলেই লাভ করা যায। জগতের কোন বস্তুই হঠাৎ একদিনে হযনি। প্রত্যেক দ্রব্যের পেছনেই এক দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ইতিহাস বযেছে। বস্তুর অভিব্যক্তির কোন শেষ নেই। যা অপ্রকাশিত তা নূতন নূতন পথে আপনার বিচিত্র প্রকাশ খুঁজে পাচ্ছে। পরিবর্তনই অভিব্যক্তির গোড়ার কথা। সরল রূপ থেকে জটিল রূপে বস্তুর পরিণতি ও পরিবর্তনেব নামই অভিব্যক্তি।

বিপ্লবেও আমরা পরিণতি ও পরিবর্তন লক্ষ্য করি। কিন্তু বিপ্লবের পরিবর্তন আর অভিব্যক্তিবাদের পরিবর্তন এক রকমের নয়। বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্যে একটা আকস্মিকতা ও অস্বাভাবিকতা আছে। বিপ্লবের ফলে অস্বাভাবিক ও আকস্মিকভাবে সমাজেব বা জাতির এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায। অভিব্যক্তিতে কোন আকস্মিকতা বা অস্বাভাবিকতার স্থান নেই। ধীরে ধীরে পর পর বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিযে অভিব্যক্তির পরিবর্তন কাজ করে যায়। অভিব্যক্তির পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজভাবে ধীরে ধীরে গোপনে আপনার কাজ করে চলেছে। অভিব্যক্তির পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। অভিব্যক্তিতে হঠাৎ কিছু হয না। বিপ্লবে হঠাৎই একটা বিরাট পরিবর্তন এসে যায।

অভিব্যক্তির সঙ্গে বিপ্লবের আর একটা পার্থক্যও লক্ষ্য করার মত। অভিব্যক্তি সম্পূর্ণভাবেই নৈসর্গিক ব্যাপার। অভিব্যক্তিতে মানুষের কিছুই করবার নেই। মানুষ অভিব্যক্তির দ্রষ্টা বা বিষয় হতে পারে। কিন্তু মানুষ কখনই অভিব্যক্তির প্রযোজক নয়। মনুষ্যেতর বস্তুর অভিব্যক্তি মানুষ লক্ষ্য করে। সুতরাং মানুষ অভিব্যক্তির দ্রষ্টা। কিন্তু পরিবর্তনের মধ্যে

দিয়ে মনুষ্যজাতির অভিব্যক্তি ঘটে চলেছে। দেশে দেশে, যুগে যুগে মানুষের এই অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং মানুষ অভিব্যক্তির বিষয়ও বটে। কিন্তু অভিব্যক্তির পরিবর্তনে মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নেই। সুতরাং মানুষ অভিব্যক্তির প্রযোজক নয়। বিপ্লব কোন নৈসর্গিক ব্যাপার হতে পারে না। মানুষই বিপ্লব সংঘটিত করে। ফরাসী বিপ্লব ও রুশ বিপ্লব —এই দুইই মানুষের সৃষ্টি। সুতরাং বিপ্লব আর অভিব্যক্তির প্রকৃতি একরকম হতে পারে না।

পশ্চিমের দর্শনে বহু প্রাচীন কালেই অভিব্যক্তিবাদের ক্ষীণ প্রকাশ লক্ষ করা যায়। গ্রীক দার্শনিক এম্পিডোক্লেস, ডোমাক্রাইটাস্ ও আরিস্টটলের চিন্তাধারার মধ্যে অভিব্যক্তিবাদের স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। এম্পিডোক্লেসের লেখা পড়লে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের[১] অস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ডেমোক্রাইটাস পরমাণু থেকে জগৎ উৎপত্তির কথা বলেছেন। এই উৎপত্তিকে অভিব্যক্তিও বলা যেতে পারে। আরিস্টটলেব দর্শনে বস্তুব অব্যক্ত অবস্থা থেকে ব্যক্ত অবস্থায় পরিবর্তনের ওপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। আরিস্টটল জীব নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তাতে আধুনিক অভিব্যক্তিবাদীদের জীবন সম্বন্ধে অনেক ধারণারই পরিচয় মেলে। অবশ্য অভিব্যক্তিবাদের পূর্ণপ্রকাশ লেমার্ক, লেপ্‌লেস্, ডারউইন প্রভৃতি মনীষীর লেখাতেই প্রথম দেখতে পাওয়া যায়। ডারউইনের দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'জাতির উৎপত্তি'[২] ও 'মনুষ্যের আবির্ভাব'[৩] চিন্তার জগতে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এই দুই গ্রন্থই আধুনিককালে অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অভিব্যক্তিবাদ তিন পর্যায়ে আলোচনা করা যেতে পারে—(১) জড়ের অভিব্যক্তি (Evolution of Matter), (২) প্রাণের অভিব্যক্তি (Evolution of Life) ও (৩) মনের অভিব্যক্তি (Evolution of Mind)। জড়, প্রাণ ও মন কি করে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে হতে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, অভিব্যক্তিবাদ প্রসঙ্গে এই আমাদের আলোচনার বিষয়।

অভিব্যক্তিবাদের সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্বের[৪] মৌলিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্বের মতে ঈশ্বর এক বিশেষ মুহূর্তে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কোন ক্রমিক বিকাশের

১। The Theory of Natural Selection

২। Origin of Species

৩। Descent of Man

৪। The Theory of Creation

পথেই জগতের সৃষ্টি হয় নি। সৃষ্টিতত্ত্বের এ কথা যদি সত্য হয় তবে অভিব্যক্তিবাদের কোন মূল্যই থাকে না। সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্বের খণ্ডনই অভিব্যক্তিবাদ আলোচনার পক্ষে প্রথম প্রয়োজন। আমরা প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করে পরে অভিব্যক্তিবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব।

সৃষ্টিতত্ত্ব (Theories of Creation)

সৃষ্টিতত্ত্বের মতে ঈশ্বর কোন এক বিশেষ মুহূর্তে নিজ ইচ্ছায় এই জগতের সৃষ্টি করেছেন। জগতের যাবতীয় বস্তুই একটি বিশেষ মুহূর্তে সৃষ্ট হয়েছে। আজ এই বস্তুগুলোর যে রূপ দেখছি, সৃষ্টির সময়ও তাদের সেই রূপই ছিল। সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত তাদের কোন বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।

জগৎ-সৃষ্টি দু'রকম ভাবে ভাবা যেতে পারে। যদি মনে করা যায় অন্য কিছুর ওপর নির্ভর না করে ঈশ্বর নিজে নিজেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তবে এই সৃষ্টিকে অন্যনিরপেক্ষ সৃষ্টি[১] বলতে হয়। আর যদি বলা যায় ঈশ্বর স্বতঃস্থিত উপাদান দিয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তবে এই তত্ত্বের নাম হবে সাপেক্ষ সৃষ্টি।[২]

অন্যনিরপেক্ষ সৃষ্টিতত্ত্ব (The theory of Absolute Creation)

এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর নিজের ইচ্ছায় অসৎ[৩] থেকে সতের সৃষ্টি করেছেন। এমন একদিন ছিল যখন ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পরিপূর্ণ পুরুষ ঈশ্বর জগতের কোন প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন নি। কিন্তু পরে একদিন ঈশ্বর তাঁর অনন্ত করুণা বর্ষণের জন্য জীবসৃষ্টির কথা ভাবলেন। যেই ভাবা অমনি কাজ। জগতের সৃষ্টি হল।

সাপেক্ষ সৃষ্টিতত্ত্ব (The theory of Conditional Creation)

এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে স্বতঃস্থিত উপাদানের সাহায্য নিয়েছেন। ঈশ্বর শিল্পীর মত স্বতঃস্থিত উপাদান গ্রহণ করে তা বিভিন্ন আকারে আকারিত করেছেন। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ। জগতের উপাদান কারণ ঈশ্বর নন, ঈশ্বর জগতের উপাদান-কারণের সৃষ্টিও করেন নি। ঈশ্বর ও জগতের উপাদান উভয়ই নিত্য। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় জগতের উপাদান অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে ছিল। ঈশ্বর তাতে শৃঙ্খলা এনে এই সুন্দর জগতের সৃষ্টি করেছেন।

১। Absolute Creation
২। Conditonal Creation
৩। Nothing

সাধারণভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব বলতে আমরা যা বুঝি নীচে তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর পরিচয় দেওয়া হল :

(১) বহুকাল যাবৎ ঈশ্বর একাকী ছিলেন ; জগৎ বলে কিছু ছিল না। ঈশ্বর পূর্ণপুরুষ বলে জগতের কোন প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন নি।

(২) হয় ঈশ্বর অন্য কিছুর সাহায্য না নিয়েই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, নয়ত স্বতঃস্থিত উপাদান গ্রহণ করে ঈশ্বর জগতের রূপ দিয়েছেন।

(৩) ঈশ্বর এক বিশেষ মুহূর্তে জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

(৪) জগৎ সৃষ্টির পর ঈশ্বর জগৎকে নিজের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। যখন খুব প্রয়োজন দেখা দেয় একমাত্র তখনই ঈশ্বর জাগতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। ঈশ্বর জগতের কোন অন্তঃস্থিত সত্তা নন, তিনি জগতের বাইরেই থাকেন।

সমালোচনা : সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে ঈশ্বরের জগতে কোন প্রয়োজন ছিল না। এখানে প্রশ্ন ওঠে—তবে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করলেন কেন ? উত্তরে বলা হয়, ঈশ্বর তাঁর অসীম করুণা বর্ষণের জন্যই এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এখানে আবার প্রশ্ন ওঠে—ঈশ্বরের অসীম করুণা বর্ষণের প্রয়োজন কি ? এর কোন সদুত্তর সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা দিতে পারেন না।

অন্যনিরপেক্ষ সৃষ্টিবাদে বলা হয়েছে, ঈশ্বর অসৎ থেকে সতের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অসৎ থেকে ত' সতের সৃষ্টি হতে পারে না। যদি যুক্তির খাতিরে একথার সত্যতা স্বীকার করেও নেওয়া হয়, তবু অসুবিধের শেষ হয় না। অসৎ যদি জগতের উপাদান-কারণ হয়, তবে জগৎও অসৎ হবে। কারণ, কার্যে কারণের স্বভাবই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু জগৎ অসৎ, এমন কথা ত' সাধারণতঃ কেউ বলেন না। সুতরাং অন্যনিরপেক্ষসৃষ্টিবাদের বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

যদি সাপেক্ষ সৃষ্টিবাদীদের মত মনে করা যায় যে, ঈশ্বর স্বতঃস্থিত উপাদান থেকে জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তবুও সমস্যার সমাধান হয় না। ঈশ্বর ছাড়া কোন স্বতঃস্থিত উপাদানের অস্তিত্ব স্বীকার করলে ঈশ্বরের অসীমতা স্বীকার করা যায় না। স্বতঃস্থিত উপাদান স্বতঃই ঈশ্বরকে সীমিত করে। কিন্তু আমরা জানি যে, ঈশ্বর অসীম। সুতরাং স্বতঃস্থিত উপাদান দিয়ে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এমন কথাও বলা যায় না।

জগৎ সৃষ্টির পর ঈশ্বর যদি জগৎকে নিজের ওপর ছেড়ে দেন, তা হলেও জগৎ ঈশ্বরকে সীমিত করবে। সুতরাং জগৎ-সৃষ্টির পর ঈশ্বর জগৎকে নিজের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, একথাও বলা যায় না।

তারপর ঈশ্বর কোন এক বিশেষ মুহূর্তে জগৎ সৃষ্টি করলেন কেন? এই বিশেষ মুহূর্তের আগে বা পরে জগৎ-সৃষ্টি হ'ল না কেন? এ সব প্রশ্নেরও কোন সদুত্তর দেওয়া যায় না।

সৃষ্টিতত্ত্বে বলা হয়েছে, প্রয়োজন দেখা দিলেই ঈশ্বর জাগতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু ঈশ্বর যদি নিখুঁত শিল্পী হন তবে তাঁর সৃষ্ট জগতে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবে কেন? সার্থক কারিকরের সৃষ্ট যন্ত্র ত' কখনও সংস্কারের অপেক্ষা রাখে না। আবার ঈশ্বর নিখুঁত শিল্পী নন, এমন কথাও ত' ভাবা যায় না। সুতরাং প্রয়োজন দেখা দিলেই ঈশ্বর জাগতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন, একথাই মানা যায় না।

ঈশ্বর যদি জগতের বাইরে থাকেন তবে ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের কোন আন্তরিক সম্পর্ক থাকতে পারে না। আর ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের যদি কোন আন্তরিক সম্পর্ক না থাকে, তবে ঈশ্বরকে পূর্ণপুরুষও বলা যায় না। ঈশ্বরাতিরিক্ত জগতের অস্তিত্ব ঈশ্বরের পূর্ণতা ব্যাহত করে। সুতরাং এই দিক থেকেও সৃষ্টি-তত্ত্বের এক চরম অসুবিধে আছে।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, কোন বিশেষ মুহূর্তে জগতের সৃষ্টি যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না। কতগুলো বিশেষ বিজ্ঞান স্পষ্টই প্রমাণ করেছে যে, বিভিন্ন জাগতিক দ্রব্য ক্রমবিকাশের ফলেই উৎপন্ন হয়েছে। সুতরাং জগতের উৎপত্তি-ব্যাপারে অভিব্যক্তিবাদই গ্রহণ করতে হবে।

অভিব্যক্তিবাদের পক্ষে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ

জ্যোতির্বিদ্যা ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা আলোচনা করলে অভিব্যক্তিবাদের পক্ষে অনেক যুক্তি পাওয়া যায়। জ্যোতির্বিদ্যা প্রমাণ করেছে যে, সৌরজগৎ একদিনে গড়ে ওঠেনি। বহু বৎসরের ক্রমোন্নতির ফলেই বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ আজকের রূপ পেয়েছে। একদিন গ্রহ-উপগ্রহগুলো তরল অগ্নিকুণ্ডের মত ছিল। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এদের তরলতা লুপ্ত হয়েছে। এখন এরা যথেষ্ট কঠিন হয়ে উঠেছে। আমাদের এই পৃথিবী একদিন তরল অগ্নির পিণ্ড ছিল। কালক্রমে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়েছে। উষ্ণতা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী কঠিন হয়েছে। পৃথিবীতে জলের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর ইতিহাস অভিব্যক্তিবাদেরই সমর্থন করে।

ভূবিদ্যায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্তর আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, পৃথিবী একদিন তরল অবস্থায় ছিল। আজকের এই কঠিন পৃথিবী

বহু যুগের পরিবর্তনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। কখনও কখনও পৃথিবীর মাঝের স্তরে জীবাশ্ম দেখতে পাওয়া যায়। এই জীবাশ্ম দেখে মনে হয়, একদিন এই স্তরই পৃথিবীর উপরিভাগে ছিল। কালক্রমে নানা পরিবর্তনের ফলে এই স্তর নীচে নেমে গেছে। যে সমস্ত জীবের মৃতদেহ এই স্তরে দেখতে পাওয়া যায় তারা এখন লুপ্ত হয়ে গেছে। ভূবিদ্যার এই সিদ্ধান্ত অভিব্যক্তিবাদের সত্যতা প্রমাণ করে।

জীববিদ্যা প্রমাণ করেছে যে, আজকের বিভিন্ন জাতি[১] অতীতের বিভিন্ন জাতি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। দেহতত্ত্ব[২] আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, বানরের দেহের সঙ্গে মানুষের দেহের অনেক সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য দেখে ডারউইন অনুমান করেছেন যে, কপিজাতি থেকে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মনুষ্য জাতির উদ্ভব হয়েছে।

সমাজ-বিজ্ঞানেও মানুষের বিশ্বাস, রীতিনীতি, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তনের বিবরণ পাওয়া যায়। মানুষের সমাজব্যবস্থা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। আজকের মনুষ্য সমাজের এই অবস্থা রাতারাতি হয়ে যায়নি। বহু তপস্যা, বহু বিবর্তন ও বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েই এর এই পরিণতি সম্ভব হয়েছে। সুতরাং জগতের সমস্ত ব্যাপারেই ধীর পরিবর্তন, ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিণতির কথা স্বীকার করতে হয়। কাজেই অভিব্যক্তিবাদ সত্য বলেই মানতে হবে।

অভিব্যক্তির মূল বৈশিষ্ট্য

অভিব্যক্তিবাদের মতে জগতের বর্তমান অবস্থা বহু পরিবর্তনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। এখানে প্রশ্ন ওঠে—অভিব্যক্তিবাদের মতে যে পরিবর্তন হয় তার বৈশিষ্ট্য কি? কংগার বলেন, কালিক পরিবর্তন, পারম্পর্য শৃঙ্খলা, অন্তর্নিহিত কারণ ও সৃজনমূলক সম্বাদ[৩] অভিব্যক্তির মূল বৈশিষ্ট্য। অভিব্যক্তিতে পরিবর্তন কালেই সংঘটিত হয়। কোন কালেই এর পরিবর্তনের শেষ নেই। অভিব্যক্তির প্রত্যেক পরিবর্তন আগের পরিবর্তনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে চলে। প্রত্যেক পূর্ববর্তী পরিবর্তনের সঙ্গে উত্তরবর্তী পরিবর্তনের নিবিড় সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। অভিব্যক্তিতে কোন পরিবর্তনই

১। Species

২। Anatomy

৩। কালিক পরিবর্তন (Change in time), পারম্পর্য-শৃঙ্খলা (Serial order) অন্তর্নিহিত কারণ (inherent cause) ও সৃজনমূলক সম্বাদ (Creative synthesis).

আকস্মিকভাবে হয় না। অভিব্যক্তিবাদের বিভিন্ন স্তরেই পরিবর্তনের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। অভিব্যক্তির কারণ অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার বাইরে থাকে না। অভিব্যক্তির মধ্যেই অভিব্যক্তির কারণ লুকিয়ে থাকে। অভিব্যক্তিতে পুরোনো জিনিসের সমন্বয়ে নূতন সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে নূতন একেবারেই নূতন নয়। পুরাতনের ভিত্তিতেই নূতনের সৌধ গড়ে ওঠে।

অভিব্যক্তিবাদের বিভিন্ন রূপ ঃ

আমরা আগেই বলেছি, অভিব্যক্তিবাদের আলোচনা করতে গেলেই জড়ের অভিব্যক্তি, প্রাণের অভিব্যক্তি ও মনের অভিব্যক্তি—এই তিন পর্যায়ে আলোচনা করতে হয়। বিভিন্ন দার্শনিক অভিব্যক্তি-ধারার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং অভিব্যক্তিবাদ আলোচনা করতে গেলে তার এই বিভিন্ন রূপগুলো আলোচনা করতে হয়। যন্ত্রবাদ (Mechanism), উদ্দেশ্যবাদ (Teleology), সৃজনবাদ (Creative Evolution) ও উন্মেষ-বাদ (Emergent Evolution) অভিব্যক্তিবাদের বিভিন্ন রূপ। আমরা পর পর এই সমস্ত বিভিন্ন মতগুলোর আলোচনা করব।

যন্ত্রবাদ (Mechanical Theory of Evolution)

যন্ত্রবাদ অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করে। যন্ত্রবাদ অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ায় কোন উদ্দেশ্য বা আদর্শের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। জড়বাদী ও নিসর্গবাদী দার্শনিকেরাই সাধারণতঃ অভিব্যক্তিবাদ বলতে যন্ত্রবাদ বোঝেন। এঁদের মতে জড়ই দুনিয়ার চরমতত্ত্ব। জড় ও গতি জগতের সমস্ত কিছুরই উৎপত্তির জন্য দায়ী। প্রাণ ও মন জড় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা নয়। প্রাণকে জড়ের জটিল প্রকাশ বলা যেতে পারে। জড়ের জটিলতম প্রকাশ মনেই পাওয়া যায়। জড় থেকেই প্রাণ ও মনের উৎপত্তি হয়েছে। সমস্ত উৎপত্তিই যান্ত্রিকভাবে হয়ে থাকে। কোন উৎপত্তিই উদ্দেশ্যমূলক নয়।

জড় থেকে কিভাবে প্রাণ ও মনের উৎপত্তি হয়েছে, এবিষয়ে সকলেই এক মত পোষণ করেন না। তার ফলে যন্ত্রবাদেরও বিভিন্ন রূপ দেখা দিয়েছে। হার্বার্ট স্পেন্সার জগতের উৎপত্তির এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ডারউইন, ল্যামার্ক, ল্যাপলেস, ভাইসম্যান প্রভৃতি মনীষীরা প্রাণের উৎপত্তির ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা তৈরী করেছেন। ডারউইন প্রভৃতি বিশেষভাবে প্রাণের অভিব্যক্তির কথাই বলেছেন। সেজন্য তাঁদের জৈবিক অভিব্যক্তি-

বাদী[১] নামে অভিহিত করা হয়। আমরা প্রথমে হার্বার্ট স্পেন্সারের মতবাদ আলোচনা করে পরে জৈবিক অভিব্যক্তিবাদীদের কথা আলোচনা করব।

স্পেন্সারের বিশ্বাভিব্যক্তি-বিষয়ক মতবাদ
(Spencer's Theory of Cosmic Evolution)

স্পেন্সার অভিব্যক্তিবাদ প্রসঙ্গে যন্ত্রবাদের সমর্থক। তাঁর মতে সমস্ত জগৎই এক বিরাট অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া বিশেষ। এই প্রক্রিয়া সব সময়েই সহজ থেকে জটিলে, অব্যাকৃত ও সমসাত্বিক অবস্থা থেকে ব্যাকৃত ও বিষমসাত্বিক অবস্থায়, অনির্দিষ্ট ও অসংবদ্ধ অবস্থা থেকে নির্দিষ্ট ও সংবদ্ধ অবস্থায় পরিচালিত হয়।[২] সমস্ত অভিব্যক্তিই ক্রমিক ও সুশৃঙ্খল পরিবর্তন সূচনা করে। স্পেন্সারের মতে অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ঐক্যবিধান (Concentration or Integration), ব্যাকৃতি (Differentiation) ও নিয়মানুগত্য (Determination)—এই তিনটি বৈশিষ্ট্য।

(১) ঐক্য বিধান (Concentration or Integration)

এই বিশ্বের আদিম উপাদান বিশৃঙ্খল অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে ছিল। অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ায় এই বিক্ষিপ্ত উপাদান একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক মণ্ডল রচনা করে। সুতরাং অভিব্যক্তির পথে ঐক্যবিধানই প্রথম প্রক্রিয়া।

(২) ব্যাকৃতি (Differentiation)

ঐক্যবিধানই অভিব্যক্তির একমাত্র প্রক্রিয়া নয়। ঐক্যবদ্ধ মণ্ডলের ব্যাকৃতিও অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম জীবকোষ[৩] আবহাওয়ায় ছড়ানো কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের মিলনেই সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু জীবকোষের আরও উন্নতি ব্যাকৃতিপ্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে। জীবকোষ ব্যাকৃতিপ্রক্রিয়ায় নিজেকে বিভিন্ন কোষে বিভক্ত

১। Biological Evolutionists

২। The process of evolution is always from a simple to a more complex form, from an undifferentiated and homogeneous to a differentiated and heterogeneous state, from an indefinite and incoherent to a definite and coherent condition.

৩। Germ cell.

করেছে। এই কোষগুলো আবার ব্যাকৃত হয়ে জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি করেছে। সুতরাং অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যাকৃতি-প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

(৩) নিয়মানুগত্য (Determination)

আমরা এইমাত্র দেখলাম যে, অভিব্যক্তিতে ব্যাকৃতি-প্রক্রিযার প্রযোজন আছে। কিন্তু প্রলয বা বিলয বলতে আমরা ঐক্যবদ্ধ বস্তুর ব্যাকৃতিই বুঝি। তা'হলে প্রশ্ন ওঠে—অভিব্যক্তির সঙ্গে প্রলয বা বিলযের তফাৎ কি? এই প্রশ্নেব উত্তর দিতে গিযে বলা হযেছে যে, অভিব্যক্তির ব্যাকৃতি এক বিশেষ নিযম মেনে চলে। প্রলয বা বিলযেব বেলায এই নিয়ম খাটে না। সুতবাং অভিব্যক্তির সঙ্গে প্রলয বা বিলযেব তফাৎ সুস্পষ্ট। অভিব্যক্তির বেলায বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলায, অনির্দিষ্ট ও অনির্বাচ্য অবস্থা থেকে নির্দিষ্ট ও বাচ্য অবস্থার পবিণতি লক্ষ্য কবা যায। কিন্তু প্রলয বা বিলযের বেলায শৃঙ্খলা থেকে বিশৃঙ্খলায, নির্দিষ্ট ও বাচ্য অবস্থা থেকে অনির্দিষ্ট ও অনির্বাচ্য অবস্থায অবনতিই দেখতে পাওযা যায়। সুতরাং অভিব্যক্তি ও প্রলয সম্পূর্ণ বিপরীত প্রক্রিযা।

স্পেন্সারের মতে জড (Matter), গতি (Motion) ও শক্তি (Force) অভিব্যক্তি-প্রক্রিযাব বিভিন্ন উপাদান। অজ্ঞেয তত্ত্বই (The Unknowable) চরমতত্ত্ব।

জড, গতি ও শক্তি এই অজ্ঞেয তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ। অজ্ঞেয় তত্ত্বের মাত্র এই তিনটি প্রকাশই জানা যায। অভিব্যক্তি-প্রক্রিযায ঐক্যবিধান ও ব্যাকৃতিই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায।

স্পেন্সার মনে করেন, যে উপাদান সৌরমণ্ডল সৃষ্টি করেছে একদিন তা গ্যাসের বিক্ষিপ্ত মেঘের মত (Nebula or cloud of gas) ছিল। ক্রমশঃ এই উপাদান বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে সঙ্কুচিত হ'তে হ'তে সূর্যের সৃষ্টি করেছে। সূর্য-দেহের উপাদান বিশ্লিষ্ট হযে বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহের রূপ নিয়েছে। আমাদের পৃথিবী এইরকম একটি গ্রহ। প্রথম অবস্থায় এই পৃথিবীও গ্যাসের মেঘের মত ছিল। ক্রমে এই মেঘ জমাট বেঁধে মাটির সৃষ্টি করেছে। কিছু মেঘ ছড়িয়ে যাওয়ায় জল ও বায়ুর উৎপত্তি হয়েছে। এই রকম ঐক্য-বিধান ও ব্যাকৃতি-প্রক্রিয়ার ফলেই আজকের পৃথিবী এমন রূপ নিয়েছে।

জৈব অভিব্যক্তিতেও ঐক্য-বিধান ও ব্যাকৃতি-প্রক্রিয়ার যুগল লীলা দেখতে পাওয়া যায়। জীব-সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় সমসাত্ত্বিক প্রটোপ্লাজম্‌পুঞ্জ ছিল। এই প্রটোপ্লাজম্‌পুঞ্জ বিশ্লিষ্ট হয়ে বিভিন্ন কর্মসাধনের জন্য বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি করেছে। দেখবার জন্য চোখ, শোনবার জন্য কান, ধরবার জন্য হাত, চলবার জন্য পা প্রভৃতির ত' এমনি করেই সৃষ্টি হল। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো একত্রিত হয়ে জীবদেহের সৃষ্টি করেছে।

সামাজিক বিবর্তনেও ঐক্যবিধান ও ব্যাকৃতি-প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন পরিবার একত্রিত হয়ে সমাজ গড়ে তুলেছে। আবার গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে এই সমাজ বিশ্লিষ্ট হয়ে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি করেছে। এই বিভিন্ন জাতিগুলো দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে ঐক্য গড়ে তুলেছে। সুতরাং সমস্ত পরিবর্তনেই ঐক্যবিধান ও ব্যাকৃতির দ্বৈতপ্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়।

সমালোচনা ঃ—ল্যাপ্‌লেস্ স্পেন্সারের বিশ্বাভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। আমরা ল্যাপ্‌লেসের অভিযোগ অনুসরণ করে স্পেন্সারের অভিব্যক্তিবাদের সমালোচনা করব।

স্পেন্সার মনে করেন, বিশ্ব সৃষ্টির আদিম উপাদান গ্যাসের বিক্ষিপ্ত মেঘের মত ছিল। কিন্তু এই অনুমানের পক্ষে কোন সুযুক্তি পাওয়া যায় না। স্পেন্সার নিশ্চয়ই বিশ্ব-সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় বেঁচে ছিলেন না। সুতরাং বিশ্বের আদিম অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শী তিনি হতে পারেন না। তবে তিনি জানলেন কি করে যে পৃথিবীর আদিম উপাদান গ্যাসের বিক্ষিপ্ত মেঘের মত ছিল ? এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর স্পেন্সারের লেখায় পাওয়া যায় না।

স্পেন্সারের মতে বিশ্বের আদিম উপাদান সমসাত্ত্বিক অবস্থায় ছিল। এই সমসাত্ত্বিক উপাদান বিষমসাত্ত্বিক হয়েই বিশ্বের অভিব্যক্তি সম্ভব করেছে। এখানে প্রশ্ন ওঠে—সমসাত্ত্বিক উপাদান বিষমসাত্ত্বিক হল কি করে ? স্পেন্সার এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেননি।

স্পেন্সার মনে করেন, জড়, গতি ও শক্তি—এই তিন উপাদান থেকেই প্রাণ ও মনের উৎপত্তি হয়েছে। প্রাণ ও মন জড় থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমরা প্রাণের প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি যে প্রাণীর গঠন-ভঙ্গিমা ও কার্যপ্রণালী জড় থেকে তাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে দিয়েছে। সুতরাং জড় থেকে প্রাণের উৎপত্তি হতে পারে না। চৈতন্য মনের স্বরূপ লক্ষণ।

জড় সম্পূর্ণরূপেই নিশ্চেতন। সুতরাং জড় থেকে মনের উদ্ভবই বা হবে কি করে ?

স্পেন্সার অভিব্যক্তির যন্ত্রবাদসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া যান্ত্রিক ভাবেই ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু এই সুন্দরী ধরণী কি করে যান্ত্রিকভাবে সৃষ্ট হতে পারে—তা আমরা বুঝি না। জগতের প্রত্যেকটি জিনিস যেন নিখুঁত ভাবে সাজানো রয়েছে। কোন যন্ত্রই এই সাজানো পৃথিবীর সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং স্পেন্সারের অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার যন্ত্রবাদ-সম্মত ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায় না।

স্পেন্সার জড়, গতি ও শক্তিকে অজ্ঞেয় তত্ত্বের বিভিন্ন-প্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন। অজ্ঞেয় তত্ত্ব যদি সত্যি সত্যিই অজ্ঞেয় হয় তবে তার সম্বন্ধে কিছুই জানা যেতে পারে না। তবে অজ্ঞেয় তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ জানা যাবে কি করে ? চরমতত্ত্ব যদি অজ্ঞেয় হয়, তবে তার কোন প্রকাশই জানা যায় না। আর চরমতত্ত্বের কোন প্রকাশ যদি জানা যায়, তবে তা অজ্ঞেয় হতে পারে না। সুতরাং স্পেন্সারের মতবাদ যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

জাতির ধারণা (The Idea of Species)

একই রকম গঠন-ভঙ্গিমা-বিশিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তির সমবায়ে এক জাতির সৃষ্টি হয়। জাতিগুলো সাধারণতঃ পরস্পর বিবিক্তই থাকে। জাতির প্রকৃতি ও উৎপত্তি সম্বন্ধে দুটি বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। আমরা এখন এই মতবাদ দুটি আলোচনা করব।

(ক) অপরিণামী জাতিতত্ত্ব (The theory of Immutability of Species)

এই মতবাদ অনুসারে জাতিগুলো অপরিণামী ও সম্পূর্ণ বিবিক্ত। এক জাতি থেকে কখনই অন্য জাতির সৃষ্টি হতে পারে না। এক জাতির প্রকৃতি অন্য জাতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই অপরিণামী জাতি তত্ত্বের দুই রূপ :—সৃষ্টি-তত্ত্ব ও প্লেটোতত্ত্ব।

(১) **সৃষ্টিতত্ত্ব** :—সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে ঈশ্বর সমস্ত জাতি একসঙ্গে সৃষ্টি করেছিলেন। পরে তাদের বংশ বৃদ্ধি করার আদেশ দিয়েছিলেন এবং তার ফলেই আজ বিভিন্ন জাতির অবস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। কোন একটা জাতি থেকে কখনই অন্য জাতির সৃষ্টি হয় না। মনুষ্য জাতির বংশধর মনুষ্যই

হতে পারে। আবার গো-জাতির বংশধর চিরকাল গো-ই হবে। সুতরাং জাতিগুলো পরস্পর বিবিক্ত ও অপরিণামী।

(২) **প্লেটোতত্ত্ব :**—প্লেটোর মতে একমাত্র জাতিই সৎ। বিভিন্ন ব্যক্তি জাতির ছায়া বা অনুকরণমাত্র। সমস্ত মানুষ মনুষ্যজাতির অনুকরণেরই ফল। মনুষ্য জাতিই সৎ ও সত্য। ব্যক্তিমানুষের কোন আত্যন্তিক সত্তা নেই। জাতিগুলো পরস্পর বিবিক্ত ও অপরিণামী। কোন এক বিশেষ জাতির অনুকরণে বিশেষ ধরণের ব্যক্তিদেরই পাওয়া যেতে পারে। এক জাতির অনুকরণে কখনই অন্য জাতির ব্যক্তি সৃষ্টি হতে পারে না। গো-জাতির অনুকরণে গো-ই লাভ করা যায়। আবার অজ জাতির ছায়া অজ-ই হয়। সুতরাং অপরিণামী জাতি-তত্ত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই।

(খ) পরিণামী জাতিতত্ত্ব (Mutability of Species)

ডারউইন ও ল্যামার্কের নেতৃত্বে যে জৈবিক অভিব্যক্তিবাদের পত্তন হয়েছে, সেই মতবাদ অনুসারে জাতিগুলো পরস্পর বিবিক্ত ও অপরিণামী নয়। যুগ-বিবর্তনের ফলে এক জাতি থেকে অন্য জাতির উৎপত্তি হয়। সুতরাং পরিণামী জাতিতত্ত্বই স্বীকার করা উচিত। ডাবউইন বলেন, এক জাতি থেকে অন্য জাতির সৃষ্টি আকস্মিক ভাবেই (fortuitously) হয়ে থাকে। ল্যামার্কের মতে এক জাতি থেকে অন্য জাতির উৎপত্তি পরিবেশ-পরিবর্তনের জন্যই সম্ভব হয়। এঁর মতে কোন জাতির কোন দুটি ব্যক্তিই একরকমের নয়। জাতিতে জাতিতে কোন চরম ভেদরেখা নেই। জীবদেহের গঠন-ভঙ্গিমা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ফলেই এক জাতি থেকে অন্য জাতির সৃষ্টি হয়।

জৈবিক অভিব্যক্তিবাদ

আমরা আগেই বলেছি যে, ডারউইন, ল্যামার্ক, ভাইসম্যান প্রভৃতি মনীষীরা অভিব্যক্তির যন্ত্রবাদসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এঁরা বিশেষ ভাবে জীবের অভিব্যক্তি নিয়েই আলোচনা করেছেন। এঁদের মতবাদ জৈবিক অভিব্যক্তিবাদ নামে পরিচিত। সমস্ত জৈবিক অভিব্যক্তিবাদীরাই জাতির পরিণামী তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে এক জাতি থেকে অন্য জাতির উৎপত্তি সম্ভব। আমরা প্রথমে ডারউনের জৈবিক অভিব্যক্তিবাদ আলোচনা করে পরে ল্যামার্ক ও ভাইসম্যানের মতবাদ আলোচনা করব।

১। ডারউইনের বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদ

ডারউইনের মতে প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) বা যোগ্যতমের বাঁচবার অধিকার (Survival of the Fittest) এই নীতি অনুযায়ী আকস্মিক পরিবর্তনের (fortuitous variation) জন্যই নূতন জাতির উদ্ভব হয়। ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ তিনটি নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত :—

(ক) আকস্মিক পরিবর্তন :

ডারউইন মনে করেন, প্রোটোপ্লাজম কোষ দেখতে সরল হলেও আসলে অত্যন্ত জটিল। এই জটিল প্রোটোপ্লাজম কোষে আকস্মিক ভাবে পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রোটোপ্লাজম কোষের পরিবর্তন জীবদেহেও পরিবর্তন সূচনা করে। এই পরিবর্তনগুলোর মধ্যে কতগুলো জীবদেহের অনুকূল আর কতগুলো প্রতিকূল ও ক্ষতিকর। অনুকূল পরিবর্তনের আধিক্য দেখা দিলে জীবনযুদ্ধে জীব জয়ী হয়। আর প্রতিকূল পরিবর্তনের সংখ্যাধিক্য হলে জীবের বংশ লোপ পায়।

(খ) বংশানুক্রমে জীবদেহে এই আকস্মিক পরিবর্তনের সঞ্চার :

প্রোটোপ্লাজম কোষের আকস্মিক পরিবর্তন বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। এই সঞ্চারণের ফলে জীবদেহের পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্যক্তিদেহের এই পরিবর্তন দেহের অনুকূল হলে সমস্ত জাতিই বেঁচে থাকে। যদি এই পরিবর্তন দেহের প্রতিকূল হয় তবে ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে জাতিও লুপ্ত হয়।

(গ) প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের বাঁচবার অধিকার :

জগতে যত জীব আছে তাদের সকলের পক্ষে পর্যাপ্ত খাদ্য জগতে নেই। তার ফলে খাদ্য লাভের জন্য জীবদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। এই প্রতিযোগিতা স্বাভাবিক ভাবেই এক দ্বন্দ্বের আকারে প্রকাশ পায়। ডারউইন এই দ্বন্দ্বের নাম দিয়েছেন জীবন-যুদ্ধ। যে সমস্ত জীবের প্রোটোপ্লাজম কোষের পরিবর্তন দেহের অনুকূল হয় তারাই জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়। এরাই যোগ্যতম বলে বাঁচবার অধিকারী। যে সমস্ত জীবের প্রোটোপ্লাজম কোষের পরিবর্তন দেহের প্রতিকূল হয় তারা দুর্বল। এই দুর্বল জীবেরা জীবন-যুদ্ধে স্বাভাবিক ভাবেই ধ্বংস হয়ে যায়। ডারউইন মনে করেন, যে সমস্ত জীবের প্রোটোপ্লাজম কোষের পরিবর্তন দেহের অনুকূল হয় প্রকৃতিই যেন বাঁচবার জন্য তাদের নির্বাচন করে। সুতরাং যোগ্যতমের বাঁচবার অধিকারকে প্রাকৃতিক নির্বাচনও বলা যেতে পারে।

ডারউইন মনে করেন, আকস্মিক ভাবেই জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো পরে বিভিন্ন কার্যসাধনের জন্য নিযুক্ত হয়। কোন পরিবেশ—পরিবর্তনই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উৎপত্তির জন্য দায়ী নয়। প্রোটোপ্লাজম কোষের আকস্মিক পরিবর্তনের জন্যই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়। পরে আমরা এই সমস্ত বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহার করি। চোখের সৃষ্টির পরই তা দেখার জন্য নিযুক্ত হয়, কানের সৃষ্টির পরই তা শোনার কাজ করে। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেলায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।

সমালোচনা: ডারউইন অভিব্যক্তিকে এক যান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলে মনে করেন। বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যান্ত্রিকভাবে কি করে লাভ করা যায় তা আমরা বুঝি না। যান্ত্রিক কারণ কখনই কোন গঠন পারিপাট্যের সদ্ব্যাখ্যা দিতে পারে না। অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ায় কোন উদ্দেশ্যের স্থান না থাকলে জীবের গঠন-সৌকর্য এমন ভাবে দেখা দিত না। কোন যন্ত্রই এমন সুকুমার জিনিস তৈরী করতে পারে না। সুতরাং যান্ত্রিক ব্যাখ্যা করা যায় না।

এক জাতি থেকে আর এক জাতির উৎপত্তি ব্যাপারে ডারউইন প্রোটো-প্লাজম কোষের আকস্মিক পরিবর্তনের ওপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু কোন কিছুকে আকস্মিক বললে তার কারণের সম্যক্ জ্ঞানের অভাবই স্বীকার করতে হয়। সুতরাং আকস্মিকতা নূতন জাতি-উৎপত্তির কোন ব্যাখ্যাই দিতে পারে না। নূতন জাতি আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে হয় বললে নূতন জাতি ঠিক কি ভাবে উৎপন্ন হয় তা যে আমরা জানি না তাই প্রকাশ পায়। সুতরাং ডারউইনের নূতন জাতির উৎপত্তির ব্যাখ্যা কোন ব্যাখ্যাই নয়।

ডারউইন বলেছেন, প্রোটোপ্লাজম কোষের আকস্মিক পরিবর্তন যা দৈহিক গঠনের পরিবর্তনও বটে তা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে জীববিজ্ঞানী ভাইসম্যান প্রমাণ করেছেন যে একমাত্র জীব-কোষের বৈশিষ্ট্য-গুলোই (germinal variations) বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হতে পারে। সুতরাং ডারউইনের বক্তব্য এখন আর গ্রহণ করা যায় না।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্পূর্ণভাবেই কল্পনার ব্যাপার। প্রকৃতি নিশ্চেতন হওয়ায় তার কোন নির্বাচন কল্পনা করাও মুশকিল। যদি প্রকৃতিকে বুদ্ধিসম্পন্ন কোন নারী হিসেবে কল্পনা করা হয় তবেই প্রকৃতির এই উদ্দেশ্য-মূলক কার্যের ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ডারউইন অভিব্যক্তিবাদের যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী। সুতরাং প্রকৃতিকে তিনি বুদ্ধিমতী বলতে পারেন

না। সুতরাং তাঁর অভিব্যক্তিবাদে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মত উদ্দেশ্যমূলক কাজের কোন সদ্ব্যাখ্যা হ'তে পারে না।

ডারউইনের মতবাদের এত সব দোষ সত্ত্বেও তিনিই যে আমাদের দৃষ্টি সর্বপ্রথম জৈবিক অভিব্যক্তিবাদেব দিকে আকৃষ্ট করেন—তা অস্বীকার করা যায় না। অভিব্যক্তিবাদের প্রধান পুরোহিত হিসেবে চিরদিনই তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

২। ল্যামার্কের জৈবিক অভিব্যক্তিবাদ

ল্যামার্কের মতে, জীব-কোষ আকস্মিকভাবে পরিবর্তিত হলে কখনই কোন নির্দিষ্ট ফল প্রসব করতে পাবে না। সুতরাং প্রোটোপ্লাজম্‌-কোষের পরিবর্তন কখনই আকস্মিক হতে পাবে না। ল্যামার্ক মনে করেন, পরিবেশেব প্রভাবেই কোষের পরিবর্তন হয়। যখন বাইবে থেকে কোন শক্তি দেহেব ওপব কাজ করে তখন দেহ নিজেকে সেই শক্তির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা কবে। তার ফলে দেহে পরিবর্তন দেখা দেয। বাইরের শক্তির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেবাব জন্য কতগুলো দৈহিক প্রযোজন দেখা দেয়। এই প্রযোজনসিদ্ধির জন্যই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে। দেখার প্রয়োজনে চোখ, শোনার প্রযোজনে কান ও অন্যান্য প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব হয়েছে।

ল্যামার্ক মনে করেন, পরিবেশের প্রভাবে দৈহিক গঠনের এই যে পরিবর্তন হয় তা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। ল্যামার্কের মতে প্রথম অবস্থাতেই জিরাফের গলা লম্বা ছিল না। গাছের ওপরের ডালের পাতা খাওয়ার জন্য জিরাফেরা প্রায়ই গলা বাড়িয়ে দিত। বারবার গলা বাড়ানোর ফলে জিরাফের গলা লম্বা হয়ে গেছে। পরবর্তী কালে অবশ্য জিরাফের এই সঞ্চিত গুণ বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়েছে। এখন জিরাফ লম্বা গলা নিয়েই জন্মায়।

সমালোচনা ঃ ল্যামার্ক বলেছেন, পরিবেশের প্রভাবে দৈহিক গঠনের যে পরিবর্তন হয় তা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। কিন্তু ভাইসম্যান দেখিয়েছেন যে কেবলমাত্র জীব-কোষের বৈশিষ্ট্যগুলোই বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হতে পারে। সুতরাং ল্যামার্কের কথা এখন আর গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ল্যামার্কের মতে, পরিবেশের প্রভাব দৈহিক গঠনের পরিবর্তন সাধন করে। আমাদের মনে হয়, পরিবেশের প্রভাব দেহে সংক্ষোভের (irritation or excitement) সৃষ্টি করতে পারে ; কিন্তু কোন দৈহিক পরিবর্তন সূচনা করতে পারে না। দৈহিক গঠনের পরিবর্তন দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে হতে পারে।

ল্যামার্ক মনে করেন, প্রয়োজন থেকেই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কোন একটা বিষয়ের প্রয়োজনীয়তাই কি তাকে সৃষ্টি করতে পারে? যদি তা পারত তবে দুনিয়ায় না পাওয়ার বেদনা বলে কিছু থাকত না; মানুষেব অসন্তোষও লুপ্ত হয়ে যেত। যখন যার যা প্রয়োজন তখনই যদি সেই জিনিসের সৃষ্টি হয় তবে মানুষের দুঃখ, দারিদ্র্য, অসন্তোষ কিছুই থাকে না। কিন্তু এমন সুখ-স্বপ্ন আজ পর্যন্ত বাস্তব রূপ পায় নি। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি সম্বন্ধে ল্যামার্কের মতবাদ গ্রহণ করা যায় না।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে ডারউইনের জৈবিক অভিব্যক্তি-বাদের মতই ল্যামার্কের মতবাদও বহু দোষ-দুষ্ট। সুতরাং ল্যামার্কের মতবাদ গ্রহণ করা যায় না।

৩। ভাইসম্যানের মতবাদ

পরিবর্তন মাত্রই যে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হতে পারে না—এ কথাই ভাইসম্যানের মূল বক্তব্য। ভাইসম্যান মনে করেন, জীব-কোষের আন্তর পরিবর্তনই (internal germinal variation) বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হতে পারে। দেহের আকস্মিক বা পরিবেশ-প্রভাব-জাত পরিবর্তন বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হতে পারে না। এখন ভাইসম্যানের এই কথার সত্যতা অনেক জীববিজ্ঞানীই স্বীকার করেন।

ভাইসম্যানের মতে, জীব-কোষ বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় বলে তা মৃত্যুহীন। পিতার জীব-কোষ পুত্রের দেহ ও জীব-কোষ উভয়ই সৃষ্টি করে। পুত্রের জীব-কোষ আবার তার পুত্রে সঞ্চারিত হয়। এমনি করে নিরবধিকাল ধরে জীব-কোষ সঞ্চারিত হতে থাকে। সুতরাং জীব-কোষের মৃত্যু বা ধ্বংস নেই।

সমালোচনা: ভাইসম্যান স্বীকার করেছেন, জীবের পরিবর্তন আকস্মিক ভাবে হয় না। সুতরাং, সমস্ত পরিবর্তনই উদ্দেশ্যধর্মী, একথা ভাইসম্যানের স্বীকার করা উচিত। কিন্তু যন্ত্রবাদী ভাইসম্যান একথা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে পরিবর্তন যান্ত্রিকভাবেই ঘটে থাকে।

যন্ত্রবাদের সাধারণ সমালোচনা
(General Criticism of Mechanical Theory)

যন্ত্রবাদের মূল বক্তব্য আগেই আলোচনা করেছি। যন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপের সমালোচনাও করা হয়েছে। এখন আমরা যন্ত্রবাদের সাধারণ সমালোচনা করব।

যন্ত্রবাদের মতে সব কিছুই যান্ত্রিকভাবে ঘটে যাচ্ছে। কোথাও কোন বুদ্ধি বা উদ্দেশ্যের স্থান নেই। কিন্তু বিভিন্ন বস্তুতে পরিপাটি করে সাজানো এই বিচিত্র জগৎ কি করে যান্ত্রিকভাবে উৎপন্ন হতে পারে তা আমরা বুঝি না। জগতের দিকে তাকালেই মনে হয়, জাগতিক সমস্ত বস্তুই যেন কার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নিজেদের সাজিয়ে রেখেছে। যেখানে যে জিনিসটি দরকার সেখানে ঠিক সেই জিনিসটিই আছে। আমাদের মনে হয়, কোন এক বিরাট ইচ্ছাময়ের লীলা না হলে জগৎটা এমন হত না।

যন্ত্রবাদের মতে প্রাণ ও মন জড়েরই প্রকারভেদ মাত্র। জড়ের সঙ্গে প্রাণের বা জড়ের সঙ্গে মনের কোন মূলগত পার্থক্য নেই। প্রাণ জড়ের জটিলতর প্রকাশ, জড় জটিলতমরূপে প্রকাশিত হয়েছে মনের মধ্যে। সুতরাং জড় থেকেই প্রাণ ও মনের উদ্ভব হয়েছে।

প্রাণীর গতির স্বাধীনতা, প্রজনন-শক্তি ও স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষমতা আছে। কিন্তু জড়ের এ সমস্ত কোন ক্ষমতাই নেই। জড়ের নিজস্ব কোন গতি নেই। জড়ের বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা নেই। জড়ের স্বাভাবিকভাবে কোন বৃদ্ধিও হয় না। সুতরাং জড়ের সঙ্গে প্রাণীর পার্থক্য মৌলিক। কাজেই জড় থেকে প্রাণের উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। মন চৈতন্যস্বভাব। জড় সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেতন। সুতরাং নিশ্চেতন জড় থেকে চেতন মনের আবির্ভাব হতে পারে না।

যন্ত্রবাদীদের মতে কতগুলো ভৌত ও যান্ত্রিক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই এই বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের মনে হয় ভৌত ও যান্ত্রিক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে হতে পারে না। কোন বুদ্ধিমান লোকের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এসব শক্তি কাজ করতে পারে না। সুতরাং বিশ্বে বুদ্ধিমৎ কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়।

উদ্দেশ্যবাদ (Teleological Evolution)

উদ্দেশ্যবাদীদের মতে দুনিয়াটা নির্বোধ জড়ের যান্ত্রিক খেলা মাত্র নয়। এখানে উদ্দেশ্য, আদর্শ ও বিচার-বিবেচনার স্থান আছে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—উদ্দেশ্যবাদীরা এই সিদ্ধান্ত করলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েই আমরা উদ্দেশ্যবাদের আলোচনা শুরু করব।

উদ্দেশ্যবাদের পক্ষে যুক্তি :

১। মার্টিনিউ বলেন, জগৎ যে উদ্দেশ্যমূলক তার প্রমাণ অতি সহজেই পাওয়া যায়। নির্বাচন (Selection), গঠন (Combination) ও স্তরভেদ (Gradation) উদ্দেশ্যমূলকতার তিন লক্ষণ। জগতে এই তিন লক্ষণেরই অস্তিত্ব আছে। সুতরাং জগৎ যে উদ্দেশ্যমূলক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পাখি জলে ভেজে, রোদে পোড়ে; তাই আত্মরক্ষার জন্য তার পালক আছে। মাছ জলে থাকে। জল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করার জন্য তার রক্তবর্ণ এক বিশেষ অঙ্গের ব্যবস্থা হয়েছে। এমনি করে এই পৃথিবীতে যার যা দরকার ঠিক তারই জন্য তা নির্বাচিত হয়েছে। জগতের এই সুনিপুণ নির্বাচন-ব্যবস্থা জগৎ যে উদ্দেশ্যমূলক তা-ই মনে করিয়ে দেয়। প্রাণীর গঠন-বৈচিত্র্যও আমাদের মুগ্ধ করে। প্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক বিশেষ পারস্পরিক সম্পর্কেই দেখতে পাওয়া যায়। এই পারস্পরিক সম্পর্ক প্রাণী-দেহের সৌন্দর্য বিধান করে। মানুষের চোখ, মুখ, কান প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গ এক বিশেষ অবস্থানেই দেখতে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো পারস্পরিক সামঞ্জস্য রক্ষা করেই বৃদ্ধি পায়। কোন মানুষেরই হাত দুটো অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পেল আর পদ-যুগলের বৃদ্ধি একেবারেই হল না— এমন হয় না। এখন প্রশ্ন ওঠে—প্রাণীদেহের এমন সুন্দর গঠন হল কি করে? এই গঠন যান্ত্রিকভাবে হয়েছে—একথা মানা যায় না। সুতরাং জগতে উদ্দেশ্য-কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

জগতে চমৎকার স্তরভেদেরও পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্ভিদের চেয়ে পশু একটু উচ্চস্তরের। উদ্ভিদ্ খেয়েই পশু জীবন ধারণ করে। আবার মানুষ উদ্ভিদ্ ও পশু সকলের চেয়েই উচ্চস্তরের। মানুষ উদ্ভিদ্ ও পশু দুই-ই খায়। জগতের এই স্তরভেদের কথা ভাবতে গেলেই উদ্দেশ্যকারণের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

২। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভাষায়, এ জগতে এক নিয়মের রাজত্ব চলেছে। এখানে উঠতেও নিয়ম, পড়তেও নিয়ম, স্থির থাকতেও নিয়ম। এই নিয়মের কোথায়ও ব্যতিক্রম নেই। এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে—জগতে নিয়মের রাজত্ব চলছে কেন? উত্তরে শুধু এই বলা যায় যে জগৎ উদ্দেশ্য-মূলক বলেই এখানকার সব কিছুই সেই উদ্দেশ্য বা নিয়মের অনুবর্তন করে চলেছে।

৩। অভিব্যক্তি পরিবর্তন সূচনা করে। পরিবর্তন বলতে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থা প্রাপ্তিই বোঝায়। সুতরাং এক নূতন অবস্থা-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যই পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই অভিব্যক্তিকে উদ্দেশ্যমূলকই বলা উচিত।

এই সমস্ত যুক্তির ওপরে নির্ভর করে উদ্দেশ্যবাদীরা বলেন, জগৎ ও তার অভিব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলকই হবে। উদ্দেশ্যবাদ দুরকমের হতে পারে—অতিবর্তী উদ্দেশ্যবাদ (External Teleology) ও অন্তঃস্যূত উদ্দেশ্যবাদ (Immanent Teleology)। আমরা এখন এই দুরকমের উদ্দেশ্যবাদের দোষগুণ আলোচনা করব।

অতিবর্তী উদ্দেশ্যবাদ :

অতিবর্তী উদ্দেশ্যবাদীদের মতে জগতের উদ্দেশ্য জগতের ভেতরে নেই। এই উদ্দেশ্যকারণ জগতেব বাইরে থেকে জাগতিক সমস্ত কার্য নিয়ন্ত্রিত করে। আরিস্টটলের মতে জগতের সমস্ত পরিবর্তন ঈশ্বরই নিয়ন্ত্রিত করেন। সব কিছুই পরিবর্তিত হয়; কিন্তু ঈশ্বরের কোন পরিবর্তন হয় না। তিনি সমস্ত পরিবর্তনের নিশ্চল নিয়ামক বিশেষ (The unmoved mover of everything)। সমস্ত গতি এই শরণাগতির দিকেই ছুটে চলেছে। এই শরণাগতি জগতের মধ্যে নেই। তিনি জগৎ ও গতির ঊর্ধ্বে থেকে জগৎ ও গতি নিয়ন্ত্রিত করেন। ঈশ্বর গতির নিয়ামক হয়েও নিশ্চল, পরিবর্তনের কারণ হয়েও অপরিবর্তিত, জগতের কর্তা হয়েও জগৎ-বহির্ভূত। তিনি বাইরে থেকেই জগতের মধ্য দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেন।

সমালোচনা : ঈশ্বর যদি জগতের বাইরে থেকে জগৎ নিয়ন্ত্রিত করেন তবে জগৎ ঈশ্বরকে সীমিত করবে। আমরা ঈশ্বর অসীম ও অনন্ত বলেই জানি। সুতরাং তিনি জগতের বাইরে থাকতে পারেন না। ঈশ্বর যদি জগতের বাইরে থেকেই জগতের মধ্য দিয়ে নিজ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে নেন, তবে তাঁকে স্বার্থপর বলতে হয়। এই ক্ষেত্রে ঈশ্বর জগতের মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি নির্মমভাবে উদাসীন হবেন। কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে পরম করুণাময় বলেই জানি। সুতরাং মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি উদাসীন হয়ে তিনি একান্ত স্বার্থপরের মত জগতের মধ্য দিয়ে নিজ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে নেবেন—তা আমরা ভাবতে পারি না।

ঈশ্বর যদি জগতের বাইরে থাকেন তবে ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের কোন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে জগতের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষক ও

সংহারক বলেই জানি। সুতরাং জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় একান্তভাবেই ঈশ্বরের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্কে আবদ্ধ। কাজেই ঈশ্বর জগতের বাইরে আছেন একথা বলা যায় না।

ঈশ্বর বাইরে থেকে জগৎকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত করেন বললে ঈশ্বরকে সাধারণ যন্ত্রীর সঙ্গে তুলনা করা হয়। সাধারণ যন্ত্রী বাইরে থেকে যন্ত্রপরিচালনা করেন আবার বিকল হলে সারাই করেন। কিন্তু ঈশ্বরকে কি সাধারণ যন্ত্রীর মত ভাবা যায়।

অতিবর্তী উদ্দেশ্যবাদের এসব দোষত্রুটি আছে বলে আমরা এই মতবাদ গ্রহণ করতে পারি না। এবার উদ্দেশ্যবাদের দ্বিতীয় রূপ আলোচনা করা যাক।

অন্তঃস্যূত উদ্দেশ্যবাদ ঃ

হেগেল, লোটজা, পল্‌সন, ব্রেডলি, রয়েস্‌ প্রভৃতি দার্শনিকদের মতে এই বিশ্ব এক চৈতন্য-সত্তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই অসীম চৈতন্য-সত্তা সীমার খণ্ডতা ও ছিন্নতার মধ্য দিয়ে নিজের পূর্ণতা উপলব্ধি করে চলেছেন। বিশ্বের সীমিত সত্তার মধ্যে তিনি অন্তঃস্যূত। এক চৈতন্য-সত্তার অন্তঃস্যূত বলে বিশ্ব একান্তভাবেই উদ্দেশ্যমূলক ও যুক্তিসিদ্ধ।

প্রাণ যে উদ্দেশ্যমূলক এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। জীবদেহের গঠন-ভঙ্গিমা অন্তঃস্যূত উদ্দেশ্য সূচনা করে। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্ত দেহের পরিপূর্ণতা ও চরিতার্থতার জন্যই বিশেষভাবে বিন্যস্ত হয়। জীবদেহের যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক তা উদ্দেশ্যবাদ দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়। এই উদ্দেশ্যবাদ যন্ত্রবাদের বিপরীত মতবাদ নয়, পরিপূরক মাত্র। তথাকথিত জড়ের বিন্যাসের মধ্যে যে এক উদ্দেশ্য বা আদর্শ আছে তা অস্বীকার করা যায় না। এই উদ্দেশ্যবাদ এই দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। আত্ম-জ্ঞানের (self-consciousness) মধ্যে উদ্দেশ্যপ্রবণতা সব চেয়ে বেশী প্রকট হয়েছে। জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞান উভয়ই আত্মজ্ঞানে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। কথাটা উদাহরণ দিয়ে বোঝান যেতে পারে। যখন বলি 'আমি টেবিলটি জানি', তখন টেবিলটি জ্ঞানের বিষয়; আর এখানে টেবিলের জ্ঞান আছে—এও বোঝায়। জ্ঞানের বিষয় ছাড়া কোন জ্ঞানই হয় না। আবার জ্ঞান হলেই জ্ঞানেরও জ্ঞান থাকে। যখন বলি 'আমি টেবিলটি জানি', তখন 'আমি বোঝাতে চাই 'আমি জানি যে টেবিলটি জানি'। আমি যে টেবিলটি জানি তা না জানলে 'আমি টেবিলটি জানি' এমন কথা বলাই যায় না। সুতরাং

জ্ঞান জ্ঞানের জ্ঞান সূচনা করে। জ্ঞানের জ্ঞান আত্ম-জ্ঞান নামে পরিচিত। সুতরাং আত্ম-জ্ঞানে জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় ছাড়া আত্ম-জ্ঞান হতেই পারে না। জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় আত্ম-জ্ঞানের সার্থকতার জন্যই আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং আত্ম-জ্ঞান চরম উদ্দেশ্যমূলক। হেগেল এই আত্ম-জ্ঞানকেই পরম চৈতন্য বলেছেন। তাঁর মতে জ্ঞান বা মন ও জ্ঞানের বিষয় বা প্রকৃতি এই পরম চৈতন্যের দুই প্রকাশ। পরম চৈতন্যের পরিপূর্ণতা ও পরিতৃপ্তির জন্যই মন বা প্রকৃতির অবস্থান। সুতবাং প্রকৃতি বা জগৎ উদ্দেশ্যমূলক। এই উদ্দেশ্যই পরম চৈতন্য। পরম চৈতন্য প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে আবদ্ধ। সুতরাং উদ্দেশ্য এখানে প্রকৃতি বা বিশ্বে একান্তভাবেই অন্তঃস্যূত। এই মতবাদের নাম অন্তঃস্যূত উদ্দেশ্যবাদ। জীবদেহ যে উদ্দেশ্য চবিতার্থ করে তা যেমন জীবদেহেবই অন্তঃস্যূত উদ্দেশ্য, তেমনি এই বিশ্ব যে উদ্দেশ্য সফল করে চলেছে তাও অন্তঃস্যূত। জড়, প্রাণ ও মন—এই তিন স্তবের মধ্য দিযে অন্তঃস্যূত উদ্দেশ্য পরম চৈতন্য নিজেকে চরিতার্থ কবে চলেছেন। জড়ে তার প্রকাশ অত্যন্ত স্তিমিত, প্রাণে অধিকতর উজ্জ্বল আর মনে সব চেযে প্রকট। সীমাব মধ্যে অসীম নিজের সুর বাজিযে যান, সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ সত্যিই সুন্দর ও সার্থক।

এই অন্তঃস্যূত উদ্দেশ্যবাদের বিপক্ষে কিছুই বলার নেই। অতিবর্তী উদ্দেশ্যবাদের দোষত্রুটি এখানে পাওযা যায় না। যন্ত্রবাদেব যান্ত্রিকতার স্থানও এখানে নেই। বিশ্ব যে উদ্দেশ্যমূলক একথাব স্বীকৃতি এই মতবাদে আছে। জীবদেহ যেমন বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্য দিযে নিজ অন্তঃস্যূত-উদ্দেশ্য চরিতার্থ কবে, তেমনি এই বিশ্বে অন্তঃস্যূত পরম চৈতন্য আপনার পরিপূর্ণতা সার্থক ও সফল করে তোলে। আমাদের মনে হয়, অভিব্যক্তিবাদেব আসল রূপ এই মতবাদেই ফুটে উঠেছে।

সৃজনবাদ (Creative Evolution)

ফরাসী দাশনিক বার্গসঁর মতে যন্ত্রবাদ ও উদ্দেশ্যবাদ উভযই সমানভাবে অযৌক্তিক। তিনি সৃজনবাদের সমর্থক। তাঁব মতে অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া অনিয়ন্ত্রিত (undetermined), অজ্ঞাতপূর্ব (unpredictable) ও সৃজন-মূলক (creative)। অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া অজ্ঞাতপূর্ব নূতন নূতন পথে নূতন-নূতন জিনিস সৃষ্টি ক'রে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এগিযে যায়। পুরাতন কোন জিনিসেরই পুনরাবির্ভাব (repetition) অভিব্যক্তিতে নেই। সম্পূর্ণ নূতন

জিনিস সৃষ্টিই অভিব্যক্তির কাজ। সুতরাং পুনরাবির্ভাব নয়, সৃষ্টিই অভিব্যক্তির মূল লক্ষ্য।

অভিব্যক্তির এই অর্থ যদি গ্রহণ করা যায়, তবে যন্ত্রবাদ বা উদ্দেশ্যবাদ কেউই যে অভিব্যক্তির তাৎপর্য প্রকাশ করেনি তা স্বীকার করতে হয়। বার্গসঁ প্রথমেই যন্ত্রবাদ ও উদ্দেশ্যবাদের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করেছেন।

যন্ত্রবাদ অনুসারে অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার প্রত্যেক পূর্ব স্তর উত্তর স্তরকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যতিক্রম কল্পনাই করা যায় না। যন্ত্রবাদের মতে জড় প্রাণকে নিয়ন্ত্রিত করে আর প্রাণ মনকে নিয়ন্ত্রিত করে। জড় থেকে যখন প্রাণের উদ্ভব হয় বা প্রাণ থেকে যখন মনের উদ্ভব হয়, তখন কোন নূতন জিনিসের সৃষ্টি হয় না। প্রাণ জড়েরই জটিলতররূপে পুনরাবির্ভাব মাত্র। মন জড়ের জটিলতম রূপ। সুতরাং যন্ত্রবাদীদের মতে নিয়ন্ত্রণ ও পুনরাবির্ভাব অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য। বার্গসঁ মনে করেন, অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না, এখানে পুনবাবির্ভাবেরও কোন স্থান নেই। সুতরাং তিনি যন্ত্রবাদের ব্যাখ্যা ভ্রান্ত বলে প্রত্যাহার কবেছেন।

বার্গসঁ বলেন, উদ্দেশ্যবাদ বিপবীত যন্ত্রবাদ মাত্র (Inverted mechanism)। যন্ত্রবাদের মতে অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক পূর্ব স্তর উত্তর স্তরকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু উদ্দেশ্যবাদ অনুসারে উত্তর স্তরই পূর্ব স্তরকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। উদ্দেশ্যবাদীদের মতে সমস্ত অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়াই এক বিশেষ উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করার জন্য এগিয়ে যায়। সমস্ত অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার গতিই এই উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত করে। এই উদ্দেশ্য অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার সম্মুখে আদর্শরূপে উপস্থিত করা হয়। সুতরাং উদ্দেশ্যবাদে সম্মুখস্থ আদর্শই অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। যন্ত্রবাদের মতে, পূর্ব স্তরই উত্তর স্তরকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং উদ্দেশ্যবাদকে বিপরীত যন্ত্রবাদই বলা উচিত। যন্ত্রবাদ যদি নিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতির জন্য প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে, তবে উদ্দেশ্যবাদও অনুরূপ দোষে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সুতরাং বার্গসঁ বলেন, যন্ত্রবাদ বা উদ্দেশ্যবাদ কোন বাদই যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

এখানে প্রশ্ন ওঠে—যন্ত্রবাদ বা উদ্দেশ্যবাদ কোনটাই যদি যুক্তিগ্রাহ্য না হয়, তবে অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বার্গসঁ বলেন, অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া একান্তভাবেই সৃজনমূলক। নূতন নূতন জিনিস সৃষ্টি করাই অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার একমাত্র কাজ। বার্গসঁর মতে, অনাদি অনন্ত প্রাণ-প্রবাহ (elan vital) বিশ্বের চরমতত্ত্ব। এই প্রাণ-প্রবাহ প্রতিনিয়ত

নূতন নূতন জিনিস সৃষ্টি ক'রে চলেছে। প্রাণ-প্রবাহের উত্তর গতি সম্বন্ধে পূর্ব মুহূর্তে কিছুই বলা যায় না। যা আছে তার পুনরাবির্ভাব প্রাণ-প্রবাহের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় নেই। যতই প্রাণ-প্রবাহ এগিয়ে চলে ততই তা নূতন নূতন সৃষ্টির সঞ্চয়ে পূর্ণ ও বেগবান হয়ে ওঠে। প্রাণ প্রবাহ কখনও থামে না, উন্মত্ত উধাও হয়ে নিত্যই তা চলে। এই প্রাণ-প্রবাহকে কাল-প্রবাহও বলা যেতে পারে। এই কাল-প্রবাহে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলে কোন পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ভাগ নেই। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই প্রবাহের একান্ত অবিচ্ছিন্ন তিনটি তরঙ্গ বিশেষ। অতীত তরঙ্গ বর্তমান তরঙ্গে মিশেই আছে আর বর্তমান তরঙ্গ ভবিষ্যৎ তরঙ্গের মধ্যে আপনাকে প্রথম থেকেই সমর্পণ করে রেখেছে। সুতরাং এই ত্রিতরঙ্গের মধ্যে কোন ভেদ বা বিচ্ছেদ নেই। বিচ্ছেদহীন কাল-প্রবাহ বা প্রাণ-প্রবাহ নূতন সৃষ্টিব উন্মাদনায অন্ধ হযে ছুটেছে। প্রাণ-প্রবাহের এই চলার মধ্যে কোন উদ্দেশ্য বা আদর্শ নেই। সমস্ত বন্ধনমুক্ত একান্ত অন্ধ এই প্রবাহ। এই প্রবাহের অন্ধ গতিপথেই জড ও চৈতন্যের উদ্ভব হযেছে। এক হাউই বাজি থেকে যেমন বিভিন্ন আলোর রেখা বিচ্ছুবিত হযে ওঠে তেমনি এক প্রাণ-প্রবাহ থেকে নূতন নূতন বস্তুর সৃষ্টি হয। একটি ধানের শীষ যেমন অসংখ্য ধান ছডিযে দেয তেমনি প্রাণ-প্রবাহ অসংখ্য নূতন বস্তু সম্ভব করে তোলে। প্রাণ-প্রবাহের যেমন আদি নেই তেমনি তার অন্তও নেই। সুতরাং প্রাণ-প্রবাহের সৃজনলীলারও কোন শেষ থাকতে পারে না।

সমালোচনা: বার্গসঁ অভিব্যক্তির একটি বিশেষ দিক সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিযেছেন। অভিব্যক্তি-প্রক্রিযায় যে নূতন নূতন জিনিস সৃষ্টি হয় তা অস্বীকাব করা যায না। যন্ত্রবাদীদের পুনবাবির্ভাব কখনই অভিব্যক্তি-প্রক্রিযার আসল রূপ প্রকাশ করতে পারে না। সুতরাং যন্ত্রবাদীদের বিরুদ্ধে বার্গসঁর অভিযোগ আমবা সত্য বলেই মনে করি। কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্য-বাদকে বিপরীত যন্ত্রবাদ বলেছেন তা সর্বৈব সত্য নয়। অতিবর্তী উদ্দেশ্য-বাদকেই বিপরীত যন্ত্রবাদ বলা যায। অতিবর্তী উদ্দেশ্যবাদেই সম্মুখস্থ উদ্দেশ্য সমস্ত অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু অন্তঃস্যূত উদ্দেশ্যবাদ সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। অন্তঃস্যূত উদ্দেশ্যবাদের মতে অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার মধ্যেই উদ্দেশ্য অন্তঃস্যূত থাকে। সুতরাং এখানে অভিব্যক্তির কোন বহির্নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নই ওঠে না। স্বনিয়ন্ত্রণ স্বাধীনতারই নামান্তর। যন্ত্রবাদে স্বনিয়ন্ত্রণ বা স্বাধীনতার কোন স্থান নেই। সুতরাং অন্তঃস্যূত উদ্দেশ্যবাদ কোন রকমের যন্ত্রবাদই হতে পারে না।

বার্গসঁ প্রাণ-প্রবাহকে সমস্ত বন্ধনমুক্ত অন্ধ প্রবাহ বলে উল্লেখ করেছেন। এই জগতের সুসজ্জিত ও সুসমঞ্জস গঠন-বৈচিত্র্য এই অন্ধ প্রবাহ থেকে কি করে সৃষ্টি হয়, তা আমরা বুঝি না। আদর্শ ও উদ্দেশ্যহীন এক অন্ধ সৃষ্টি-ব্যাকুলতা কখনও কোন সুসমঞ্জস ও সুসজ্জিত বস্তুর সৃষ্টি করতে পারে না। বিশ্বের রচনা ব্যাখ্যার জন্য উদ্দেশ্যবাদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। বার্গসঁ তা করেননি।

বার্গসঁ অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার পূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণ স্বীকার করেছেন। পূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণ উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর। উচ্ছৃঙ্খল অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া সুশৃঙ্খল জগতের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

সর্বশেষে বলা যায়, প্রাণ-প্রবাহের অন্ধসৃষ্টি-ব্যাকুলতা-কল্পনায় বার্গসঁ যথেষ্ট কাব্য ও কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লেখা পড়লে আমাদের চিত্ত তৃপ্ত হয়, কল্পনায় রঙ্‌ লাগে। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির দরবারে বার্গসঁর আবেদন বিশেষ সাড়াই আনতে পারে না। দর্শন বুদ্ধির ব্যাপার। সুতরাং দর্শনের জগতে বার্গসঁর সৃজনবাদের মূল্য খুব বেশী নয়।

উন্মেষবাদ (Emergent Evolution)

উন্মেষবাদ সৃজনবাদের মতই অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার প্রত্যেক স্তরে নূতন গুণের আবির্ভাব স্বীকার করে। যন্ত্রবাদীদের পুনরাবির্ভাববাদ সৃজনবাদীদের মতই উন্মেষবাদীরা খণ্ডন করেছেন। উন্মেষবাদীদের মতে অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক পূর্ব স্তর উত্তর স্তরে জটিলতর রূপে আবির্ভূত হয় না। পূর্ব স্তর যখন উত্তর স্তরের আবির্ভাব সম্ভব করে তোলে তখন উত্তর স্তরে এক নূতন গুণের উন্মেষ হয়ে থাকে। অবশ্য উন্মেষবাদীদের এই নূতন গুণ পূর্ব স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই গড়ে ওঠে। কিন্তু সৃজনবাদীদের উত্তর স্তরের নূতনত্ব পূর্ব স্তরের সঙ্গে সম্পর্কহীন ও সঙ্গতিহীন। সুতরাং সৃজনবাদের সঙ্গে উন্মেষবাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

উন্মেষবাদের তাৎপর্য বুঝতে গেলে উন্মেষিত গুণের (emergent quality) তাৎপর্য বুঝতে হয়। জর্জ হেনরি লিউইস্‌ যোগগত গুণ (resultant quality) ও উন্মেষিত গুণের মধ্যে তফাৎ করেছেন। এই পার্থক্য বুঝলেই উন্মেষিত গুণের তাৎপর্য বোঝা যাবে। যোগগত গুণ উপাদান গুণের যান্ত্রিক যোগ থেকেই লাভ করা যায়। কিন্তু উন্মেষিত গুণ উপাদান গুণের যান্ত্রিক যোগ

থেকে পাওয়া যায় না। উন্মেষিত গুণ বলতে উপাদান গুণ থেকে উন্মেষিত নূতন গুণ বোঝায়। উদাহরণ দিলে সমস্ত ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে।

আমরা জানি, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এক বিশেষ অনুপাতে মিশ্রিত করলে জল পাওয়া যায়। জলের ওজন তার উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের ওজনের সরল যোগ থেকেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ যতটুকু হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থেকে জল হয় তার ওজন যতটুকু জলের ওজন ঠিক ততটুকুই হয়। সুতরাং জলের ওজনকে যোগগত গুণ বলা যেতে পারে। কিন্তু জলের তৃষ্ণা-নিবারণের ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা জলের উপাদান হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন কারুরই নেই। সুতরাং তৃষ্ণা-নিবারণের ক্ষমতা-রূপ গুণ জলের উপাদানের কোন গুণের যান্ত্রিক যোগ-সঞ্জাত নয়। জলের এই গুণকে উন্মেষিত গুণ বলা হয়। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এক বিশেষ অনুপাতে মিশ্রিত করলেই এই নূতন গুণের উদ্ভব হয়।

উন্মেষবাদীদের মতে প্রাণ ও চৈতন্য এইরূপ উন্মেষিত গুণ। জড় থেকেই জীবের উদ্ভব হয়। কিন্তু জীবে প্রাণরূপ নূতন গুণ পাওয়া যায়। এই নূতন গুণ জড়ে নেই। মন প্রাণ থেকেই আসে। কিন্তু মনের স্তরে চৈতন্যরূপ এক নূতন গুণের উদ্ভব হয়। এই গুণ মনের উপাদান প্রাণে থাকে না। সুতরাং উন্মেষবাদীরা প্রাণ ও মনের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন। যন্ত্রবাদীদের মত তাঁরা প্রাণ ও মনকে সম্পূর্ণরূপে জড়ে পরিণত করেন না। এই দিক থেকে উন্মেষ-বাদীরা যে সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, তা অস্বীকার করা যায় না।

স্যামুয়েল আলেকজেণ্ডার ও লয়েড্ মর্গান উন্মেষবাদের সমর্থক। অধ্যাপক সেলার্সের 'অভিব্যক্তিধর্মী নিসর্গবাদ' (Evolutionary Naturalism) গ্রন্থে উন্মেষবাদের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যায়। অবশ্য সেলার্সের সময়ে উন্মেষবাদ কথাটি প্রচলিত ছিল না। যা হোক, উন্মেষবাদের বক্তব্যের সঙ্গে সেলার্সের মতবাদের কিছু কিছু মিল আছে। সেজন্য উদ্দেশ্যবাদ প্রসঙ্গে আমরা অধ্যাপক সেলার্সের অভিব্যক্তিবাদ আলোচনা করতে চাই।

অধ্যাপক সেলার্সের মতে শৃঙ্খলাহীন জড়বস্তু থেকেই জীবের গঠন-শৃঙ্খলা উন্মেষিত হয়েছে। সেলার্স প্রাণের উদ্ভব সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নি। তিনি জড় থেকে মন বা চৈতন্যের উন্মেষ নিয়েই আলোচনা করেছেন। তাঁর ধারণা, বাহ্যবস্তুর সংগঠন থেকেই মানস-ব্যাপার ধীরে ধীরে উন্মেষিত হয়ে উঠেছে। বাহ্য বস্তুতে চৈতন্যরূপ ধর্মের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বস্তুর বিশেষ সংগঠনেই এই ধর্ম উন্মেষিত হয়ে ওঠে।

স্যামুয়েল আলেকজেণ্ডার 'দেশ, কাল ও দেবসত্ত্ব' (Space, Time and Deity) নামক গ্রন্থে উন্মেষবাদের এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে দেশ-কাল বিশ্বের আদিম উপাদান। দেশ-কালকে শুদ্ধ গতিও (pure motion) বলা যেতে পারে। এই আদিম উপাদান থেকে প্রথমে মুখ্য গুণ-বিশিষ্ট জড় দ্রব্যের উদ্ভব হয়েছে। এর পর গৌণ গুণের আবির্ভাব হয়েছে। এই জড় থেকে জীবন ও চৈতন্যের উন্মেষ হল। প্রাণ ও চৈতন্য—জড় সত্তা থেকে উন্মেষিত গুণ বা ধর্ম। চৈতন্য গুণের উন্মেষের সঙ্গেই অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। শুদ্ধ গতি নূতন নূতন গুণের উন্মেষের দিকে অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করে। চৈতন্যের পর যে ধর্মের উন্মেষ হবে—আলেকজেণ্ডার তার নাম দিয়েছেন 'দেবসত্ত্ব'। তিনি বলেন, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি এই দেবসত্ত্বের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করে আছে। একদিন না একদিন বিশ্বের এই প্রতীক্ষা সফল হবেই। আলেকজেণ্ডার ব্যাপকতর অর্থেও 'দেবসত্ত্ব' (deity) শব্দটির ব্যবহার করেন। তাঁর মতে প্রত্যেকটি নূতন ধর্মকেই তার পূর্ববর্তী স্তরের তুলনায় 'দেবসত্ত্ব' বলা যেতে পারে। এই অর্থে জড়ের স্তরে প্রাণই দেবসত্ত্ব। আবার প্রাণের স্তরে মনই দেবসত্ত্ব। এখন মনের স্তরে আমরা আছি বলে অনাগত ধর্মকে দেবসত্ত্ব নামে অভিহিত করি। যখন এই অনাগত ধর্মের শুভাগমন হবে তখন সেই ধর্মকে আর দেবসত্ত্ব বলব না। এই নবাগত ধর্মের পরবর্তী স্তরেরই নাম থাকবে 'দেবসত্ত্ব'।

অভিব্যক্তির জন্য আলেকজেণ্ডার 'তেজনা' (Nisus) রূপ অভিব্যক্তির এক অনুকূল উত্তেজক শক্তি স্বীকার করেছেন। মন বা চৈতন্যের উন্মেষের আগে এই 'তেজনা' অচেতনধর্মী ছিল ; মনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মানস-ধর্মী ও উদ্দেশ্যধর্মী (teleological) হয়ে উঠেছে।

লয়েড্ মর্গান 'উন্মেষবাদ' (Emergent Evolution) নামক গ্রন্থে অভিব্যক্তি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন, অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার প্রত্যেক স্তরে উন্মেষিত গুণ বা ধর্ম (emergent attribute) লাভ করা যায়। অভিব্যক্ত বস্তুকে যোগসঞ্জাত (resultant) না বলে উন্মেষিতই (emergent) বলা উচিত। আলেকজেণ্ডার যেমন 'তেজনা' স্বীকার করেছেন, মর্গান তেমনি 'সক্রিয়তা' (activity) নামে অভিব্যক্তির অনুকূল একটি শক্তির অস্তিত্ব মেনে নিয়েছেন। তিনি এই সক্রিয়তাকে কখনও মন (mind), কখনও আত্মা (spirit), কখনও বা ঈশ্বর (God) নামে অভিহিত

করেছেন। মর্গানের মতে ঈশ্বর জাগতিক প্রক্রিয়ার উর্ধ্বে আকর্ষণী শক্তিরূপে কাজ করেন। তাঁর আকর্ষণেই সমস্ত অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া চলছে। মর্গানের এই মতবাদ আরিস্টটলের 'অতিবর্তী উদ্দেশ্যবাদ'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আরিস্টটলও সমস্ত গতিব নিয়ামকরূপে বিশ্বের উর্ধ্বে এক নিশ্চল ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন।

সমালোচনা: সেলার্স মনে করেন, শৃঙ্খলাহীন জড় বস্তু থেকেই প্রাণ ও মনের শৃঙ্খলার উন্মেষ হয়েছে। কিন্তু কি প্রক্রিয়ায় এই উন্মেষ সম্ভব হল—এ বিষয়ে সেলার্স কিছুই বলেন নি। উন্মেষ-প্রক্রিয়ার প্রযোজক কারণ না থাকলে উন্মেষ-প্রক্রিয়া কি ভাবে কাজ করে তা বোঝা যায় না। সেলার্স অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার প্রযোজক কারণের কথা কিছুই বলেন নি। সুতরাং সেলার্সের মতবাদ আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারে না।

স্যামুয়েল আলেকজেণ্ডার অভিব্যক্তির প্রযোজক কারণ হিসাবে 'তেজনা'র অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে মন বা চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে এই তেজনা অচেতনধর্মী ছিল। কোন অচেতনধর্মী তেজনা কি করে অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া পরিচালিত করে, তা আমরা বুঝি না। পরিচালনা বুদ্ধি-সাপেক্ষ ব্যাপার। বুদ্ধি না থাকলে কোন কিছুই পরিচালিত করা যায় না। সুতরাং কোন অচেতন তেজনাই অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করতে পারে না। আলেকজেণ্ডার মনে করেন, চৈতন্যের আবির্ভাবের পর তেজনা চৈতন্যধর্মী ও উদ্দেশ্যধর্মী হয়ে ওঠে। আমাদের মনে হয়, তেজনা সব সময়েই চৈতন্যধর্মী থাকে। কোন অচেতন তেজনাই কোন অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। সুতরাং আলেকজেণ্ডারের বক্তব্য সবাংশে গ্রহণ করা যায় না।

লয়েড্ মর্গান আরিস্টটলের 'অতিবর্তী উদ্দেশ্যবাদ'-এর মত অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্ববহির্ভূত ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। এই অধ্যায়েই 'অতিবর্তী-উদ্দেশ্যবাদ' আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা যে সব অসুবিধের কথা উল্লেখ করেছি, সেই সব অসুবিধেই লয়েড্ মর্গানের অভিব্যক্তিবাদ প্রসঙ্গে দেখা দেবে। সুতরাং মর্গানের মতবাদও গ্রহণ করা যায় না।

অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করা হল। আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি যে, একমাত্র অন্তঃস্যূত উদ্দেশ্যবাদের বিরুদ্ধেই কোন অভিযোগ উত্থাপন করা যায় না। সুতরাং যন্ত্রবাদ, উদ্দেশ্যবাদ, সৃজনবাদ ও উন্মেষবাদের মধ্যে একমাত্র অন্তঃস্যূত উদ্দেশ্যবাদের বক্তব্য গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্তঃস্যূত উদ্দেশ্যবাদীরা অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা'ই আমাদের মতে সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

মন বা আত্মা (Mind)

ভারতীয় দর্শনে মন ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে সাধারণতঃ মন বলতে অন্তরিন্দ্রিয় বোঝায়। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় দিয়ে আমরা বাইরের বস্তুর জ্ঞান লাভ করি। মন দিয়ে আমরা আমাদের সুখ-দুঃখের জ্ঞান পাই। সুতরাং মন আন্তর অবস্থার জ্ঞান দিয়ে থাকে। কাজেই মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলতে হয়। আত্মা বলতে সাধারণতঃ জ্ঞাতা বোঝায়। যিনি অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় দিয়ে জ্ঞান লাভ করেন, তিনিই আত্মা। অদ্বৈত বেদান্তে শুদ্ধ জ্ঞানকেই আত্মা বলা হয়েছে। যা হোক, ভারতীয় দর্শনে মন ও আত্মা যে পৃথক তা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমের দর্শনে মন ও আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্যরেখা টানা হয়নি। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরা মন ও আত্মা সমার্থক বলেই মনে করেন। আমরা এই অধ্যাযে মন বা আত্মার স্বরূপ আলোচনা করব।

আত্মা কি কোন আধ্যাত্মিক দ্রব্য ? (Is Mind any spiritual substance)

বিভিন্ন সময়ে আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার বিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন বা আত্মাও বিভিন্ন হয় না। মন বা আত্মা অভিন্ন ও অপরিবর্তিত থাকে বলেই বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আমাদের মনে থাকতে পারে। অভিজ্ঞতার বিভিন্নতা ও পরিবর্তনশীলতা একমাত্র অভিন্ন ও অপরিবর্তিত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করলেই ব্যাখ্যা করা যায়। সুতরাং আত্মাকে এক অপরিবর্তিত ও স্থির আধ্যাত্মিক দ্রব্যই বলা উচিত। এবকম অপরিবর্তিত আত্মাকে ইংরেজীতে সোল্ (Soul) শব্দ দিয়ে বোঝান হয়ে থাকে। পশ্চিমের অনেক দার্শনিকই আত্মা সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করেছেন। আমরা তাঁদের বক্তব্যের গুণাগুণ আলোচনা করছি।

প্রাচীন কালে লোকেরা আত্মাকে দেহের ছায়াময় প্রতিরূপ (shadowy duplicate of the body) বলে মনে করত। ঘুমের সময় এই ছায়াময় প্রতিরূপ দেহ ছেড়ে যায়। আবার ঘুম ভাঙ্গলেই এই প্রতিরূপ দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়। মৃত্যু দেহের সঙ্গে এই প্রতিরূপের আত্যন্তিক বিচ্ছেদ সূচনা করে। প্লেটোর আগে গ্রীক দর্শনে আত্মা বলতে এক জড় পদার্থই বোঝাত। কথনও

কখনও বায়ু বা বাষ্পকে আত্মা বলা হত। ডেমোক্রাইটাস্ আত্মাকে সূক্ষ্ম,মসৃণ ও গোলাকার অগ্নির পরমাণু দিযে সৃষ্ট বলে মনে করতেন। প্লেটোই প্রথম গ্রীক দর্শনে জড় ও আত্মার মৌলিক পার্থক্য স্বীকার করেন। গ্রীক দর্শনে সর্বপ্রথম প্লেটোই মনের আধ্যাত্মিক রূপ প্রকাশ করেছেন।

আত্মা সম্বন্ধে প্লেটোর মত :

প্লেটোর মতে মন বা আত্মার তিন ক্রিয়ার সাক্ষাৎ পাওযা যায়। আধুনিক কালে মনোবিজ্ঞানীরা চিন্তা (thinking), অনুভূতি (feeling) ও ইচ্ছা (will) বলে মনের যে তিন ভাগ করেছেন, প্লেটোর আত্মার তিন ক্রিযা অনেকটা তার অনুরূপ। প্লেটো চিন্তার বদলে প্রজ্ঞা (reason) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অনুভূতি বলতে তিনি কামনা (appetition) বোঝেন, আর ইচ্ছার বদলে 'শক্তি' (spirit) শব্দ ব্যবহার করেন। প্রজ্ঞাই আত্মার আসল রূপ। প্রজ্ঞা আত্মার দেব-সত্তা। এই প্রজ্ঞারূপ আত্মা যখন দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয, তখন তাতে কামনা ও শক্তির উদয হয। কামনা ও শক্তি আত্মার নীচ প্রবৃত্তি। দেহের সঙ্গে সঙ্গে এই নীচ প্রবৃত্তির উদয, আবার দেহের সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রবৃত্তির বিলয। জন্মের সময আত্মা দেহের সঙ্গে যুক্ত হয আর মৃত্যুর পর আত্মা দেহ থেকে বিযুক্ত হয়। সুতরাং জন্মের আগে ও মৃত্যুর পরে আত্মা শুদ্ধরূপে বা প্রজ্ঞারূপে বিরাজ করে। প্লেটো আত্মার অবিনশ্বরতায বিশ্বাস করেন। তাঁর মতে দেহ ধ্বংস হয়ে গেলেও দেহ থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হযে প্রজ্ঞারূপ আত্মা থাকতে পারে। সুতরাং দেহের সঙ্গে আত্মার কোন নিবিড় সম্পর্ক নেই।

আত্মা সম্বন্ধে আরিস্টটলের মত :

প্লেটোর শিষ্য আরিস্টটল আত্মা সম্বন্ধে গুরুর মত অনেকাংশেই গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি আত্মা ও দেহের নিবিড় সম্পর্ক স্বীকারের পক্ষপাতী। আত্মাকে তিনি দেহের আকার (form) বা সংগঠন (organisation) বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য আরিস্টটল আত্মাকে দৈহিক সংগঠন (physiological organisation) বলে মনে করেন না। তিনি আত্মার দেহাতিরিক্ত সত্তায় বিশ্বাস করেন। এ বিষয়ে গুরুর সঙ্গে তাঁর কোন মতানৈক্য নেই। তবে তাঁর মতে আত্মার জন্যই জীবদেহের গঠনবৈশিষ্ট্য অঙ্গাঙ্গী ভাব সম্ভব হয়। আত্মা যেন দেহের চালক বা নিয়ন্তা হিসেবে কাজ করে। কর্ণধার যেমন তরণী চালনা

করেন, তেমনি আত্মা দেহ পরিচালনা করেন। প্লেটোর মতই আরিস্টটল প্রজ্ঞাকেই আত্মার স্বরূপ বলে মনে করেন। সুতরাং আরিস্টটলের মতে স্বরূপতঃ আত্মা এক অধ্যাত্ম তত্ত্ব বা দ্রব্যবিশেষ ; এই অধ্যাত্মতত্ত্ব অজর ও অমর।

মধ্য যুগের অধিকাংশ চিন্তানায়কই প্লেটো ও আরিস্টটলের মত আত্মাকে এক অধ্যাত্মতত্ত্ব বলে মনে করতেন। আধুনিক কালে ডেকার্টে, লক ও বার্কলি প্লেটো-আরিস্টটলের চিন্তাধারার উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছেন। তাঁরা সকলেই আত্মা বলতে এক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা দ্রব্য বোঝেন।

আত্মা সম্বন্ধে ডেকার্টে, লক ও বার্কলির মত :

ডেকার্টে আত্মা বলতে জড় থেকে সম্পূর্ণ বিবিক্ত এক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বুঝেছেন। ডেকার্টের মতে বিস্তৃতিই জড়ের স্বরূপলক্ষণ। আত্মার কোন বিস্তৃতিই নেই। জড় নিশ্চেতন। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। আত্মা এক সরল ও অবিভাজ্য আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। সমস্ত কিছুই সন্দেহ করা যায়, কিন্তু আত্মাকে সন্দেহ করা যায় না। আত্মাকে সংশয় করতে গেলে সংশয়-কর্তা হিসেবে আত্মাকে স্বীকার করতে হয়। সুতরাং ডেকার্টের মতে, আত্মার অস্তিত্ব একান্ত-ভাবেই সন্দেহাতীত।

লক্ আত্মাকে সুখ-দুঃখ প্রভৃতি অনুভূতির অজ্ঞাত আধার বলে মনে করেন। এই অজ্ঞাত আধার জড় থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যদিও এই আত্মা কখনও কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না, তবু সুখ-দুঃখের আধার হিসেবে এই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। আত্মা না থাকলে সুখ, দুঃখ প্রভৃতির থাকবার কোন জায়গা থাকে না। সুখ-দুঃখ শূন্যে ভেসে বেড়াতে পারে না। সুতরাং সুখ-দুঃখের একটা আধারের কল্পনা একান্ত অপরিহার্য। এই আধারই আত্মা। আত্মা অধ্যাত্মরূপ ও অবিনশ্বর। অপরোক্ষ অনুভূতিতে (intuition) আত্মার অস্তিত্ব জানা যায়।

বার্কলি জড় বলে কোন দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁর মতে সব দ্রব্যই চেতনাত্মক বা চৈতন্যধর্মী (spiritual)। জড় বলে যা আমরা জানি তা মনের ধারণা মাত্র। কিন্তু আত্মা বা মন মনের ধারণা মাত্র নয়। আত্মা ছাড়া কোন ধারণাই হয় না। এই আত্মার কোন সাধারণ[১] ধারণা হয় না। আত্মা সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যয়ই (notion) হয়ে থাকে। আত্মা এক অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব।

১। Ordinary

সমালোচনাঃ হিউম ও কাণ্ট বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 'আত্মা এক অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব' এই মতবাদ আক্রমণ করেছেন। আমরা এই মতবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে হিউম ও কাণ্টের এই আক্রমণই আলোচনা করব।

হিউম বলেন, আত্মা নামে এক অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই। সমস্ত আন্তর অবস্থারই অন্তর্দর্শন (introspection) হয়। যা অন্তর্দর্শনে পাওয়া যায় না তা অন্তরে আছে, এমন কথা বলা যায় না। কোন অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অন্তর্দর্শন হয় না। সুতরাং অবিনশ্বর আত্মা বলে কিছু নেই। হিউম বলেন, 'আমার দিক থেকে যখনই আমি অন্তরঙ্গ ভাবে আমার মধ্যে প্রবেশ করি, আমি সর্বদাই কোন না কোন সংবেদন পাই ; কখনও গরম কখনও ঠাণ্ডা, কখনও আলো কখনও ছায়া, কখনও ভালবাসা কখনও বিদ্বেষ, কখনও দুঃখ কখনও বা সুখ। আমি কখনও কোন সংবেদন ছাড়া কিছুই প্রত্যক্ষ করি না।'[১] হিউমের মতে সমস্ত জ্ঞানই প্রত্যক্ষ থেকে আসে। সুতরাং সচেতন প্রত্যক্ষে আত্মা বলে কিছু না পাওয়ায় আত্মা নামে এক অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন পরিবর্তনশীল কতগুলো আন্তর সংবেদনই পেয়ে থাকি, কোন অপরিবর্তিত আত্মা পাই না। সুতরাং আত্মা বলে কিছু নেই।

কাণ্টের মতে আত্মাকে আধ্যাত্মিক দ্রব্য বললে অনুপপত্তির উৎপত্তি হয়। যখন আমরা আত্মাকে সরলতা (simplicity), অমরতা (immortality), বিবিক্ততা (separability from body) প্রভৃতি গুণযুক্ত আধ্যাত্মিক দ্রব্য বলে ভাবি, তখন আত্মা জ্ঞানের বিষয় হয়ে যায়। এমনি করেই প্রত্যেকেই আত্মাকে জ্ঞানের বিষয়ে পরিণত করে। কিন্তু আত্মা জ্ঞাতা। সুতরাং তা অন্যান্য বস্তুর মত জ্ঞেয় হতে পারে না। কাজেই আত্মা সম্বন্ধে দ্রব্যত্ব, অমরতা প্রভৃতি কোন গুণই প্রযোজ্য হতে পারে না। সুতরাং আত্মা বলে কোন আধ্যাত্মিক দ্রব্য নেই।

আত্মাকে আধ্যাত্মিক দ্রব্য বললে তা কখনও আমাদের বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা-গুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন

১। "For my part, when I enter most intimately into what I call myself, I always stumble on some particular perception or other, of heat or cold, light or shade, love or hatred, pain or pleasure. I can never catch myself at any time without a perception and never can observe anything but the perception."

সময়ে আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাগুলোকে একত্রিত না করলে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায় না। আধ্যাত্মিক দ্রব্য সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। সুতরাং এই আত্মা সক্রিয়ভাবে অভিজ্ঞতাগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করতে পারে না। আত্মাকে অভিজ্ঞতার নিষ্ক্রিয় আধার বলা হয়। কিন্তু এই আধার অভিজ্ঞতাগুলোকে একসূত্রবদ্ধ করতে পারে না। কারণ একসূত্রবদ্ধ করার জন্য যে সক্রিয়তার দরকার তা আত্মার নেই। মন বা আত্মা যদি সক্রিয়ভাবে সংবেদনগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত বা ব্যাখ্যা না করে তবে জ্ঞান হতে পারে না। মনে করুন, বাইরের আলোর সঙ্গে চোখ সন্নিকৃষ্ট হল। এই সন্নিকর্ষের ফলে চোখের স্নায়ুতে চাঞ্চল্য দেখা দেবে। মন যখন সক্রিয়ভাবে এই চাঞ্চল্য ব্যাখ্যা করে তার উৎসের নাম দেবে আলো, তখনই আলোর ধারণার সৃষ্টি হবে। এমনি ক'রে মনের অন্যরকম ব্যাখ্যা থেকে 'লাল' রঙের ধারণা পাওয়া যায়। মন যখন এই দুই ধারণা মিলিয়ে দেয় তখন 'আলো লাল'—এই পূর্ণজ্ঞান লাভ করা যায়। সুতরাং জ্ঞান-ব্যাপারে মন বা আত্মার সক্রিয়তা স্বীকার করতে হয়। কাজেই আত্মা কোন নিষ্ক্রিয় আধ্যাত্মিক দ্রব্য হতে পারে না।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, আত্মাকে আধ্যাত্মিক দ্রব্য বললে নানা রকমের অসুবিধে দেখা দেয়। সুতরাং আত্মাকে কোন আধ্যাত্মিক দ্রব্য বলা যায় না।

আত্মা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষবাদী মতবাদ
(The Empirical Theory of Mind)

প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদের মতে, প্রত্যক্ষই জ্ঞান লাভের একমাত্র পথ। যা প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না তার অস্তিত্বও স্বীকার করা যায় না। প্রত্যক্ষ-বাদীদের বক্তব্য হিউমের চিন্তাধারায় সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং আত্মা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষবাদী মতবাদ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা আত্মা সম্বন্ধে হিউমের মতবাদই আলোচনা করব।

হিউম বলেছেন, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে কোন অপরিবর্তিত আত্মার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। প্রত্যক্ষজ্ঞানে সব সময়েই কতগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন পরিবর্তনশীল অনুভূতি বা মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং আত্মা বা মন বলতে এই বিচ্ছিন্ন অনুভূতি বা মানসিক অবস্থাগুলোর সমষ্টিকেই বোঝায়।

অনুভূতি বা মানসিক অবস্থার পেছনে অপরিবর্তিত আত্মা বলে কিছু নেই। সুখ-দুঃখ, রাগ-বিরাগ, প্রীতি-দ্বেষ ও এই জাতীয় বিভিন্ন মানসিক অবস্থা ও প্রক্রিয়াগুলো একত্র হয়েই মনের সৃষ্টি করে। এই সমস্ত বিভিন্ন মানসিক অবস্থার ঐক্য অনুসঙ্গের সূত্র (Laws of Association) দিয়ে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। পরস্পর বিচ্ছিন্ন মানসিক অবস্থার ঐক্যের জন্য কোন পৃথক অপরিবর্তিত তত্ত্বের স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই।

সমালোচনা: কাণ্ট হিউমের এই মতবাদকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। তাঁর মতে কোন ঐক্য ছাড়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন কতগুলো অনুভব থাকতে পারে না। কাণ্টের মতে মন বিচ্ছিন্ন অনুভবরাজির ঐক্য-বিধায়ক এক প্রক্রিয়া বি.শষ (unity of apperception), এই প্রক্রিয়া সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তির মূলেই থাকে। এই প্রক্রিয়া না থাকলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন অনুভবগুলো ঐক্যবদ্ধ হত না, আর অনুভবগুলো ঐক্যবদ্ধ না হলে কোন জ্ঞানেরই সৃষ্টি হত না। হিউম যে মনে করেন অনুষঙ্গের নিয়ম বিচ্ছিন্ন অনুভবের ঐক্য বিধান করে, তা মানা যায় না। কারণ স্মৃতি না হলে অনুষঙ্গের নিয়ম থাকতে পারে না। হিউমের মতে পাশাপাশি থাকা অনুষঙ্গের একটি নিয়ম (Law of Contiguity)। পাশাপাশি যে সমস্ত অনুভব হয় তা সংযুক্ত হতে পারে তখনই যখন তারা বারবার দেখা দেয়। এই সংযোগের জন্য বিশেষ অনুভব যে আগে ও পাশাপাশি ছিল তার স্মৃতি থাকা দরকার। মনের স্বরূপেই যদি কোন ঐক্য না থাকে তবে এই স্মৃতি হতে পারে না। যা আগে প্রত্যক্ষ হয়েছিল তা মনে থাকলেই ত' স্মৃতি হতে পারে। সুতরাং স্মৃতির ব্যাখ্যার জন্য মনের ঐক্য স্বীকার করা দরকার। কাজেই মনের ঐক্য না থাকলে কোন অনুষঙ্গের নিয়মই কাজ করতে পারে না। মনের যদি কোন স্বরূপগত ঐক্য না থাকে তবে প্রত্যভিজ্ঞা (recognition)-ও হতে পারে না। পূর্বজ্ঞাত অভিজ্ঞতাকে পূর্বজ্ঞাত বলে জানার নামই প্রত্যভিজ্ঞা। যে রামবাবুকে আমি কাল দেখেছি, তাঁর ধারণা আমার মনে অবিকৃত ভাবে না থাকলে, আজ আবার তাঁকে দেখলে কালকের রামবাবু বলে চিনতে পারি না। সুতরাং রামবাবুকে কালকের রামবাবু বলে চিনতে হলে তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা পরিবর্তনশীল হতে পারে না। আমার ধারণা পরিবর্তনশীল না হলে আমিও পরিবর্তনশীল হতে পারি না। অর্থাৎ আমার যে একটা ঐক্য বা অভেদ আছে, তা স্বীকার করতে হয়। সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে হলে মনের ঐক্য স্বীকার করতে হয়।

কাণ্ট বলেন, বিচ্ছিন্ন অনুভব আমাদের জ্ঞানের বিষয়। অর্থাৎ আমাদের বিচ্ছিন্ন অনুভবগুলিকে আমরা জানতে পারি। আত্মা বা মন জ্ঞাতা, জ্ঞানের বিষয় নয়। অর্থাৎ মনই অনুভবগুলোকে জানে। সুতরাং হিউম যে বলেছেন, আত্মা বা মন বিচ্ছিন্ন অনুভবের সমষ্টিমাত্র—তা হতে পারে না।

আমাদের অনুভব সহস্ররূপে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু অনুভবের শত পরিবর্তন সত্ত্বেও আমাদের ব্যক্তিগত অভেদ (Personal identity) কখনও লুপ্ত হয় না। যে আমি শিশু ছিলাম, সেই আমিই আজ যুবক হয়েছি। এক-দিন সেই আমিই বৃদ্ধ হব। সুতরাং আমার বহু পরিবর্তনের মধ্যেও আমি একই আছি। কাজেই আমার আত্মা বা মনের ঐক্য অস্বীকার করা যায় না। হিউম আত্মা বা মনের স্বরূপগত কোন ঐক্য স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁর মতবাদে ব্যক্তিগত অভেদের কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা মেলে না।

নৈর্ব্যক্তিক অনুভব বলে কিছু নেই। অনুভব 'আমার অনুভব' বা 'তোমার অনুভব' বা 'তার অনুভব' হয়েই দেখা দেয়। সুতরাং অনুভব যে কোন মন বা আত্মা লগ্ন হয়ে থাকে তা অস্বীকার করা যায় না। কাজেই অনুভব ও মন এক হতে পারে না।

হিউম মনের ঐক্য খুঁজতে গিয়ে কতগুলো বিচ্ছিন্ন মানসিক অবস্থার সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তার ফলে তিনি ধারণা করেছেন, মনের কোন স্বরূপগত ঐক্য নেই। আমাদের মনে হয়, এই ক্ষেত্রে হিউমের দৃষ্টিভ্রম হয়েছে। কেউ যদি বনে যায় তবে ত' সে কতগুলো গাছই দেখবে। কিন্তু তা বলে সেখানে শুধু গাছ আছে, কোন বন নেই—এমন কথা বলা যায় না। তেমন মন খুঁজতে গিয়ে কতগুলো মানসিক অবস্থা পাওয়া গেলেও এই অবস্থাগুলোর মধ্যে অন্তঃস্যূত হয়ে মনও থাকে তা স্বীকার করতে হয়। সুতরাং হিউম মানসিক অবস্থাগুলোকেই মন বলে ভ্রম করেছেন।

আলোচনা করে বোঝা গেল যে, আত্মা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষবাদী হিউমের মতবাদ নানা দোষে দুষ্ট। আমরা আগেই বলেছি, হিউম আত্মা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষবাদী মতবাদ অত্যন্ত পরিষ্কার করে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং আত্মা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-বাদীদের মতবাদও দোষদুষ্ট।

আত্মা সম্বন্ধে কাণ্টের মতবাদ

কাণ্ট আত্মা সম্বন্ধে 'দ্রব্য মতবাদ' ও 'প্রত্যক্ষবাদী মতবাদ' উভয়ই খণ্ডন করেছেন। আমরা 'দ্রব্য মতবাদ' ও 'প্রত্যক্ষবাদী মতবাদ' আলোচনা

প্রসঙ্গে কাণ্টের খণ্ডন-যুক্তি আলোচনা করেছি। পুনরুক্তি পরিহারের জন্য এখানে আর খণ্ডন-যুক্তির অবতারণা করব না।

স্বমত-প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কাণ্ট বলেছেন, আত্মা কোন আধ্যাত্মিক দ্রব্য নয়, আবার তা বিচ্ছিন্ন অনুভবের সমষ্টিও নয়। তিনি মনে করেন, আত্মা বা মন জ্ঞানের প্রাগুপকরণ (pre-condition) বিশেষ। আত্মা বা মন না থাকলে কোন জ্ঞানই সম্ভব নয়। এই আত্মা জানা যায় না। কিন্তু এই আত্মা না থাকলে কোন জ্ঞানই হয় না। এখানে প্রশ্ন ওঠে—এই আত্মার স্বরূপ কি? কাণ্ট বলেন, আত্মা বা মন বিচ্ছিন্ন অনুভবরাজির (intuitions) চরম ঐক্য-বিধায়ক প্রক্রিয়া বিশেষ (transcendental unity of apperception)। কথাটা ব্যাখ্যা করা দরকার। কাণ্ট মনে করেন, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কতগুলো বিচ্ছিন্ন অনুভব সংবেদনে (sensibility) পাওয়া যায়। এই বিচ্ছিন্ন অনুভবগুলো কোন জ্ঞান নয়। বিচ্ছিন্ন অনুভবগুলো যখন বুদ্ধির ঐক্যবিধায়ক আকারে (categories of understanding) আকারিত হয়, তখনই জ্ঞান পাওয়া যায়। বুদ্ধির ঐক্যবিধায়ক আকারগুলো এক চরম ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এই চরম ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়ার নাম আত্ম-চৈতন্য বা মন (self-consciousness)।

কাণ্টের মতে, বস্তু এমন জিনিস যার ধারণায় অনুভবরাজির ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। টেবিল একটি বস্তু, কারণ টেবিলের ধারণায় রঙ, আকার প্রভৃতি বিভিন্ন অনুভব একত্রিত হয়েছে। বিভিন্ন অনুভবের একত্রীকরণ আত্মা বা মনের চরম ঐক্য দ্বারাই সম্ভব। অর্থাৎ মন অনুভবগুলোর মধ্যে ঐক্যসূত্র প্রতিষ্ঠা করে বলেই বস্তুর জ্ঞান সম্ভব হয়। সুতরাং জ্ঞানের জন্য মনের ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়ার স্বীকৃতি একান্ত আবশ্যক। এই ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়ার কোন আত্যন্তিক সত্তা (transcendental reality) নেই। জ্ঞানের ব্যাপারেই এই প্রক্রিয়ার স্বীকৃতি দরকার। সুতরাং মনের বা আত্মার এক জ্ঞান-বিধায়ক সত্তাই আছে।

নীতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কাণ্ট অমর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, আত্মাকে অমর না বললে নৈতিক নিয়মের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা যায় না। কাণ্টের মতে মানুষের দেব-স্বভাব (rationality) যখন পশুস্বভাবকে (sensibility) সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, তখনই নৈতিক জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করা যায়। মানুষের পশুস্বভাব সহজে দেবস্বভাবের নিয়ন্ত্রণ মেনে চলে না। এর জন্য জন্ম-জন্মের সাধনা দরকার। সুতরাং কাণ্ট নৈতিক আদর্শের সার্থকতা প্রতিপন্ন করার জন্য

আত্মার অমরতা স্বীকার করেছেন। এই আত্মা পারমার্থিক আত্মা। এই আত্মা শুদ্ধ প্রজ্ঞায় (pure reason) জানা যায় না। ব্যবহারিক প্রজ্ঞাতেই (practical reason) এই আত্মাকে জানা যায়।

সমালোচনা: কান্টের মতে জ্ঞাতা আত্মা বা মন জ্ঞানের বিষয় থেকে স্বতন্ত্র। মন পরস্পর অনুভবরাজির পশ্চাৎস্থিত এক ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়া বিশেষ। কিন্তু অনুভবরাজির বিচ্ছিন্নতা থেকে বিযুক্ত এই ঐক্য প্রক্রিয়া একটা নৈয়ায়িক ধারণা মাত্র (logical abstraction), বাস্তব ব্যাপার নয়। বিচ্ছিন্নতাব মধ্য দিয়ে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাই বাস্তব (real)। হেগেল আত্মাকে এই রকম এক ঐক্য বলেই মনে করেছেন। আমাদের ধারণা, এ বিষয়ে হেগেলের বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য।

কান্ট অবভাস ও বস্তু-স্বরূপের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে আত্মা বা মন জ্ঞানের প্রাগুপকরণ বিশেষ। পারমার্থিক আত্মা কখনই সাধারণভাবে জানা যায় না। আমাদের মনে হয়, আত্মা বা মন তার বিভিন্ন অবভাসের মধ্যে জানা যায়। বিভিন্ন বস্তুজ্ঞানের ঐক্য আত্মৈক্যেরই প্রকাশ। সুতরাং বিভিন্ন বস্তু-জ্ঞানের মধ্যেই আত্মাকে জানা যায়।

আত্মা বা মন সম্বন্ধে কয়েকটি আধুনিক মতবাদ:

উইলিয়ম জেমস্ আত্মা বা মনকে চৈতন্যপ্রবাহ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, মন কতগুলো বিচ্ছিন্ন অনুভবের সমষ্টিমাত্র নয়। পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত অনুভব-প্রবাহই মন। এই প্রবাহে কোন ছেদ, ভঙ্গ বা থামা নেই। নিদ্রা বা মূর্ছা চৈতন্যপ্রবাহের রুদ্ধতা সূচনা করে না। মূর্ছিত ব্যক্তি মূর্ছা থেকে উঠে সে মূর্ছিত ছিল তা মনেই করে না। তার কাছে কোন সময়ক্ষেপের ধারণাই হয় না। নিদ্রিত ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে নিদ্রার পূর্বের ও পরের অবস্থা তারই বলে মনে করে। সুতরাং তার কাছে তার চৈতন্যের কোন বিচ্ছিন্নতা বা ভঙ্গই অনুভূত হয় না। এভাবে চৈতন্য-প্রবাহের অখণ্ডতা ও অবিচ্ছিন্নতাই লক্ষ্য করা যায়।

আমাদের মনে হয়, মন শুধু মাত্র একটা অনুভব-প্রবাহ নয়। অনুভব-প্রবাহকে প্রবাহ বলে জানতে গেলে এক অপেক্ষাকৃত নিশ্চল মনের কল্পনা করতে হয়। সুতরাং মন বা আত্মা পরিবর্তিত অনুভবের পরিবর্তনের মধ্যে এক ঐক্যকেই বোঝায়। শুধু পরিবর্তিত অনুভবগুলোই মন হতে পারে না।

ব্যবহারবাদ (Behaviourism)

আধুনিককালে মনের জগতে পরীক্ষণ-প্রণালী (Experimentation) ব্যবহার করার জন্য ব্যবহারবাদের উদ্ভব হয়েছে। এতদিন লোকের ধারণা ছিল, মন অন্যান্য বস্তুর মত সাধারণ বিষয়াকারে জানা যায় না; মনকে জানতে গেলে অন্তর্দর্শন (introspection) প্রক্রিয়ার ব্যবহার করতে হয়। অন্তর্দর্শন ব্যক্তিগত ব্যাপার। অন্তর্দর্শনে বিশেষ ব্যক্তি-মনেরই জ্ঞান পাওয়া যায়, সকলের মনের কোন জ্ঞানই পাওয়া যায় না। সুতরাং অন্তর্দর্শনে সকলের মনের যদি কোন জ্ঞান না পাওয়া যায়, তবে মন নিয়ে কোন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং সকলের মনের জ্ঞান লাভের জন্য মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষণ-প্রণালী বা বস্তুবিজ্ঞান-প্রণালী (objective method) ব্যবহার করতে হয়। সাধারণ লোকে মন বলতে যা বোঝে তা কখনও জ্ঞানের বিষয় হিসেবে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই মনের ক্ষেত্রে কোন বস্তুবিজ্ঞান-প্রণালী বা পরীক্ষণ-প্রণালীই ব্যবহার করা যায় না। মনের ক্ষেত্রে বস্তুবিজ্ঞান-প্রণালী বা পরীক্ষণ-প্রণালীর ব্যবহারের জন্য ব্যবহারবাদী মনোবিজ্ঞানীরা মনের ধারণাই বদলে দিয়েছেন। তাঁদের মতে, আমাদের প্রত্যক্ষ উত্তেজনার (stimulus) ফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া মাত্র। বাইরের কোন বস্তুর সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয়, তখন স্নায়ুতন্ত্রে উত্তেজনার ফলে দেহে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ব্যবহারবাদীদের মতে এই প্রতিক্রিয়াই প্রত্যক্ষ। এই প্রক্রিয়াকে দেহের ব্যবহারও বলা যেতে পারে। সুতরাং ব্যবহারবাদীদের মতে ব্যবহারই প্রত্যক্ষ। অনেক দার্শনিকই অনুভবের ঐক্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মন বা আত্মা বলে এক আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। ব্যবহারবাদীদের মতে, জীবদেহই (Bodily Organism) ব্যবহার বা তথাকথিত অনুভবের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করে থাকে। সুতরাং জীবদেহ ও তার ব্যবহার ছাড়া মন বা আত্মা বলে কিছু নেই।

ব্যবহারবাদী দার্শনিক গোষ্ঠীর নেতা ওয়াট্‌সন মনে করেন, মনোবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় দেহের প্রতিক্রিয়া বা ব্যবহার মাত্র। সুতরাং বহির্বিশ্বের বিভিন্ন উত্তেজনার বিভিন্ন দৈহিক প্রতিক্রিয়ার সমষ্টির নামই মন। চৈতন্য বলে কিছু নেই। চৈতন্যের বিভিন্ন অবস্থা ও প্রক্রিয়া বলে যা পরিচিত, আসলে তা দেহেরই বিভিন্ন ব্যবহার মাত্র। পাভ্‌লভ্‌ (Pavlov) বিভিন্ন পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে ব্যবহারবাদীদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। ব্যবহার-বাদীদের মতে মানসিক ক্রিয়াগুলো দেহ-যন্ত্রের বিভিন্ন ক্রিয়ামাত্র।

সমালোচনা ঃ ব্যবহারবাদীরা মন বলতে দেহের ব্যবহারই বোঝেন। তাঁদের মতে দেহের ব্যবহার ছাড়া চৈতন্য বলে কিছু নেই। আমাদের মনে হয়, দেহের ব্যবহারকে ব্যবহার বলে জানতে গেলে চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। সুতরাং চৈতন্যের অস্তিত্ব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

মন বা আত্মা জ্ঞাতা, কিন্তু জ্ঞানেব বিষয় নয়। যে জানে তাকেই বলে মন। ব্যবহারবাদীরা বলেন, দেহের ব্যবহারই মন। দেহের ব্যবহার জ্ঞানের বিষয়। সুতরাং জ্ঞানের বিষয় দেহেব ব্যবহার কি করে জ্ঞাতা মন বা আত্মা হতে পারে, তা আমরা বুঝি না।

অন্তর্দর্শনেই আত্মজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আমার মন আমি অন্তর্দর্শনেই জানি। আমার মানসিক কি কি অবস্থার সঙ্গে আমার কোন্ কোন ব্যবহার সংযুক্ত, তা আমি দেখি। তারপর যখন অন্যের ব্যবহার দেখি, তখন সে ব্যবহার থেকে তাদের মনের অবস্থা কল্পনা করে নিই। এমনি করেই সকল মনের জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে। পরের ব্যবহার দেখে তাদের মানসিক অবস্থা কল্পনা করে নিই বলে তাদের ব্যবহারই তাদের মন নয়। ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা তাদের মানসিক অবস্থা কল্পনা করি মাত্র।

নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে আত্মা ঃ

নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা মন বা আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে বিষয়গত বলে মনে করেন। সাধারণতঃ আমরা মন বলতে বিষয়ী বুঝি। কিন্তু নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের মতে জ্ঞানের বিষয়ের এক বিশেষ গ্রন্থনই মন। নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের অন্যতম হোল্ট বলেন, মন বা চৈতন্য স্নায়বিক চক্রের সংক্ষোভ নির্দিষ্ট বিশ্বের একটা অংশ বিশেষ (Cross-section of the Universe selected by the specific response of the nervous system)। বস্তুর সঙ্গে স্নায়বিক চক্রের সন্নিকর্ষ হলেই সেই বস্তু অন্য সব বস্তু থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই বস্তুই জ্ঞানের বিষয়, আর এ বস্তুই মন বা চৈতন্য। সুতরাং বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে, জ্ঞানের বিষয় ছাড়া বিষয়ী মন বা আত্মা বলে কিছু নেই; জ্ঞানের বিষয়ই মন বা চৈতন্য।

আমরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞানের বিষয়ী—এই দুই ভাগ স্বীকার করি। যখন বলি 'আমি আগুন জানি', তখন 'আমি' জ্ঞানের বিষয়ী আর 'আগুন' জ্ঞানের বিষয়। আমি আর আগুন যে এক নই, একথা সাধারণতঃ সবাই স্বীকার করবেন। কিন্তু নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা জ্ঞানের

বিষয় ও জ্ঞানের বিষয়ীর তফাৎ স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে 'আমি' ও 'আগুন' একই বস্তু। কিন্তু এমন অদ্ভুত কথা কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। মন বা আত্মা জ্ঞানের বিষয় নয়, আত্মা জ্ঞানের বিষয়ী বা জ্ঞাতা—একথা স্বীকার করতেই হবে।

আমরা আত্মা সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক অনেক দার্শনিকেরই মতবাদ আলোচনা করেছি। কিন্তু কোন মতবাদই আমাদের যুক্তির কষ্টিপাথরে টিকল না। এখন প্রশ্ন ওঠে—তবে আত্মার স্বরূপ কি হবে? আমাদের মনে হয়, মনের স্বরূপ সম্বন্ধে হেগেল যা বলেছেন, তাই যুক্তি-যুক্ত বলে গ্রহণ করা যায়। আত্মা সম্বন্ধে হেগেলের মতবাদ পুরুষবাদ (The Personalistic theory) নামে পরিচিত। আমরা এখন পুরুষবাদের তাৎপর্য আলোচনা করব।

পুরুষবাদ (Personalistic Theory):

জার্মান দার্শনিক হেগেল আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে পুরুষবাদের সমর্থক। পুরুষ-বাদের মতে, আত্মা বা মন কোন আধ্যাত্মিক দ্রব্য নয়, আবার বিচ্ছিন্ন অনুভবরাজির সমষ্টিমাত্রও নয়। মনকে বিচ্ছিন্ন অনুভবরাজির ঐক্যবিধায়ক শুদ্ধ প্রক্রিয়াও বলা যায় না। এক ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়া-সম্বদ্ধ অনুভবের নামই মন বা আত্মা। এই ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন অনুভবগুলোকে একত্র করে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত পুরুষ বা আত্মা গড়ে তোলে। সুতরাং আত্মাকে পুরুষও বলা যায়। আত্মা বা পুরুষের ঐক্য বিভিন্ন অনুভবের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই লাভ করা যায়। অনুভবের বৈচিত্র্য-বিযুক্ত ঐক্য কোন বস্তুর তত্ত্ব নয়, এটা মনের ধারণামাত্র। অনুভবের বিভিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে যে ঐক্য পাওয়া যায়, তাই জীবন্ত ঐক্য। বিভিন্ন অনুভবের মধ্য দিয়েই পুরুষ তার এই জীবন্ত ঐক্য খুঁজে পায়। আত্মার ঐক্য বিচ্ছিন্ন অনুভবের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক-সঞ্জাত ঐক্য। সুতরাং পুরুষবাদের মতে, আত্মা এক সক্রিয় গতিশীল ভেদ-পুষ্ট ঐক্য তত্ত্ব বিশেষ। অভিজ্ঞতা যতই বৃদ্ধি পায়, এই ঐক্য ততই সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং পূর্ণ পুরুষ সমস্ত বর্তমান ও সম্ভাব্য অনুভবের ঐক্য সূচনা করে। এই ঐক্যের পুণ্য স্পর্শ থেকে কোন অনুভবই বঞ্চিত হয় না। আমরা সাধারণ সসীম মানুষ এই ঐক্যকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছি। নিজেদের জীবনে এই আদর্শ ঐক্যকে ধীরে ধীরে লাভ করার চেষ্টাই আমাদের সাধনা। ঈশ্বর বা ব্রহ্মই পরম পুরুষ। সমস্ত মানুষ এই পরম পুরুষের অসম্পূর্ণ প্রকাশ মাত্র।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দেহ ও মনের সম্পর্ক

(Relation between Body and Mind)

দেহ ও মনের নিবিড় সম্পর্ক আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি। দেহ যদি সুস্থ হয় তবে মনও প্রফুল্ল থাকে; আর মন যদি বিষণ্ণ থাকে তবে দেহেও তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। দেহ ও মনের এই নিবিড় সম্পর্ক ত্রিবিধ উপায়ে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে।

সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দেহ ও মনের নিবিড় সম্পর্ক আমরা হামেসাই দেখতে পাই। শরীর যখন অত্যন্ত শ্রান্ত হয়, তখন কোন মানসিক কাজই করতে ইচ্ছা হয় না। মাথায় আঘাত লাগলে অনেক সময় চৈতন্য লুপ্ত হয়ে যায়। আবার অন্যদিকে কতগুলো মানসিক অনুভূতির দৈহিক প্রকাশ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবেই দেখতে পাই। মনে খুব আনন্দ হলে মুখ-ভঙ্গিমায় নিশ্চয়ই তা প্রকাশিত হবে। মানুষ ক্রুদ্ধ হলেও তার কতগুলো দৈহিক পরিবর্তনে ক্রোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং সাধারণ পর্যবেক্ষণেই দেহ ও মনের নিবিড় সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

পরীক্ষামূলক প্রমাণ (Experimental 'Evidences) ঃ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, মানুষ যদি গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকে তবে তার মাথায় স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অনেক বেশী রক্তের সঞ্চার হয়। কখনও কখনও বেশী চিন্তা করায় মাথা ধরে। আবার কোন কোন ওষুধ খেলে দেহে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তার ফলে কখনও কখনও চৈতন্য পর্যন্ত লুপ্ত হয়। সুতরাং দেহ ও মনের নিবিড় সম্পর্ক স্বীকার না করে উপায় নেই।

দেহতত্ত্বের প্রমাণ ঃ দেহতত্ত্ব (Anatomy) আলোচনা করলে বোঝা যায় মস্তিষ্কের জটিলতার সঙ্গে চিন্তার জটিলতার সম্পর্ক আছে। যে-সমস্ত প্রাণীর চিন্তা করার ক্ষমতা বেশী তাদের মস্তিষ্কের জটিলতা, যে-সমস্ত প্রাণীর চিন্তা করার ক্ষমতা কম, তাদের চেয়ে অনেক বেশী। প্রতিভাবান লোকের মাথার ওজন নাকি সাধারণ মানুষের মাথার ওজনের চেয়ে বেশী হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, দেহ ও মনের নিবিড় সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই নিবিড় সম্পর্কের আসল রূপ কি তা বোঝা মুশকিল। বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্নভাবে এই সম্পর্কের প্রকৃতি আলোচনা

করেছেন। আমরা এই অধ্যায়ে দেহ ও মনের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করে নিজেদের সিদ্ধান্তে পৌছতে চেষ্টা করব।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ (The Inter-action Theory or Inter-actionism) :

ডেকার্টে দেহ ও মনের সম্পর্ক প্রসঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের সমর্থক। তিনি মনে করেন, দেহ ও মন সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই দ্রব্য। দেহ বিস্তৃতিসম্পন্ন, কিন্তু মনের কোন বিস্তৃতি নেই। দেহ নিশ্চেতন, কিন্তু মন চৈতন্যস্বরূপ। দেহ যান্ত্রিক নিয়মের অধীন, মন উদ্দেশ্য বা আদর্শ দিযে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং দেহ ও মনের মধ্যে একটা দ্বৈতই লক্ষ্য কবা যায়। কিন্তু ডেকার্টে মনে করেন, দেহ ও মন সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিযা হয়ে থাকে। জ্ঞানের বেলায় দেহ মনেব ওপব কাজ করে, আর কাজ করাব সময মন দেহেব ওপর প্রভাব বিস্তাব কবে। কোন কিছু জানতে গেলে ইন্দ্রিযেব সঙ্গে বস্তুর সন্নিকর্ষ হয়। এই সন্নিকর্ষ দেহেব স্নায়ুতন্ত্রীতে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। মন যখন এই উত্তেজনার কারণ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা দেয়, তখনই জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। সুতরাং জ্ঞানলাভের সময় দেহ মনের ওপর কোন একটা উত্তেজনা চাপিয়ে দেয়, তার ফলেই জ্ঞান হয়। মনে যদি কাজ করার ইচ্ছা না থাকে তবে কাজ করা যায় না। কাজ করতে গেলে দেহ-সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। সুতরাং মনের ইচ্ছা দেহ-সঞ্চালন সম্ভব কবে তোলে। কাজেই কাজ করতে গেলে মন দেহের ওপর প্রভাব বিস্তাব করে। ডেকার্টের মতে দেহ ও মনেব এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পিনিয়েল গ্রন্থির (Pineal gland) মাধ্যমে ঘটে থাকে।

সমালোচনা : ডেকার্টে দেহ ও মনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি মনে করেন, দেহ ও মন সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। পরস্পর সম্পূর্ণ বিবিক্ত দেহ ও মনের মধ্যে কি করে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তা আমরা বুঝি না। যদি দেহ ও মনের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্বীকার করতে হয়, তবে তাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন বলা যায় না। সম্পূর্ণ ভিন্ন কোন দুই বস্তুর মধ্যেই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হতে পারে না।

ডেকার্টের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ স্বীকার করলে 'শক্তি নিত্যতা-নীতি' (Law of Conservation of Energy) ভঙ্গ করতে হয়। মস্তিষ্ক যদি চিন্তা বা অনুভূতি সৃষ্টির জন্য খানিকটা শক্তি ব্যয় করে, তবে এই দৈহিক শক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে। আবার মন যদি দেহ-সঞ্চালনের বাসনা ক'রে খানিকটা মানসিক

শক্তি অপচয় করে, তবে এই শক্তির উদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে খানিকটা মানসিক শক্তি নষ্ট হয়। কিন্তু 'শক্তি-নিত্যতা-নীতি' অনুসারে কোন শক্তিই নষ্ট হতে পারে না। সুতরাং ডেকার্টের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ গ্রহণ করা যায় না।

প্রয়োজনবাদ (Occasionalism)

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের দোষ ত্রুটি দূর করার জন্য ডেকার্টের অনুবর্তী গযলিন্‌কস্ (Geulincx) ও ম্যালব্রেঙ্কি (Malebranche) প্রয়োজনবাদের পত্তন করেছেন। এই মতবাদ অনুসারে দেহ ও মন সম্পূর্ণ বিবিক্ত হওয়ায় তাদের মধ্যে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হতে পারে না। তা হলে প্রশ্ন ওঠে—দৈহিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক পরিবর্তন আর মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তন হয় কি করে? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রয়োজনবাদীরা বলেন, যখনই দেহ বা মনে পরিবর্তন দেখা দেয়, তখনই মন বা দেহে অনুরূপ পরিবর্তন-সাধনের জন্য ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন দেখা দেয়। হস্তক্ষেপের প্রয়োজন দেখা দিলেই ঈশ্বর মানসিক পরিবর্তনের অনুরূপ দৈহিক পরিবর্তন বা দৈহিক পরিবর্তনের অনুরূপ মানসিক পরিবর্তন সংঘটিত করেন। সুতরাং প্রয়োজন অনুসারে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের ফলেই দৈহিক ও মানসিক প্রক্রিয়ার নিবিড় সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। দেহ ও মনের সম্পর্ক সম্বন্ধে এই মতবাদের নাম প্রয়োজনবাদ।

সমালোচনা: প্রয়োজনবাদ দেহ ও মনের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। প্রতিপদে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের ফলে দেহ ও মনের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়—একথা কোন যুক্তি দিয়েই প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। প্রয়োজনবাদ মানতে হলে যুক্তি বিসর্জন দিয়ে ভক্তিমূলক বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করতে হয়। দর্শনে ভক্তিমূলক বিশ্বাসের কোন স্থান নেই। সুতরাং প্রয়োজনবাদের বিশেষ কোন দার্শনিক মূল্যই থাকতে পারে না।

প্রতিপদে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের ফলে দেহ ও মনের সম্পর্ক স্থাপিত হলে ঈশ্বরের নির্বোধ যান্ত্রিক ব্যবহার স্বীকার করতে হয়। কোন পরমপুরুষ প্রয়োজন দেখা দিলেই হস্তক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবেন—একথা বিশ্বাস করা যায় না; এরকম কাজ নির্বোধ যন্ত্রের কাছেই আশা করা যেতে পারে। তরাং এই দিক থেকেও প্রয়োজনবাদ যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

সমান্তরবাদ (Parallelism)

স্পিনোজা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ ও প্রয়োজনবাদের দোষ-ত্রুটি দূর করার জন্য সমান্তরবাদ প্রবর্তন করেছেন। সমান্তরবাদ অনুসারে দেহ ও মনের মধ্যে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্ভব নয়। দেহ ও মন পাশাপাশি থাকে। যেমন কোন দুই সমান্তরাল সরলরেখা পাশাপাশি থাকে, কিন্তু কখনও পরস্পর মেশে না, তেমনি দৈহিক ক্রিয়া ও মানসিক ক্রিয়া পাশাপাশি থাকলেও কোন একটি অপরটিকে প্রভাবান্বিত করে না। স্পিনোজার মতে, ঈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য। এই ঈশ্বরের অসংখ্য গুণ আছে। এই অসংখ্য গুণের মধ্যে আমরা মাত্র দুটো গুণই জানি। দেহ বা বিস্তৃতি ও মন বা চৈতন্য এই দুই গুণ। দেহ ও মন ঈশ্বরস্থিত দুই সমান্তরাল গুণ। দেহে যখন কোন পরিবর্তন ঘটে, তখন মনেও সেই পরিবর্তন দেখা যায়। আবার মনে যখন কোন পরিবর্তন হয়, তখন দেহেও তদনুরূপ পরিবর্তন ঘটে থাকে। ঈশ্বরের মধ্যে চিরকাল দেহ ও মন পাশাপাশি থাকে। ঈশ্বরই প্রকৃতি বা জগৎ। সুতরাং জগতে দেহ ও মন চিরকালই পাশাপাশি দেখা যায়। সমান্তরবাদ অনুসারে দেহ ও মন একই ঈশ্বরের দুই প্রকার। সেজন্য সমান্তরবাদকে কেউ কেউ দ্বিভঙ্গীবাদও (double-aspect theory) বলেন।

হার্বার্ট স্পেন্সারও সমান্তরবাদ সমর্থন করেন। তাঁর মতে একই অজ্ঞেয় তত্ত্ব (The Unknowable) দেহ ও মনের আকারে প্রকাশিত হয়। এই অজ্ঞেয় তত্ত্বই চরম তত্ত্ব। চরম তত্ত্ব কোন দৈহিক বা মানসিক তত্ত্ব নয়। চরম তত্ত্ব একান্তভাবেই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। দেহ ও মন এই অজ্ঞেয় তত্ত্বেরই দুই প্রকাশ। মস্তিষ্ক ও মন এক নয়। মস্তিষ্ক তার নিজস্ব নিয়ম মেনে চলে, আর মন চলে তার নিজের নিয়ম মেনে।

আধুনিককালে মনোবিজ্ঞানে স্টাউট্ একরকমের সমান্তরবাদে বিশ্বাস করেন। তাঁর মতে দৈহিক প্রক্রিয়া ও মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সঙ্গতি আছে মাত্র (mere concomitance)। অর্থাৎ কোন দৈহিক প্রক্রিয়া ছাড়া মানসিক প্রক্রিয়া থাকতে পারে না, আবার কোন মানসিক প্রক্রিয়া ছাড়াও দৈহিক প্রক্রিয়া থাকতে পারে না। স্টাউটের মতে দৈহিক প্রক্রিয়া ও মানসিক প্রক্রিয়া উভয়ই সমানভাবে সত্যি। মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব সময়েই কতগুলো মস্তিষ্কের প্রক্রিয়া থাকে, আবার মস্তিষ্কের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেও সব সময়েই কতগুলো মানসিক প্রক্রিয়া দেখা যায়।

সমালোচনা : সমান্তরবাদে যেখানে যেখানে দৈহিক প্রক্রিয়া আছে, সেখানে সেখানেই মানসিক প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। স্পিনোজা যেখানে যেখানে বিস্তৃতি আছে, সেখানে সেখানেই চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু, আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় একথার মিথ্যাত্বের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গাছে বা পাথরে বিস্তৃতি আছে, কিন্তু চৈতন্য নেই। চৈতন্য শুধু জীবন্ত জীবেই দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং সমান্তরবাদের সর্বমানসবাদ বা সর্বত্রই চৈতন্য আছে—এমন কথা বিশ্বাস করা যায় না।

সমান্তরবাদ দেহ থেকে মনের উৎকর্ষ বা প্রাধান্য স্বীকার করে না। সমান্তরবাদ অনুসারে দেহ ও মন একই স্তরের অন্তর্গত, এরা পরস্পর সমান্তরাল। কিন্তু আসলে দেহ থেকে মন সব দিক থেকেই উচ্চস্তরের। মন দেহকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। মনের স্বাধীনতা আছে। কার্যের বাসনা মনেই জাগে। দেহের কোন স্বাধীনতা নেই। মনের বাসনাই দেহ সফল করার চেষ্টা করে। সুতরাং দেহ ও মন একই স্তরের হতে পারে না।

হার্বার্ট স্পেন্সার দেহ ও মনকে একই অজ্ঞেয় তত্ত্বের দুই প্রকাশ বলে উল্লেখ করেছেন। যা অজ্ঞেয় তার কোন প্রকাশই জানা যায় না, আর যার কোন প্রকাশ জানা যায় তা অজ্ঞেয় হতে পারে না। কারণ যার কোন না কোন প্রকাশ জানি, তার খানিকটা পরিচয় ত' জানাই হয়ে যায়। সুতরাং স্পেন্সারের মতবাদ গ্রহণ করা যায় না।

আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দৈহিক প্রক্রিয়ার অনুরূপ মানসিক প্রক্রিয়া দেখতে পাই না। ভারতবর্ষের অনেক সন্ন্যাসীই নানা রকমের দৈহিক পীড়ন স্বেচ্ছায় সহ্য করেন। তাঁরা অতি সহজেই ক্ষুধা তৃষ্ণা জয় করতে পারেন। কিন্তু তাঁদের দৈহিক শীর্ণতা মানসিক ক্ষীণতা সূচনা করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্ন্যাসীরা প্রচণ্ড মানসিক ক্ষমতার অধিকারী হন। আমরা ভারতবর্ষে দৈহিক রিক্ততা মানসিক রিক্ততার সূচক বলে মনে করি না। বরং এখানে দৈহিক শীর্ণতা মানসিক পূর্ণতাই সূচনা করে। সমান্তরবাদ আমাদের এই অভিজ্ঞতার কোন সদ্ব্যাখ্যা দিতে পারে না। সুতরাং সমান্তরবাদ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।

পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলাবাদ (The Theory of Pre-established Harmony) :

লাইব্‌নিজ দেহ ও মনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার জন্য পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলাবাদ প্রচার করেছেন। তাঁর মতে, সৃষ্টির সময়েই ঈশ্বর দেহ ও মনের মধ্যে এক

শৃঙ্খলা স্থাপন করেছেন। এই শৃঙ্খলার জন্যই দেহ ও মনের মধ্যে নিত্য সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। প্রয়োজনবাদীদের মত লাইব্‌নিজ প্রতি মুহূর্তে দেহ ও মনের সঙ্গতির জন্য ঈশ্বরের হস্তক্ষেপে বিশ্বাস করেন না। লাইব্‌নিজের মতে ঈশ্বর সৃষ্টির সময় একবার হস্তক্ষেপ করেই দেহ ও মনের নিত্য সঙ্গতির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। লাইব্‌নিজ দেহ ও মনকে দুটো ঘড়ির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই ঘড়ি দুটো এমনভাবেই তৈরী করা হয়েছে যে, এরা সব সময়েই এক রকম সময়ই দিয়ে থাকে।

লাইব্‌নিজের মতে দেহ ও মন উভয়ই চিৎপরমাণুর (monads) সৃষ্টি। চিৎপরমাণুদের মধ্যে কতগুলো অচেতন (Unconscious), কতগুলো চেতন (Conscious), আর কতগুলো আত্মসচেতন (Self-conscious)। চৈতন্য-প্রকাশের মাত্রাভেদের জন্যই চিৎপরমাণুবাদের এরকম ভাগ করা সম্ভব। যে সব চিৎপরমাণুতে চৈতন্য এমন অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত যে তাতে চৈতন্য আছে কি-না বোঝা যায় না, তাদের নাম অচেতন চিৎপরমাণু। যে সব চিৎপরমাণুতে চৈতন্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট, তাদের নাম চেতন চিৎপরমাণু; আর যাদের মধ্যে চৈতন্য সব চেয়ে বেশী প্রকট, তাদের নাম আত্মসচেতন চিৎপরমাণু। লাইব্‌নিজের ভাষায় এই চিৎপরমাণুগুলো গবাক্ষহীন (Windowless), সুতরাং এরা পারস্পরিক প্রভাবমুক্ত। এদের প্রত্যেকেরই স্বাতন্ত্র্য আছে। দেহ কতগুলো অচেতনা চিৎপরমাণুর সৃষ্টি। মন এক আত্মসচেতন চিৎপরমাণু বিশেষ। সুতরাং দেহ ও মন নিজেরাই পারস্পরিক সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে না। ঈশ্বর সৃষ্টির সময়েই এদের প্রক্রিয়ার মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করে দিয়েছেন। এই পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলার জন্যই দৈহিক প্রক্রিয়া ও মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়।

সমালোচনা ঃ পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলাবাদ প্রয়োজনবাদের মতই দেহ ও মনের সঙ্গতির জন্য ঈশ্বরের হস্তক্ষেপে বিশ্বাস করে। তবে পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলাবাদ প্রয়োজনবাদের মত প্রয়োজন দেখা দিলেই ঈশ্বরের হস্তক্ষেপে বিশ্বাস করে না। পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলাবাদের মতে ঈশ্বর দেহ ও মনের সঙ্গতির জন্য একবার মাত্রই হস্তক্ষেপ করেছেন। যাহোক্, দেহ ও মনের সঙ্গতির জন্য ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ আমাদের যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে কোন কিছুরই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। আমরা দেহ ও মনের সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই চাই। সুতরাং এই প্রসঙ্গে লাইব্‌নিজের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আমাদের যুক্তিবাদী মন তৃপ্ত করতে পারে না।

লাইব্‌নিজ ঈশ্বরকে সর্বশ্রেষ্ঠ চিৎপরমাণু (monad of monads) বলে অভিহিত করেছেন। লাইব্‌নিজের মতে, কোন চিৎপরমাণুই অন্য চিৎপরমাণুর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তবে ঈশ্বর দেহ ও মনের চিৎপরমাণু-গুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন কি করে? দেহ ও মনের চিৎপরমাণুগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হলে ঈশ্বরকে এই চিৎপরমাণুগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হয়। কিন্তু চিৎপরমাণু হিসেবে ঈশ্বর তা পারেন না। সুতরাং পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলা কি করে স্থাপিত হল তার কোন সদ্ব্যাখ্যা লাইব্‌নিজ দিতে পারেন নি।

লাইব্‌নিজ চিৎপরমাণুদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেছেন। তিনি আবার এও বলেন যে, প্রত্যেক চিৎপরমাণুই পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলা মেনে চলে। কিন্তু যে চিৎপরমাণু পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলা মেনে চলে, তার কি করে স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে, তা আমরা বুঝি না। যার স্বাতন্ত্র্য আছে, সে কোন বাইরের নিয়মই মেনে চলতে বাধ্য নয়, আর যে কোন বাইরের নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য, তার কোন স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে না।

উপ-বস্তুবাদ (Epiphenomenalism)

জড়বাদীরা জড়কেই চরমতত্ত্ব বলে মনে করেন। তাঁদের মতে জড়ের মত মনের কোন বস্তুসত্তা নেই। মন উপ-বস্তু (Epiphenomenon) বিশেষ। মন বা চৈতন্যকে মস্তিষ্কজাত এক জ্যোতিঃ বলে মনে করা যেতে পারে। দৈহিক ক্রিয়ার ফলে মানসিক পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু মানসিক ক্রিয়ার ফলে দেহের কোন পরিবর্তনই হতে পারে না। সুতরাং দেহ মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে কিন্তু মন কখনই দেহের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

সমালোচনা : উপ-বস্তুবাদের মতে মন বা চৈতন্য উপবস্তু মাত্র। জড়ই চরমতত্ত্ব। আমাদের মনে হয়, জড় থেকে মন উচ্চস্তরের। মন বা চৈতন্য না থাকলে জড়কে জড় বলেই জানা যায় না। সুতরাং জড়ের প্রকাশ চৈতন্যের ওপর নির্ভর করে। কাজেই মন বা চৈতন্যকে জড় থেকে উচ্চস্তরের বলতে হয়। মন বা চৈতন্য যদি জড় থেকে উচ্চস্তরের হয়, তবে জড়কে চরমতত্ত্ব আর মনকে উপ-বস্তু বলা যায় না

উপবস্তুবাদ মনের ওপর দেহের প্রভাব স্বীকার করে, কিন্তু দেহের ওপর মনের কোন প্রভাব স্বীকার করে না। আমাদের মনে হয়, দেহের ওপর মনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। আমাদের দেশে এমন অনেক মহাত্মাই আছেন যাঁরা

মনের জোরে দেহেও জোর পান। তাঁদের দেহ উপবাসক্লিষ্ট ও শীর্ণ। কিন্তু দেহের শীর্ণতা তাঁদের কোন অসুবিধেই সৃষ্টি করে না। সাধারণ গৃহীর চেয়ে তাঁদের কর্মক্ষমতা অনেক বেশী। সুতরাং দেহের ওপর মনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

উন্মেষবাদ (The Theory of Emergence)

আমরা অভিব্যক্তিবাদ প্রসঙ্গে উন্মেষবাদের বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখানে আমরা উন্মেষবাদীদের মতে দেহ ও মনের সম্পর্ক অতি সংক্ষেপে আলোচনা করব। উন্মেষবাদীরা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদীদের মত দেহ ও মনকে সম্পূর্ণ বিপরীত বলে মনে করেন না। সমান্তরবাদের মত উন্মেষবাদে দেহ ও মনকে একই স্তরের বলেও মনে করা হয় না। জড়বাদীদের মত উন্মেষবাদীরা মনকে উপবস্তুও বলেন না। উন্মেষবাদীদের মতে অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়ায় দেহ থেকে প্রাণ আর প্রাণ থেকে মনের উদ্ভব হয়। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলিয়ে দিলে যে জল হয় তার তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষমতা থাকে। এই ক্ষমতা হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন কারুরই নেই। তেমনি দেহ থেকেই প্রাণ আর প্রাণ থেকেই মন হয়। কিন্তু প্রাণের স্তরে 'জীবন' আর মনের স্তরে 'চৈতন্য' বলে এমন দুটি গুণ উন্মেষিত হয় যা যথাক্রমে দেহ ও প্রাণে থাকে না। সুতরাং উন্মেষবাদীদের মতে মন বা চৈতন্য দেহ থেকে উচ্চস্তরের। চৈতন্য একটি উন্মেষিত গুণ। দেহ থেকেই প্রাণ আর প্রাণ থেকেই চৈতন্যের উন্মেষ হয়েছে বলে দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

সমালোচনা : উন্মেষবাদীরা দেহ থেকে মন যে উচ্চস্তরের এই সত্য কথাটি স্বীকার করেছেন। এই দিক থেকে সমান্তরবাদ ও উপবস্তুবাদের তুলনায় উন্মেষবাদ যে অনেকটা যুক্তিগ্রাহ্য তা স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু দেহ থেকে অভিব্যক্তির ধারায় মন বা চৈতন্যের উন্মেষ হল কেন এর কোন সদুত্তর উন্মেষবাদীরা দিতে পারেন নি। এই 'কেন'র ঠিক ঠিক জবাব না পেলে আমাদের যুক্তিবাদী মন তৃপ্ত হয় না। সুতরাং উন্মেষবাদ অনেকটা যুক্তিগ্রাহ্য হলেও সম্পূর্ণরূপে যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

বিজ্ঞানবাদ (Subject Idealism)

বার্কলি বিজ্ঞানবাদের সমর্থক। তাঁর মতে মন ও তার ধারণাগুলোই একমাত্র সত্য। বাইরের বস্তু বলে যা পরিচিত আসলে তা মনের ধারণামাত্র।

দেহ বলে যাকে জানি তাও মনের ধারণা। সুতরাং দেহ সম্পূর্ণভাবেই মনের ওপর নির্ভরশীল। এই মতবাদের নামই বিজ্ঞানবাদ।

সমালোচনা: বিজ্ঞানবাদীরা দেহ ও মনের সম্পর্ক-সমস্যার জটিলতা এড়িয়ে গেছেন। তাঁরা দেহকে মনের ধারণায় পরিণত করে ফেলেছেন। দেহ যদি মনের ধারণামাত্র হয় তবে দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্কের কোন জটিলতাই থাকে না। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা এত সহজ নয়। দেহ ও মন, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা উভয়ই সমান সত্য। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যদি সমান সত্য না হয়, তবে কোন জ্ঞানই হয় না। জ্ঞান হতে গেলেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় থাকা দরকার। সুতরাং দেহ বা জ্ঞেয়কে জ্ঞাতার ধারণামাত্র বললে চলে না। দেহ বা জ্ঞেয়ের জ্ঞাতা-অতিরিক্ত সত্তা আছে। সুতরাং বিজ্ঞানবাদের কথা সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না।

পরব্রহ্মবাদ (Absolute Idealism)

দেহ ও মনের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করা গেল। কিন্তু এদের একটিও সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। আমরা এখন দেহ ও মনের সম্পর্ক সম্বন্ধে পরব্রহ্মবাদ আলোচনা করব।

হেগেল পরব্রহ্মবাদের প্রধান পুরোহিত। তাঁর মতে পরব্রহ্মই চরমতত্ত্ব। জড় ও চৈতন্য এই তত্ত্বেরই দুই প্রকাশ। পরব্রহ্ম জড় ও চৈতন্যের মধ্য দিয়ে নিজেকে সার্থক করে তোলেন। জড় ও চৈতন্যের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে। জড় বা দেহ জ্ঞানের বিষয় আর চৈতন্য বা মন বিষয়ী বা জ্ঞাতা। কিন্তু পরব্রহ্মের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব সমন্বিত হয়েছে। যেহেতু জড় ও চৈতন্য একই তত্ত্বের প্রকাশ, সেজন্য জড় ও চৈতন্যের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্ভব।

আমাদের মতে দেহ ও মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরব্রহ্মবাদই সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। যেহেতু দেহ ও মন উভয়ই একই পরব্রহ্মের প্রকাশ, সুতরাং তাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। পরব্রহ্মের দিক থেকে দেহ ও মন সমান্তর হলেও সসীম জীবের দিক থেকে এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। কারণ দেহ জ্ঞেয় আর মন জ্ঞাতা। সুতরাং এদিক থেকেও তাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকতে কোন বাধা নেই। এই অধ্যায়ের প্রথমেই দেহ ও মনের মধ্যে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে, তা আমরা যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি। যেহেতু পরব্রহ্মবাদ এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অত্যন্ত সুযুক্তিসম্পন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছে, সুতরাং দেহ ও মনের সম্পর্ক সম্বন্ধে পরব্রহ্মবাদই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করতে হয়।

চতুর্দশ অধ্যায়

অমরতা (Immortality)

আত্মা কি অমর? না, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহের বিনষ্টি আত্মারও বিনষ্টি সূচনা করে? এসব প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে জাগে। কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দিক থেকে এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। জড়বাদীরা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। সুতরাং তাঁদের মতে মৃত্যুতে যেমন দেহ ধ্বংস হয়, তেমনি আত্মাও ধ্বংস হয়। আবার অন্য কোন কোন দার্শনিক দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁদের মতে আত্মা অজর ও অমর; দেহের ধ্বংস আছে, কিন্তু আত্মার কোন ধ্বংস নেই। তৃতীয় আর একদল দার্শনিক অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism) সমর্থন করেন। তাঁদের মতে আত্মা ধ্বংসশীল কি অমব তা জানা যায় না।

আমবা জডবাদীদের দেহাত্মৈক্যবাদে বিশ্বাস করি না। জডবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে আমবা এই মতবাদ আলোচনা করেছি। আমাদের মতে আত্মার দেহাতিবিক্ত সত্তা আছে। অর্থাৎ আত্মা ও দেহ এক নয়। সুতরাং দেহের বিনষ্টি আত্মার বিনষ্টি সূচনা করতে পারে না। আমরা এই অধ্যায়ে যাঁরা আত্মাকে অমব বলেন, তাঁদের মতবাদই আলোচনা করব। এই আলোচনা প্রসঙ্গেই অজ্ঞেয়তাবাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে যুক্তি মিলবে। আমরা দেখব, কোন কোন বিশেষ প্রণালীতে আত্মার অমরতা অনুমান করা যায়। সুতরাং এই অধ্যায়ের সিদ্ধান্তে আত্মার অমরতা সিদ্ধ করাই আমাদের চেষ্টা হবে।

আত্মার অমরতা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রমাণ

আত্মার অমরতা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রমাণ উত্থাপন করা যেতে পারে। আমরা এখন এই সব প্রমাণগুলোর সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

(১) শক্তির নিত্যতার উপমায় আত্মার নিত্যতায় বিশ্বাস

পদার্থবিদ্যায় সাধারণতঃ 'শক্তি-নিত্যতা-নীতি' (The Law of Conservation of Energy) গৃহীত হয়ে থাকে। এই নীতি অনুসারে শক্তি কখনও ধ্বংস হয় না, শক্তির একমাত্র রূপান্তরই সম্ভব। যান্ত্রিক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে, আবার রাসায়নিক শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিতে

রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু এই রূপান্তরে শক্তির কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। দুনিয়ায় কোন শক্তিই সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হতে পারে না।

কেউ কেউ বলেন, শক্তি যদি নিত্য হয় তবে তার সঙ্গে তুলনা করে আত্মাকেও নিত্য বলা যেতে পারে। শক্তি যেমন কখনও লুপ্ত হয় না, আত্মাও তেমনি কখনও লুপ্ত হতে পারে না। সুতরাং আত্মাকে অমরই বলতে হয়।

সমালোচনা: উপমা কখনও কোন জিনিস নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করতে পারে না। সুতরাং শক্তির নিত্যতার উপমায় কখনই আত্মার নিত্যতা সন্দেহাতীতরূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

(২) ধী-শক্তির বৈশিষ্ট্য-সঞ্জাত প্রমাণ

মানুষের ধী-শক্তি অনেক ক্ষেত্রেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে। স্মৃতিতে বস্তুর অনুপস্থিতিতেই তার জ্ঞান হয়। কল্পনায় মানুষের ধী-শক্তি চারদিকের জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অনেক ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। মানুষের ধী-শক্তির এ ক্ষমতা আছে বলেই কোন কোন কবির কল্পনা সর্বদেশে ও সর্বকালে মানুষকে তৃপ্ত করে। কোন বিশেষ দেশে ও বিশেষ কালেই তাঁদের কল্পনার আবেদন সীমাবদ্ধ থাকে না। ধী-শক্তি আত্মারই শক্তি। ধী-শক্তি যদি জগতের বন্ধন হতে মুক্ত হতে পারে, তবে আত্মার পক্ষেও জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। যা জাগতিক তাই ধ্বংস হয়। আত্মা যদি জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তবে আত্মার ধ্বংস না পাওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং আত্মাকে অমর বলা যেতে পারে।

সমালোচনা: মানুষের ধী-শক্তি জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু তা বলে মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষত্ব থেকেও তা মুক্ত হতে পারে—এমন কথা জোর করে বলা যায় না। সাধারণতঃ আমরা ধী-শক্তি মস্তিষ্কের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের মস্তিষ্ক কাজ না করলে 'সোনার তরী'তে যে ধী-শক্তির প্রকাশ আছে, তা সম্ভব হত কিনা বলা শক্ত। সুতরাং মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে যখন তার মস্তিষ্ক ধ্বংস হয়, তখন তার ধী-শক্তি থাকে এমন কথা বোধ হয় বলা যায় না। কাজেই ধী-শক্তির বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে আত্মার অমরতা প্রমাণ করতে পারে না।

(৩) অমরতা সম্বন্ধে তত্ত্ববিজ্ঞানের প্রমাণ (Metaphysical Arguments for Immortality)

তত্ত্ব-বিজ্ঞান আলোচনা করলে আত্মার অমরতা সম্বন্ধে অনেক প্রমাণই

পাওয়া যায়। আমরা এই প্রসঙ্গে কেবলমাত্র কয়েকজন বিশিষ্ট দার্শনিকের মতবাদই আলোচনা করব।

প্রাচীন গ্রীক দর্শনে প্লেটো আত্মার অমরতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে আত্মা এক আধ্যাত্মিক দ্রব্য বিশেষ। কোন আধ্যাত্মিক দ্রব্যই যৌগিক (Complex) হতে পারে না। সুতরাং আত্মা এক অযৌগিক (Simple) দ্রব্য। যা যৌগিক তাই বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লিষ্ট হতে পারে। কিন্তু যা যৌগিক নয়, তার পক্ষে বিশ্লিষ্ট হওয়াও সম্ভব নয়। সুতরাং অযৌগিক আত্মা কখনই বিশ্লিষ্ট হতে পারে না। যা বিশ্লিষ্ট হতে পারে না, তার কখনও ধ্বংস হয় না। সুতরাং আত্মা অমর।

আত্মার অমরতা সম্বন্ধে প্লেটোর প্রমাণ তাঁর আত্মা সম্বন্ধে বিশেষ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বিশেষ ধারণা যদি মিথ্যা হয়, তবে তাঁর প্রমাণেরও কোন মূল্য থাকে না। আমরা আত্মার স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি যে, আত্মাকে আধ্যাত্মিক দ্রব্য বলা যায় না। সুতরাং আত্মার অমরতা সম্বন্ধেও প্লেটোর যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আধুনিক দর্শনে ডেকার্টেও আত্মাকে এক আধ্যাত্মিক দ্রব্য বলে মনে করেন। তাঁর মতে চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ। এই চৈতন্য অযৌগিক। সুতরাং তার কখনও ধ্বংস হতে পারে না। প্লেটোর মতবাদ যে কারণে গ্রহণযোগ্য নয়, এই মতবাদও সেই কারণে পরিত্যাজ্য।

কাণ্ট নীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যার জন্য আত্মার অমরতা স্বীকার করেছেন। অমরতা সম্বন্ধে কাণ্টের প্রমাণ দর্শনের ইতিহাসে নৈতিক প্রমাণ নামে পরিচিত। এই নৈতিক প্রমাণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা একটু বিশদভাবেই এই প্রমাণ আলোচনা করব।

(৪) অমরতা সম্বন্ধে নৈতিক প্রমাণ

কাণ্ট বলেন, আত্মার অমরতা সাধারণভাবে প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু নৈতিক জীবনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্য আত্মার অমরতা স্বীকার করে নিতে হয়। কাণ্টের মতে মানুষের পশুসত্তা (Sensibility) যখন সম্পূর্ণরূপে. দেবসত্তার (Rationality) নিয়ম মেনে চলে, তখনই নৈতিক জীবনের আদর্শ পরিপূর্ণ পরিপূর্তি লাভ করে। দেবসত্তার সঙ্গে মানুষের পশুসত্তার এই সঙ্গতি মানুষের নৈতিক জীবনের আদর্শ। এই আদর্শ এক জীবনে বাস্তবে পরিণত করা যায় না। এই আদর্শের

রূপায়ণের জন্য জন্ম জন্মান্তরের সাধনা দরকার। সুতরাং নৈতিক আদর্শের বাস্তবতা প্রতিপাদনের জন্য আত্মার অমরতা স্বীকার করতে হয়। আত্মা যদি অমর না হত তবে নৈতিক জীবন নিরর্থক হয়ে পড়ত। কারণ আত্মার অমরতা স্বীকার করলেই নৈতিক আদর্শ যে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব তা মানা যায়, আর তা না মানলে নৈতিক আদর্শের কোন অর্থ থাকে না। যে নৈতিক আদর্শ কখনই বাস্তবে রূপায়িত করা যায় না তার মূল্য কি? সুতরাং নৈতিক আদর্শের সার্থকতা প্রতিপন্ন করার জন্য আত্মার অমরতা স্বীকার করতে হয়। নীতির দিক থেকে অন্যভাবেও আত্মার অমরতা স্বীকার করা যায়। ন্যায় বিচার (Justice) আত্মার অমরতা সূচনা করে। আমরা আশা করি, যাঁরা সৎ তাঁরা সততার জন্য পুরস্কৃত হবেন। কিন্তু এই জগতে প্রায়ই সততার পুরস্কার পাওয়া যায় না। সততা পুরস্কৃত হবে—এ ত ন্যায় বিচারের দাবী। যদি এই জীবনে সৎব্যক্তি পুরস্কার না পান, তবে পরের জীবনে তিনি পুরস্কৃত হবেন এরকম আশা করাই স্বাভাবিক। সুতরাং ন্যায় বিচারের জন্য আত্মার অমরতা স্বীকার করতে হয়। পুণ্যবান যদি পুরস্কার না পান আর পাপী যদি শাস্তি না পায়, তবে নীতির (Morality) কোন তাৎপর্যই থাকে না। নীতির তাৎপর্য রক্ষার জন্যই আত্মার অমরতা মানতে হয়। যে সৎব্যক্তি এজন্মে দুঃখ পেলেন, তিনি পরজন্মে সুখ পাবেন এরকম বলতে পারলেই নীতির তাৎপর্য রক্ষা পায়। আর এরকম বলতে হলে আত্মার অমরতা স্বীকার করতে হয়।

আমাদের মনে হয়, অমরতা সম্বন্ধে এ সমস্ত নৈতিক প্রমাণ সহজে খণ্ডন করা যায় না। এই সমস্ত প্রমাণ খণ্ডন করতে গেলে নীতি তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। নীতি মানুষের বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব সূচনা করে। মানুষের নীতির যদি কোন তাৎপর্য না থাকে, তবে মানুষের বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব লুপ্ত হয়। কারণ নীতিবোধই মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে দিয়েছে। সুতরাং মানুষের মহত্ত্ব স্বীকার করতে গেলে আত্মার অমরতা না মেনে উপায় নেই। মানুষের মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য এতই সুস্পষ্ট যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তা অস্বীকার করতে পারে না। সুতরাং আত্মার অমরতাও অস্বীকার করার উপায় নেই।

(৫) আত্মার অমরতা সম্বন্ধে আরও কতগুলো প্রমাণ :

(ক) আধুনিক কালে আধ্যাত্মিক গবেষণার (Psychical research) ফলে যে সব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা আত্মার অমরতা সূচনা করে।

অধ্যাপক উইলিয়ম ক্রুকস্-এর মত বিখ্যাত রসায়নাচার্যও স্বীকার করেছেন যে, ব্যক্তিবিশেষকে মাধ্যম (medium) রূপে ব্যবহার করলে পরলোকগত আত্মা এই জগতের মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে। বিভিন্ন দেশে আজ আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান সমিতি (Psychical Research Society) গড়ে উঠেছে। এদের গবেষণা আত্মার অমরতা সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য প্রকাশ করবে —এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

(খ) জাতিস্মর সম্বন্ধে যে সব কাহিনী প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখা যায় তাদের সবগুলোই যে মিথ্যা এমন কথা সহজে বলা যায় না। যে সব লোক, পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে বলে দাবী করে, তাদের মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দরকার। আশা করা যায় এ সমস্ত ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ জাতিস্মর সম্বন্ধে কাহিনীর সত্যতাই প্রতিপন্ন করবে। জাতিস্মর সম্বন্ধে কাহিনীগুলো সত্য হলে আত্মার অমরতা স্বীকার করতেই হবে।

(গ) কোন কোন লোক খুব ছেলে বেলায়ই কোন কোন বিষয়ে অলৌকিক প্রতিভা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। কোন কোন ছেলে বা মেয়ে তেমন শিক্ষা না পেয়েই সঙ্গীতে বা গণিতে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। খবরের কাগজে প্রায়ই এরকম অনেক কাহিনী বেরোয়। পূর্বজন্মের শিক্ষা স্বীকার না করলে এসমস্ত ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ের বিশেষ নৈপুণ্যের কোন ব্যাখ্যা করা যায় না। আর পূর্বজন্ম স্বীকার করলে আত্মার অমরতাই মানতে হয়।

(ঘ) মানুষ ও জীব মাত্রেরই কতগুলো সহজাত প্রবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শিশু মাতৃস্তন্য পান করে। সদ্যোজাত গণ্ডারশিশু মার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। গণ্ডারীর জিহ্বা এত কঠিন যে, সে তার শিশুর গাত্র লেহন করলে শাবক তা সহ্য করতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হল, মানবশিশু ও গণ্ডারশিশু এরকম কাজ করতে শেখে কি করে? এজন্মে ত তাদের কোন অভিজ্ঞতাই হয়নি। পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতা স্বীকার না করলে শিশুদের এরকম ব্যবহার ব্যাখ্যা করা যায় না।

ভারতীয় দর্শনে মহর্ষি গৌতম ও ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও জীবের সহজাত প্রবৃত্তির অস্তিত্ব থেকে আত্মার নিত্যত্ব প্রদর্শন করেছেন। জীবমাত্রই ক্ষুধা লাগলে খাবার খোঁজে। এর কারণ বের করতে গিয়ে বলা হয়েছে— পূর্বজন্মে খাবার খেয়ে ক্ষুধা মিটেছে বলেই এজন্মে ক্ষুধা লাগলে খাবারের

খোঁজ করা হয়। পূর্বজন্মের জ্ঞানের সংস্কার আত্মায় থেকে যায়। এই সংস্কারের জন্যই এজন্মে এমন ব্যবহার সম্ভব।

নবজাত শিশুর হর্ষ, ভয়, শোক প্রভৃতি ভাবও আত্মার নিত্যত্ব সূচনা করে। নবজাত শিশু দুঃখের কারণ ঘটলে কাঁদে, মায়ের কোলে থেকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে ভয় পায়, আনন্দের কারণ থাকলে খিল্ খিল্ করে হেসে হর্ষ প্রকাশ করে। এরকম শোক, ভয় ও হর্ষ পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ ছাড়া সম্ভব নয়। মায়ের কোল থেকে পড়লে যে ব্যথা পাওয়া যাবে, তা পূর্বানুভব ছাড়া জানা যায় না। সেই পূর্বানুভবের সংস্কার স্মৃতিতে জাগে বলেই শিশু ভয় পায়। এই পূর্বানুভব নবজাত শিশুর বেলায় এজন্মে হ'তে পারে না, কারণ এজন্মে শিশুর কোন অভিজ্ঞতাই হয়নি। সুতরাং এই অনুভব পূর্বের কোন জন্মেই হয়েছে বলে স্বীকার করতে হয়।

আত্মার অমরতা সম্বন্ধে এসব প্রমাণ সহজে অগ্রাহ্য করা যায় না। সুতরাং আত্মার অমরতা স্বীকার না করে উপায় নেই। একথা বলতেই হবে যে আত্মা দেহের মত নশ্বর নয়, আত্মা অজর ও অমর। মৃত্যুতে দেহই নষ্ট হয়, কিন্তু আত্মার কোন ক্ষতিই হয় না। কাপড় ছিঁড়ে গেলে যেমন লোকে নূতন কাপড় পরে, তেমনি দেহী বা আত্মা দেহ জীর্ণ হলে তা পরিত্যাগ করে নূতন দেহ গ্রহণ করে। ভগবদ্গীতায় একথাই স্বীকার করা হয়েছে। আমাদের ধারণা, ভগবদ্গীতার কথাই এক্ষেত্রে প্রামাণ্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

কৃতি বা ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা (Freedom of Will)

জীবনের পথে চলতে গিয়ে আমরা কত কাজই ত করি। কাজ আমরা স্বেচ্ছায় করি, না বাধ্য হয়ে করি—তা এক জটিল প্রশ্ন। খুব সহজে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। বিভিন্ন দার্শনিক এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। কারও কারও মতে মানুষের কাজে বা ইচ্ছায় কোন স্বাধীনতাই নেই, বিশেষ নিয়ম মেনেই মানুষকে সব সময় কাজ করতে হয়। এই মতবাদের নাম নিয়ন্ত্রণবাদ (Determinism or Necessarianism)। অন্য কোন কোন দার্শনিক মনে করেন, আমাদের ইচ্ছা অপর কোন বস্তুর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত নয়, আমাদের কাজে আমদের স্বাধীনতা আছে। এই মতবাদের নাম স্বাতন্ত্র্যবাদ (The Doctrine of Free Will)। দর্শনের ইতিহাসে নিয়ন্ত্রণবাদ ও স্বাতন্ত্র্যবাদের দ্বন্দ্ব বহুকাল ধরে চলে এসেছে। আমরা এই অধ্যায়ে এই দুই মতবাদের পক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তিগুলো আলোচনা করে নিজেদের সিদ্ধান্ত স্থাপন করতে চেষ্টা করব।

নিয়ন্ত্রণবাদ

নিয়ন্ত্রণবাদ অনুসারে আমাদের ইচ্ছায় কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। নিয়ন্ত্রণবাদীরা এই মতবাদ নানা দিক থেকে সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে আমাদের ইচ্ছা যে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত তা মনোবিজ্ঞান (Psychology), তত্ত্ববিজ্ঞান (Metaphysics) ও ধর্মবিজ্ঞানের (Theology) দিক থেকে দেখান যেতে পারে। আমরা এখন তাঁদের যুক্তিগুলো অনুধাবন করার চেষ্টা করব।

(১) মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে নিয়ন্ত্রণবাদের প্রমাণ

(ক) স্বেচ্ছাকৃত কার্যের মনস্তত্ত্ব (Psychology of voluntary action):

আমরা স্বেচ্ছায় যে সমস্ত কাজ করি, তা আমাদের উদ্দেশ্য (motive) ও বাসনার (desire) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন এক বিশেষ মুহূর্তে আমাদের

কাছে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও বাসনার উদ্ভব হয়। এসমস্ত উদ্দেশ্য ও বাসনা একই সঙ্গে আমাদের পক্ষে সার্থক করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বাসনার মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় (conflict of desires)। যে বাসনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় আমরা তাই সফল করতে চেষ্টা করি। কোন একটা বাসনার গুরুত্ব বিভিন্ন সর্তের ওপর নির্ভর করে। (১) ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থা (২) ব্যক্তি চরিত্র (৩) বংশপরম্পরাগত বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও (৪) ব্যক্তির দৈহিক গঠন-বৈচিত্র্য বাসনার গুরুত্ব সূচনা করে। বাসনার এসব সর্ত যদি পরিষ্কার ভাবে জানা যায়, তবে সহজেই মানুষের কার্যক্রম সম্বন্ধে নির্ভুলভাবে ভবিষ্যৎবাণী করা যায়। আমাদের সমস্ত কাজই এসব সর্ত দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং মানুষের কাজের কোন স্বাধীনতা নেই।

(খ) মানুষের কার্যক্রম সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী :

মানুষ ভবিষ্যতে কি করবে তা কেউ কেউ আগে থেকেই নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারে। মানুষের কার্যক্রমের ভবিষ্যংবাণী সম্ভব বলেই কর-কোষ্ঠী বিচারের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যদি আগে থেকেই মানুষের কার্যক্রম সম্বন্ধে ভবিষ্যংবাণী করা যায়, তবে কাজে মানুষের স্বাধীনতা স্বীকার করা যায় না। মানুষের যদি ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য থাকত তবে সে ভবিষ্যতে কি করবে তা আগেই বলা যেত না। সুতরাং মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যহীনতাই স্বীকার করতে হয়।

(২) তত্ত্ববিজ্ঞানের দিক থেকে নিয়ন্ত্রণবাদের প্রমাণ

তত্ত্ববিজ্ঞানে কার্যকারণ সম্পর্ককে অপরিবর্তনীয় বলা হয়। কার্যকারণ তত্ত্বানুসারে প্রত্যেক কার্যেরই কারণ থাকে, কারণ ছাড়া কোন কার্যই হয় না। ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলে ইচ্ছারূপ কার্য কোন কারণ ছাড়াই হয়—এমন কথা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু কার্যকারণতত্ত্ব সত্য বলে এমন কথা আমরা বলতে পারি না। সুতরাং ইচ্ছার পরতন্ত্রতাই স্বীকার করতে হয়।

জড়বাদ জড়কেই চরমতত্ত্ব বলে মনে করে। জড়বাদীদের মতে দুনিয়ার সব কিছুই যান্ত্রিকভাবে ঘটে। প্রত্যেক পরিবর্তনেই পূর্বাবস্থা উত্তরাবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যতিক্রমই হতে পারে না। সুতরাং জড়বাদীদের মতে ইচ্ছার কোন স্বাধীনতার কথাই ভাবা যায় না।

চরম অদ্বৈতবাদে ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা যায় না। স্পিনোজা ঈশ্বরকেই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে ঈশ্বরের প্রভাব ও নির্ভর হতে কেউই মুক্ত হতে পারে না। সুতরাং মানুষের ইচ্ছার বেলাতেও ঈশ্বর নির্ভরতা অস্বীকার করা যায় না; কাজেই ইচ্ছার কোন স্বাতন্ত্র্য নেই।

(৩) ধর্মবিজ্ঞানের দিক থেকে নিয়ন্ত্রণবাদের প্রমাণ

ধর্মবিজ্ঞানে ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান বলা হয়। ঈশ্বর যাদ সর্বজ্ঞ হন, তবে তিনি মানুষের সব কাজই আগে জানতে পারেন। তিনি যদি মানুষের সব কাজই আগেই জানেন, তবে মানুষের কাজে কোন স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে না। যদি মানুষের কাজে স্বাধীনতা থাকত, তবে ঈশ্বর আগেই তা জানতে পারতেন না। আবার যেহেতু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সুতরাং তিনিই মানুষের সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রিত করেন। যদি তিনি মানুষের সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রিত না করতে পারেন, তবে তাঁকে সর্বশক্তিমান বলা যায় না। সুতরাং ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান বললে মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য অস্বীকারই করতে হয়।

স্বাতন্ত্র্যবাদ

স্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য আছে। স্বাতন্ত্র্যবাদীরা বিপক্ষীয়দের যুক্তিগুলো খণ্ডন করেই তাঁদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। আমরা স্বাতন্ত্র্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণবাদ খণ্ডনই প্রথম আলোচনা করব।

নিয়ন্ত্রণবাদ খণ্ডন:

প্রথমতঃ, স্বেচ্ছাকৃত কার্যের যে মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ওপর নিয়ন্ত্রণবাদ প্রতিষ্ঠিত তা নিয়ন্ত্রণবাদ প্রমাণ করে না। স্বেচ্ছাকৃত কার্য বাসনার গুরুত্ব দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কিন্তু বাসনার গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। বাইরের কোন বস্তু কোন ব্যক্তির বাসনার গুরুত্ব নিয়ন্ত্রিত করে না। আমি যে বাসনাকে আমার দিক থেকে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি তাই আমি কাজে পরিণত করতে চেষ্টা করি। আমার কাজ আমার কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ বাসনা তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হযে থাকে। সুতরাং আমার কাজে আমার নিশ্চয়ই স্বাধীনতা আছে।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষের কার্যক্রম সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা গেলেও নিয়ন্ত্রণবাদ প্রমাণিত হয় না। প্রত্যেক মানুষেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে। প্রত্যেক

মানুষের প্রত্যেক কাজেই এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কেউ যদি কোন মানুষের চরিত্র জানে, তবে সে তার কার্যক্রম সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-বাণী করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎবাণী নির্দিষ্ট ব্যক্তির কার্যের পরতন্ত্রতা সূচনা করে না। প্রত্যেক মানুষের কাজই তার চরিত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন বাইরের বস্তুই মানুষের কাজ নিয়ন্ত্রিত করে না। সুতরাং মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যই স্বীকার করতে হয়।

তৃতীয়তঃ, জড়বাদ যুক্তিসিদ্ধ মতবাদ নয়। আমরা জড়বাদ আলোচনা প্রসঙ্গে একথার সত্যতা লক্ষ্য করেছি। সুতরাং জড়বাদীরা যে ইচ্ছার পরতন্ত্রতা প্রমাণ করেছেন, তা জড়বাদসঙ্গত বলেই যুক্তিযুক্ত নয়। প্রত্যেক পূর্বাবস্থাই উত্তরাবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে একথা সত্য নয়। আমরা একাদশ অধ্যায়ে যন্ত্রবাদ-সমালোচনা প্রসঙ্গে যন্ত্রবাদীদের একথা খণ্ডন করেছি। সুতরাং জড়বাদ স্বাতন্ত্র্যবাদ খণ্ডন করতে পারে না।

চতুর্থতঃ, স্পিনোজার চরম অদ্বৈতবাদ মানুষের নৈতিক জীবনের কোন সদ্ব্যাখ্যা দিতে পারে না। মানুষের স্বাধীনতা না থাকলে নীতি অর্থহীন হয়ে পড়ে। মানুষ যখন স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে কোন কাজ করে, তখনই সেই কাজের নৈতিক বিচার সম্ভব। যে কাজ আমি স্বাধীনভাবে করি, সে কাজ ভাল বা খারাপ হবে তার জন্য নিশ্চয়ই আমি দায়ী থাকি। সুতরাং আমার সম্বন্ধে নৈতিক বিচার আমার স্বেচ্ছাকৃত কর্মের ওপরই হতে পারে। কিন্তু কর্মের স্বাধীনতা স্বীকার না করলে কোন নৈতিক বিচারই হতে পারে না। সুতরাং কর্মে স্বাধীনতা স্বীকার করতে হয়।

পঞ্চমতঃ, কার্যকারণ তত্ত্বের সঙ্গে সার্থক স্বাতন্ত্র্যবাদের কোন বিরোধ নেই। সার্থক স্বাতন্ত্র্যবাদ—মানুষের ইচ্ছা অকারণে উদ্ভূত হয়—এমন কথা বলে না। স্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে ব্যক্তি-চরিত্রই ব্যক্তির ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং ব্যক্তি-চরিত্র ব্যক্তির ইচ্ছার কারণ। কাজেই স্বাতন্ত্র্যবাদ কার্যকারণতত্ত্বের বিরোধী নয়।

সর্বশেষে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তাও নিয়ন্ত্রণবাদ প্রমাণ করে না। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। মানুষের সব ইচ্ছাই তিনি জানেন। কিন্তু তিনি জানেন বলেই মানুষের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করেন না। সেণ্ট টমাস বলেছেন, স্মৃতিতে আমরা যেমন অতীতকে জানি, কিন্তু তা নিয়ন্ত্রিত করি না, তেমনি ঈশ্বর মানুষের সব কাজই জানেন, কিন্তু তা নিয়ন্ত্রিত করেন না। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি ইচ্ছা করলেই মানুষের কাজ নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ তিনি

তা করেন না। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতার ব্যবহার না করা ক্ষমতাবানের মহত্ত্ব সূচনা করে। ঈশ্বরের পক্ষে সেজন্যই নিযন্ত্রণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রণ না করাই স্বাভাবিক। সুতরাং ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান বলে নিয়ন্ত্রণবাদ মানবার কোন কারণ নেই।

এরকমভাবে নিযন্ত্রণবাদ খণ্ডন করে স্বাতন্ত্র্যবাদীরা নিজেদের পক্ষেও কতগুলো যুক্তি দিযেছেন। আমরা এখন স্বাতন্ত্র্যবাদেব পক্ষের যুক্তিগুলো আলোচনা কবব।

স্বাতন্ত্র্যবাদের স্বপক্ষে যুক্তি

(১) আত্মসচেতনতার সাক্ষ্য (The Evidence of Self-Consciousness) :

কাজ কবাব সময আত্মসচেতন হলে, আমরা যে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী তা বেশ বুঝতে পাবি। যখন কোন কাজ কবি, তখন কি কবব তা ত' আমরা স্বাধীনভাবেই ঠিক করি। সুতরাং আমাদের আত্মসচেতনতা স্বাতন্ত্র্যবাদেরই সাক্ষ্য বহন করে।

(২) নৈতিক চেতনার সাক্ষ্য (The Evidence of Moral Consciousness) :

স্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলেন, ইচ্ছাব স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না কবলে নৈতিক জীবনের কোন অর্থই থাকে না। নৈতিক চেতনায় আমরা নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত হই। যদি প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত কর্মপ্রণালীর মধ্যে স্বেচ্ছায় এই নৈতিক আদশ রূপাযিত করার ক্ষমতা আমাদেব না থাকে, তবে নৈতিক জীবন তাৎপর্যহীন হযে পডে। বাধ্য হযে কোন কাজ করলে নীতির দিক থেকে তার কোন ভাল মন্দ বিচার চলে না, সুতরাং নৈতিক চেতনা ও নৈতিক জীবনের তাৎপর্য রক্ষার জন্য ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতে হয।

ওপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, স্বাতন্ত্র্যবাদই যুক্তিযুক্ত; নিয়ন্ত্রণবাদ যুক্তিগ্রাহ্য নয। স্বাতন্ত্র্যবাদ আবার দু'রকম হতে পারে, অনিয়ন্ত্রণবাদ (Indeterminism) ও স্বনিয়ন্ত্রণবাদ (Self-determinism)। **অনিয়ন্ত্রণবাদ অনুসারে মানুষের ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাধীন। অনিয়ন্ত্রণবাদীরা ইচ্ছার চরম স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন। তাঁদের মতে, মানুষ যা খুশী তাই করতে পারে। স্বনিয়ন্ত্রণবাদীরা ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য বলতে চরম স্বাতন্ত্র্য বোঝেন না। তাঁদের মতে**

ব্যক্তি-চরিত্র ব্যক্তির ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং স্বাতন্ত্র্য বলতে তাঁরা পরনির্দেশরাহিত্য বোঝেন। স্বাতন্ত্র্যের রূপ নিয়ে অনিয়ন্ত্রণবাদী ও স্বনিয়ন্ত্রণবাদীদের এই দ্বন্দ্ব দীর্ঘকাল ধরে চলেছে। আমরা এখন তাঁদের মতবাদ আলোচনা করে নিজেদের মতামত দেওয়ার চেষ্টা করব।

অনিয়ন্ত্রণবাদ বনাম স্বনিয়ন্ত্রণবাদ

ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যের ব্যাখ্যা নিয়ে অনিয়ন্ত্রণবাদ ও স্বনিয়ন্ত্রণবাদের সৃষ্টি হয়েছে। অনিয়ন্ত্রণবাদীরা স্বাতন্ত্র্য বলতে চরম স্বাতন্ত্র্য বোঝেন। স্বনিয়ন্ত্রণবাদীদের মতে পরনির্দেশরাহিত্যই স্বাতন্ত্র্য, স্বনির্দেশে পরিচালিত হওয়ার নামই স্বাধীনতা।

আমাদের মনে হয়, অনিয়ন্ত্রণবাদ যুক্তিযুক্ত নয়। চরম স্বাতন্ত্র্য স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র। স্বেচ্ছাচারিতা উচ্ছৃঙ্খলতা সূচনা করে। উচ্ছৃঙ্খলতা কেউই সমর্থন করতে পারেন না। অনিয়ন্ত্রণবাদ কার্যকারণতত্ত্বের বিরোধী। অনিয়ন্ত্রণবাদীরা ইচ্ছারূপ কার্যের কোন কারণই স্বীকার করেন না। কিন্তু কার্যকারণতত্ত্ব লঙ্ঘন করা যায় না। সুতরাং এই দিক থেকেও অনিয়ন্ত্রণবাদ যুক্তিযুক্ত নয়।

অনিয়ন্ত্রণবাদ স্বীকার করলে কোন নৈতিক বিচারই সম্ভব হয় না। কোন মানুষের কাজ যদি সেই মানুষ নিয়ন্ত্রিত না করে, তবে সেই কাজের জন্য তাকে দায়ী করা যায় না। যে কাজের জন্য যে মানুষ দায়ী নয়, সেই কাজের ভাল-মন্দ দিয়ে সেই মানুষের ভাল-মন্দের বিচার চলে না। সুতরাং অনিয়ন্ত্রণবাদ মেনে নিলে নৈতিক বিচার সম্ভব নয়।

স্বনিয়ন্ত্রণবাদ গ্রহণ করলে কোন অসুবিধেই দেখা দেয় না। স্বনিয়ন্ত্রণবাদ কার্যকারণতত্ত্বের বিরোধী নয়। এই মতবাদ অনুসারে প্রত্যেক মানুষই তার নিজের কার্য নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং ব্যক্তি-চরিত্রই ব্যক্তি-কার্যের কারণ। স্বনিয়ন্ত্রণবাদ স্বীকার করলে নৈতিক বিচারের সম্ভাবনাও ব্যাখ্যা করা যায়। স্বনিয়ন্ত্রণবাদ অনুসারে প্রত্যেক মানুষের কর্মই সেই মানুষ নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং এই মতবাদ অনুসারে মানুষ তার কাজের জন্য দায়ী। কাজেই এই ক্ষেত্রে কোন মানুষের কাজের ভাল-মন্দ দিয়ে সেই মানুষের ভাল-মন্দ বিচার করা যায়। এসব কারণে অনিয়ন্ত্রণবাদের তুলনায় স্বনিয়ন্ত্রণবাদই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এই যে, **স্বনিয়ন্ত্রণবাদ নিয়ন্ত্রণবাদ ও অনিয়ন্ত্রণ-বাদের দ্বন্দ্ব সমন্বিত করেছে।** নিয়ন্ত্রণবাদ-মতে, মানুষের ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবেই নিয়ন্ত্রিত। অনিযন্ত্রণবাদ মানুষের ইচ্ছার কোন নিয়ন্ত্রণই স্বীকার করে না। স্বনিয়ন্ত্রণবাদ বলে, মানুষের ইচ্ছা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিতও নয়, আবার সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিতও নয; মানুষের ইচ্ছা স্বনিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ ব্যক্তিই ব্যক্তির ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করে। ব্যক্তি ভিন্ন বাইরের অন্য কোন বস্তুর ব্যক্তি-ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতা নেই।

ষোড়শ অধ্যায়

ঈশ্বর (God)

সাধারণ মানুষ সর্বশক্তির আধার হিসেবে ঈশ্বরের কল্পনা করে। দার্শনিক ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন তোলেন। ঈশ্বরের প্রকৃতি কি? তিনি এক না বহু? ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? ঈশ্বরের সঙ্গে সসীম জীব ও এই জগতের সম্পর্ক কি? এরকম কত প্রশ্নই দার্শনিকদের মনে আসে। আমরা এ অধ্যায়ে এ সব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নিতে হয়। কিন্তু এমন অনেক দার্শনিক আছেন যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের নাস্তিক (Atheist) বলা হয়। নাস্তিকদের মতবাদ খণ্ডন করতে না পারলে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন প্রশ্নেরই আলোচনা করা যায় না। সুতরাং আমরা সর্বাগ্রে নাস্তিক্যবাদ খণ্ডন করার চেষ্টা করব।

নাস্তিক্যবাদ খণ্ডন (Refutation of Atheism)

নাস্তিকেরা বলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না; সুতরাং ঈশ্বর নেই। ঈশ্বরকে অতীন্দ্রিয় সত্তা বলা হয়। আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং ঈশ্বরকে জানা যায় না। আমরা যা জানি না তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারি না। সুতরাং ঈশ্বর নেই। জড়বাদী দার্শনিকেরাই সাধারণতঃ নাস্তিক হন। তাঁরা দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য বা আদর্শের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে বিশ্ব-প্রক্রিয়া যান্ত্রিকভাবেই চলে; এখানে কোন উদ্দেশ্য-কারণের অস্তিত্ব নেই।

সমালোচনাঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নি বলেই ঈশ্বর নেই, এমন কথা বলা যায় না। ঈশ্বর নেই—একথা বলতে হলে ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু নাস্তিকেরা আজ পর্যন্ত তা পারেন নি। তারপর সব বিষয়ই যে প্রমাণ করা যায়, একথারও প্রমাণ দরকার। এমন ত' হতে পারে যে, ঈশ্বর প্রমাণের বিষয়ই নন। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না বলে তিনি নেই, একথা বলা যায় না।

নাস্তিকেরা বলেন, ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ ছাড়া কোন জ্ঞান হয় না। ঈশ্বরের সঙ্গে কোন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষই হতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর নেই। আমরা বলি, ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ ছাড়া যে জ্ঞান হতে পারে না—একথা প্রমাণ-সাপেক্ষ। যদি

যুক্তির খাতিরে একথার সত্যতা ধরেও নিই তবুও নাস্তিকদের সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় না। ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ ছাড়া যদি কোন জ্ঞান না হয়, তবে অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হবে না। কিন্তু অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে জানি না বলে তিনি নেই, এমন কথা ত' বলা যায় না। যে ঈশ্বরকে জানি না তিনি আছেন বা নেই তাও জানি না। সুতরাং নাস্তিকেরা যে বলেন ঈশ্বর নেই—তা বলা যায় না।

আমরা পূর্বেই বলেছি, জড়বাদী দার্শনিকেরাই সাধারণতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁরা যন্ত্রবাদ দিয়ে বিশ্বপ্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমরা যন্ত্রবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি যে, যন্ত্রবাদ যুক্তিগ্রাহ্য নয়; বিশ্ব-প্রক্রিয়ায় উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই। উদ্দেশ্যমূলক এই জগতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং নাস্তিকতা প্রামাণ্য নয়।

নাস্তিকতা অপ্রমাণিত হওয়ায় এখন আমরা ঈশ্বরের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

ঈশ্বরের প্রকৃতি ঃ

ঈশ্বরের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে যে প্রশ্ন প্রথমেই মনে জাগে তা হচ্ছে—ঈশ্বর কি ও কে? আমরা এখন এ-প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

শান্ত ও অপূর্ণ মানুষ সমস্ত পূর্ণতা ও কল্যাণ গুণের আধার হিসেবে ঈশ্বরের কল্পনা করেছে। ঈশ্বর সান্ত নন, অনন্ত। তিনি অপূর্ণ নন, পূর্ণ। তিনি পরিণামী নন, অপরিণামী। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও বিভু। তত্ত্বের দিক থেকে (from the standpoint of Metaphysics) ঈশ্বর বলতে আমরা ত' এই বুঝি। কিন্তু, ভক্ত ঈশ্বরকে অনন্ত, পূর্ণ, অপরিণামী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও বিভু বলেই খুশী হন না। তিনি ঈশ্বরকে আরও অন্তরঙ্গ ভাবে পেতে চান। তাঁর মতে ঈশ্বর কল্যাণময়, প্রেমময়। তিনি প্রেমের ঠাকুর। শুধু তাই নয়। তিনি দয়া-মায়া-স্নেহ-প্রীতি-সমন্বিত এক পুরুষ। তবে তিনি সাধারণ পুরুষ নন, তিনি পুরুষোত্তম। তিনি কখনও অবিচার করেন না। অশরণের তিনি শরণ, অগতির তিনি গতি।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তাত্ত্বিকেরা ঈশ্বরকে অনন্ত, পূর্ণ অপরিণামী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও বিভু বলেছেন। তাঁরা ঈশ্বরকে এসব গুণে বিভূষিত করে কি বোঝাতে চান, তা জানা দরকার। অনন্ত সান্তের অভাব সূচনা করে না। অনন্ত যদি সান্তের অভাব হত, তবে হয় সান্ত মিথ্যা হত, নয়ত অনন্তকে সীমিত করত। সান্তকে অস্বীকার করলে অনন্তের কোন তাৎপর্য থাকে না। অনন্ত সান্তকে গ্রহণ করে আবার সান্তকে অতিক্রমও করে।

সান্ত জগৎ ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু ঈশ্বর কারুর ওপর নির্ভরশীল ন'ন। তিনি স্বনির্ভর। এজন্যই ঈশ্বরকে অনন্ত বলা হয়।

ঈশ্বর পূর্ণ। কিন্তু সেজন্য তিনি অপূর্ণকে পরিত্যাগ করেন না। অপূর্ণতার মধ্যেও পূর্ণের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বর অপরিণামী, কারণ তাঁর কোন পরিণাম নেই। তিনি অজর ও অমর। তিনি নিত্য, কারণ তিনি কালোত্তীর্ণ। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। কিন্তু তিনি সব জানেন বলেই মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করেন না। আমরা যেমন স্মৃতিতে অতীতকে জানি, কিন্তু অতীতকে নিয়ন্ত্রিত করি না, তেমনি ঈশ্বর মানুষের ভবিষ্যৎ সব কিছুই জানেন, কিন্তু তা তিনি নিয়ন্ত্রিত করেন না। সুতরাং মানুষ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। কিন্তু তিনি তা বলে অসম্ভবকে সম্ভব করেন না। ঈশ্বর কখনই সোনার পাথরবাটি সৃষ্টি করবেন না। কারণ সোনার পাথর-বাটির মধ্যে স্ব-বিরোধ (Self-contradiction) আছে। যা সোনার বাটি, তা পাথরের হতে পারে না; আর যা পাথরের বাটি তা সোনার হতে পারে না। সুতরাং যখন ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলি তখন তিনি স্ব-বিরোধমুক্ত সব কিছুই করতে পারেন, তাই বোঝাতে চাই। কিন্তু তাতে ঈশ্বরের অক্ষমতা স্বীকার করি না। ঈশ্বর অযৌক্তিক হতে পারেন না। স্ব-বিরোধ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এজন্যই ঈশ্বর স্ব-বিরোধযুক্ত কিছু করেন না।

ভক্ত ভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চান। তাই তিনি ভগবানের ওপর মানবিক গুণ আরোপ করেন। ভক্ত ভাবেন, ঈশ্বর কখনও কারও অকল্যাণ করতে পারেন না; সুতরাং তিনি কল্যাণময়। সমস্ত পাপীতাপী ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করে। তিনি কাউকেই বঞ্চিত করেন না। সুতরাং তিনি করুণাময়। ঈশ্বর ধনী-দরিদ্র, পাংক্তেয়-অপাংক্তেয় সবাইকেই সমানভাবে ভালবাসেন। সুতরাং তিনি প্রেমময়। অন্তরের আকূতিতে, প্রেমের গভীরতায় এই প্রেমের ঠাকুর ধরা দেন। ঈশ্বর মানুষের সুখ-দুঃখে ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নির্বিকার থাকতে পারেন না। তিনি সবসময়েই বঞ্চিতকে করুণা-কণা দান করেন। মানুষ মানুষের প্রতি প্রায়ই অবিচার করে। কিন্তু ঈশ্বর কখনও অবিচার করতে পারেন না। যাকে কেউ আশ্রয় দেয় না, তাকে তিনি আশ্রয় দেন। যাকে সবাই বর্জন করে তাকে তিনি গ্রহণ করেন। ঈশ্বর পুরুষোত্তম। তাই সাধারণ পুরুষের অপূর্ণতা তাঁর নেই, কিন্তু পুরুষের প্রতি পুরুষের করুণাঘন কৃপা ও সহৃদয় সহানুভূতি সব সময়েই তাঁর আছে।

ঈশ্বর কি ও কে—তার খানিকটা পরিচয় পাওয়া গেল। এখন প্রশ্ন ওঠে—ঈশ্বর এক, না দুই, না বহু ?

অনেকেশ্বরবাদ (Polytheism) :—ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রথম অবস্থায় মানুষ বহু ঈশ্বরের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করত। প্রাচীন গ্রীস, ব্যাবিলন, মিশর ও ভারতবর্ষে একথার প্রমাণ মিলবে। প্রথম মানুষ প্রকৃতিতে যা গভীর, গহন, গম্ভীর ও বিপুল দেখেছে তাকেই ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করেছে। এমনি করেই ত' প্রাকৃতিক বিভিন্ন বস্তু ও শক্তির আরাধনা শুরু হয়েছিল। যারা বহু ঈশ্বরেব পূজা করে তাদের অনেকেশ্বরবাদী বলা হয় ; আর তাদেব মতবাদের নাম **অনেকেশ্বরবাদ** (Polytheism)।

সমালোচনা : অনেকেশ্বববাদ মানুষেব বুদ্ধিকে তৃপ্ত করতে পারে না। আমরা 'ঈশ্বর কি ও কে'—এই প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি, ঈশ্বর অনন্ত ও পূর্ণ। একাধিক অনন্ত ও পূর্ণ পুরুষ কখনই হতে পারে না। অনন্ত ও পূর্ণ একই হতে পারে।

ঈশ্বর যদি একাধিক হন তবে তাঁদের সর্বশক্তিমান বলা যায় না। কাবণ সর্বশক্তিমান একাধিক একথা বলাব কোন অর্থই নেই। জগতের ঐক্য, সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা কবতে হলে এক ঈশ্বরেব অস্তিত্বই স্বীকার করতে হয়। বহু ঈশ্বর কখনও জগতের সুসঙ্গত ও সুসমঞ্জস বস্তু-বিন্যাস সম্ভব করতে পারেন না। কারণ, অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়, সফল হয় না।

দ্বীশ্বরবাদ (Ditheism) :—যদিও একেশ্বরে বিশ্বাসই সব চেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য, তবু মানুষ অতি সহজে এই বিশ্বাস গ্রহণ করতে পারেনি। প্রথমে যে তারা অনেকেশ্বরবাদে বিশ্বাস করেছে তা আমরা এই মাত্র বললাম। অনেকেশ্বরবাদের পব দ্বীশ্বরবাদে (Ditheism) বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছে। দ্বীশ্বরবাদ অনুসারে একই ঈশ্বর শুভ ও অশুভ, কল্যাণ ও অকল্যাণ, মঙ্গল ও অমঙ্গল একই সঙ্গে সৃষ্টি করতে পারেন না। শুভ, কল্যাণ ও মঙ্গলের সৃষ্টির জন্য একজন ঈশ্বর ; আর অশুভ, অকল্যাণ ও অমঙ্গলের সৃষ্টির জন্য আর একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। সুতরাং দ্বীশ্বরবাদে দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী ঈশ্বরে বিশ্বাস করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে একজন শিব, আর একজন অশিব। এঁদের দ্বন্দ্ব লেগেই আছে।

প্রাচীন পার্শীরা দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী ঈশ্বরে বিশ্বাস করত। তারা কল্যাণের নিদান ঈশ্বরকে বলত আহুর মজ্‌ডা (Ahura Mazda), আর অকল্যাণের নিয়ামক ঈশ্বরকে বলত আহ্রিমণ (Ahriman)। আহুর মজ্‌ডা কল্যাণাকীর্ণ পৃথিবী সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আহ্রিমণ প্রতিনিয়ত আহুর মজ্‌ডার

সমস্ত শুভ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার চেষ্টায় আছেন। সুতরাং আহুর মজ্‌ডা ও আহ্রিমণের দ্বন্দ্ব প্রতিনিয়তই চলছে।

সমালোচনা: জগতে শুভ ও অশুভ সৃষ্টির জন্য দুজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করার প্রয়োজন হয় না। যিনি শুভ সৃষ্টি করেন, তিনি অশুভও সৃষ্টি করেন, ঈশ্বর অশুভ সৃষ্টি করেন বলে তিনি নির্দয় নন। সসীম জীব যাতে শুভের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে, সেজন্যই তিনি অশুভের সৃষ্টি করেন। অন্ধকার না থাকলে যেমন আলোর তাৎপর্য বোঝা যায় না, তেমনি অশুভ না থাকলে শুভের তাৎপর্যও বোঝা যায় না। অন্ধকারের পাশে আলোর মহিমা যেমন সব চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত হয়, তেমনি অশুভের পাশেই শুভের মহিমা সব চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে। তাই যে ঈশ্বর শুভের স্রষ্টা তাঁর অশুভের স্রষ্টা হতে কোন বাধা নেই।

দ্বীশ্বরবাদে বিশ্বাস করলে জগতের ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। দ্বীশ্বরবাদীদের মতে শিব ও অশিবের দ্বন্দ্ব প্রতিনিয়তই চলছে। একথা যদি সত্য হয়, তবে তাঁদের পক্ষে একত্রিত হয়ে এই সুন্দরী ধরণী সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। শুধু দ্বন্দ্ব থেকে কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না সুতরাং দ্বীশ্বরবাদ কোন কিছুরই সৃষ্টি ব্যাখ্যা করতে পারে না।

একেশ্বরবাদ: অনেকেশ্বরবাদ ও দ্বীশ্বরবাদ উভয়ই দোষ-দুষ্ট। সুতরাং ঈশ্বরের দ্বিত্ব বা বহুত্ব কিছুই স্বীকার করা যায় না। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়— একথাই বলতে হয়। ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় বললেই আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সমস্ত গুণের কল্পনা করি তা সার্থক হয়। একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরই অনন্ত, পূর্ণ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও বিভু হতে পারেন। ধার্মিক মনের আকূতি ও আকাঙ্ক্ষাও একেশ্বরে বিশ্বাস করলেই পূর্ণ হয়। যাঁকে আমরা সমস্ত হৃদয়ের ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিয়ে অভিষিক্ত করি তিনি বহু দেবতার মধ্যে একজন হলে আমাদের তৃপ্তি হয় না। আমাদের প্রেমের ঠাকুর এক ও অদ্বিতীয় হলেই আমরা খুশী হই। সুতরাং নানা দিক থেকে বিচারেই ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয়ই বলতে হয়।

এখন প্রশ্ন ওঠে—ঈশ্বর যদি এক ও অদ্বিতীয় হন, তবে তাঁর সঙ্গে সসীম জীব আর সান্ত জগতের কি সম্পর্ক হবে? বিভিন্ন দার্শনিক এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। কারও কারও মতে ঈশ্বর জীব ও জগতের স্রষ্টা হলেও তিনি জীব ও জগতের মধ্যে থাকেন না; জীব-জগতের সীমা উত্তীর্ণ হয়েই তিনি থাকেন। এ মতবাদের নাম অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদ

(Deism)। অন্য কোন কোন দার্শনিকের মতে জীব ও জগৎ পরিব্যাপ্ত করেই ঈশ্বরের স্থিতি। তিনি নিজেকে জীব ও জগতের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত করেছেন। এ মতবাদের নাম সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism)। আবার কোন কোন দার্শনিক মনে করেন, ঈশ্বর জীব ও জগতের মধ্যেও আছেন, আবার বাইরেও আছেন। তিনি জীব ও জগতে মূর্তও বটেন, আবার জীব-জগৎ উত্তীর্ণও বটেন। এ মতবাদের নাম ঈশ্বরবাদ (Theism) বা সর্বধরেশ্বরবাদ (Panentheism)। কেউ কেউ আবার ঈশ্বরবাদ বলতে অন্য মতবাদও বোঝেন। তাঁদের মতে ঈশ্বর জগতের ভেতরেও আছেন বাইরেও আছেন, কিন্তু জীবের বেলায় তিনি শুধু বাইবেই আছেন, ভেতরে নেই। আমরা এখন এসব মতবাদের গুণাগুণ বিচার করব।

অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদ (Deism)

অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদের মতে অনন্তকাল ধরে ঈশ্বব একা ছিলেন। তারপর কোন এক বিশেষ মুহূর্তে তিনি অসৎ (nothing) থেকে সতের সৃষ্টি করেছেন। সৎ বা জগৎ সৃষ্টি করে তিনি কতগুলো শক্তিও সৃষ্টি করেছেন। এই শক্তিগুলো (forces) জগৎ সৃষ্টির পর জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এই শক্তিগুলোকে জগতের গৌণ কারণ (secondary causes) বলা যেতে পারে। জগৎ-সৃষ্টির পর ঈশ্বব জগৎকে গৌণ কাবণের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি সাধারণতঃ জগতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু যখন জাগতিক ব্যাপারে চরম বিপর্যয় দেখা দেয়, তখন তিনি হস্তক্ষেপ করে জগতে স্বাভাবিক অবস্থা এনে দেন। সুতরাং এই মতবাদ অনুসারে সৃষ্টির আগে ঈশ্বর জগৎ ছাড়াই ছিলেন, সৃষ্টির পরেও তিনি নিজেকে জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপেই জীব ও জগতের বাইরে থাকেন। তাঁর সঙ্গে জীব ও জগতের কোন অন্তরঙ্গ সম্পর্কই নেই।

সমালোচনা : অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদ সৃষ্টিতত্ত্বে (The Theory of Creation) বিশ্বাসী। কিন্তু একাদশ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, সৃষ্টিতত্ত্ব যুক্তিগ্রাহ্য নয়। সুতরাং অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদের বক্তব্য সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

(১) ঈশ্বর কি করে অসৎ থেকে সতের সৃষ্টি করতে পারেন, তা আমরা বুঝি না। শূন্য থেকে কখনই পূর্ণ হতে পারে না। বিশেষ করে উপাদান কারণের স্বরূপ কার্যেও দেখা যায়। অসৎ যদি সতের উপাদান কারণ হয়,

তবে সৎ বা জগৎও অসৎ হবে। কিন্তু অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদীরা নিশ্চয়ই জগৎকে অসৎ বলবেন না।

(২) ঈশ্বর কোন বিশেষ মুহূর্তে জগৎ সৃষ্টি করেছেন, একথা যুক্তি দিয়ে বোঝান যায় না। প্রশ্ন ওঠে, ঈশ্বর কোন একটা মুহূর্তই সৃষ্টিকার্যের জন্য বেছে নিলেন কেন? জগৎ-সৃষ্টি তিনি আগে বা পরে করলেন না কেন? এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর দেওয়া যায় না।

(৩) অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদীদের মতে জগৎ-সৃষ্টির পর গৌণ কারণ জগৎ নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু গৌণ কারণ নিশ্চেতন। নিশ্চেতন কারণ কোন কিছু নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। নিয়ন্ত্রণকার্য চৈতন্যের অস্তিত্ব সূচনা করে। সুতরাং গৌণ কারণ কি করে জগৎ-সৃষ্টির পর জগৎ নিয়ন্ত্রিত করে, তা বোঝা যায় না।

(৪) অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদীরা জাগতিক ব্যাপারের চরম বিপর্যয় কালে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপে বিশ্বাস করেন। কিন্তু ঈশ্বর সাধারণ যন্ত্রীর মত সৃষ্ট যন্ত্র বিকল হলে তা সারাই করবেন, একথা ভাবা যায় না। ঈশ্বর নিশ্চয়ই সাধারণ যন্ত্রী নন। সুতরাং জাগতিক কার্যে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের কথা বিশ্বাস করা যায় না।

(৫) অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদীদের মতে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে জগতের বাইরে থাকেন। একথা সত্যি হলে ঈশ্বর জগতের দ্বারা সীমিত হবেন। সুতরাং ঈশ্বরকে অসীম ও অনন্ত বলা যাবে না। কিন্তু আমরা জানি, ঈশ্বর অসীম ও অনন্ত। সুতরাং অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদীদের বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

(৬) অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদ স্বীকার করলে জীবের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতে হয়। কারণ, এ মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে জীবের বাইরে থাকেন। সুতরাং জীবের যে কোন কার্যই তিনি নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। কিন্তু অপূর্ণ জীবের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা যায় না।

(৭) ঈশ্বর যদি সম্পূর্ণরূপে জীব ও জগতের বাইরে থাকেন, তবে ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ হয় না। ধার্মিক ও ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করতে চান। কিন্তু ঈশ্বর যদি সম্পূর্ণরূপে জীবের বাইরে থাকেন, তবে তাঁর সঙ্গে কোন নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনই সম্ভব নয়। সুতরাং অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদে ধর্ম-জীবনের আকৃতি সার্থকতা লাভ করতে পারে না।

সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism)

অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদের দোষ-ত্রুটি দূর করার জন্য সর্বেশ্বরবাদের সৃষ্টি হয়েছে। অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদের মতে ঈশ্বর জীব ও জগতের অতিবর্তী (transcendent)

বা বাইরে থাকেন। সর্বেশ্বরবাদীরা মনে করেন, ঈশ্বর জীব ও জগতের অন্তর্ব্যাপী (immanent) বা জীব ও জগতের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকেন। পশ্চিমের দর্শনে স্পিনোজা সর্বেশ্বরবাদের চরম সমর্থক।

সর্বশ্বরবাদীদের মতে, ঈশ্বরই সব, আর সবই ঈশ্বর। বিশ্বচরাচর ঈশ্বরের অনন্ত সত্তায় বিধৃত হযে আছে। বিশ্বচরাচরের সত্তা ঈশ্বরেরই সত্তা। সুতরাং ঈশ্বর-নিরপেক্ষ জগতের কোন সত্তাই নেই। বিশ্বে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরই সত্য। বহু এই একের প্রকাশ মাত্র। বহুত্বের কোন আত্যন্তিক সত্যতা নেই। ঈশ্বর নির্গুণ, এক ও অদ্বিতীয়। ঈশ্বরের কোন বর্ণনা দেওয়াই সম্ভব নয়। তিনি সম্পূর্ণরূপে অবাঙ্‌মানসগোচর।

সমালোচনা: সর্বেশ্বরবাদীদের মতে ঈশ্বর নির্গুণ ও অবাঙ্‌মানসগোচর। এই ঈশ্বরের সঙ্গে কোন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করাই সম্ভব নয়। যে ঈশ্বর আমাদের সুখদুঃখ সম্বন্ধে নির্বিকার, সে ঈশ্বর আমাদের ধর্মজীবনের আকূতি তৃপ্ত করতে পারেন না। আমরা ধর্মজীবনে ঈশ্বরকে আমাদের আত্মার আত্মীয় হিসেবে পেতে চাই। কিন্তু নির্গুণ ও আবঙ্‌মানসগোচর ঈশ্বরের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা স্থাপনই সম্ভব নয়। সুতরাং সর্বেশ্বরবাদ আমাদের ধর্মজীবনের আকূতি তৃপ্ত করতে পারে না।

সর্বেশ্বরবাদ ঈশ্বরকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করে। একথা যদি সত্য হয় তবে জগৎকে সত্য বলা যায় না। প্রতীয়মান জগৎ সত্য নয়—একথা বললেই আমাদের মন তৃপ্ত হয় না। জগৎ কি অর্থে সত্য নয়, জগতের প্রতীয়মানতা কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় প্রভৃতিও জানা দরকার।

সর্বেশ্বরবাদ একেকে স্বীকার করে, কিন্তু বহুকে প্রত্যাখ্যান করে। জগতে আমরা যেমন ঐক্য দেখি, তেমনি বৈচিত্র্যও দেখি। সুতরাং বৈচিত্র্যের একটা ব্যাখ্যা দরকার। বৈচিত্র্য-প্রত্যাখ্যান বৈচিত্র্যের কোন ব্যাখ্যা নয়।

সর্বেশ্বরবাদ ঈশ্বরকেই সব আর সবকেই ঈশ্বর বলে। জগতে অনেক নিশ্চেতন জড় পদার্থই দেখতে পাওয়া যায়। চৈতন্য-স্বরূপ ঈশ্বর কি করে নিশ্চেতন জড় হতে পারে, তার ব্যাখ্যা দরকার।

ঈশ্বর যদি জীবের অন্তর্ব্যাপী হয়, তবে জীবের কোন স্বাধীনতাই থাকে না। জীবের স্বাতন্ত্র্য না থাকলে দায়িত্ব, নৈতিকতা ও ধর্মের কোন মূল্যই থাকে না। যে অপরের দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত, তার দায়িত্বের কোন প্রশ্নই ওঠে না। যার দায়িত্বের কোন বালাই নেই, তার কর্তব্যাকর্তব্য বলেও কিছু থাকতে পারে না। যার কর্তব্যাকর্তব্য বিচার নেই তার নীতিবোধও নেই। ভক্ত ও

ভগবান স্বতন্ত্র না হলে উপাসনা ও সাধন-পদ্ধতির কোন অর্থ থাকে না। ভগবানের উপাসনা করতে হলে ভক্ত থেকে ভগবানকে স্বতন্ত্র বলে ভাবতে হয়। সর্বেশ্বরবাদে জীব আর ঈশ্বর একান্তভাবেই অভিন্ন। সুতরাং এই মতবাদে ধর্মোপাসনার কোন স্থান নেই।

সর্বেশ্বরবাদের এত দোষ সত্ত্বেও সর্বেশ্বরবাদের একটি গুণ অস্বীকার করা যায় না। সর্বেশ্বরবাদ অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদের মত কালিক সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করে না। কালিক সৃষ্টিতত্ত্ব যে বহু দোষে দুষ্ট, তা আমরা একাদশ অধ্যায়েই আলোচনা করেছি। সুতরাং এই দিক থেকে সর্বেশ্বরবাদের কিঞ্চিৎ তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না।

সর্বধরেশ্বরবাদ (Pan-entheism)

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদের যুক্তি মত ঈশ্বর জীব ও জগতের সম্পূর্ণ অতিবর্তী হতে পারেন না, আবার সর্বেশ্বরবাদের যুক্তি মত তিনি জীব ও জগতের সম্পূর্ণ অন্তর্ব্যাপীও হতে পারেন না। সর্বধরেশ্বরবাদ অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদের বক্তব্যের চরমতা দূর করে তাদের মতবাদ সমন্বিত করার চেষ্টা করেছে। জার্মান দার্শনিক হেগেল সর্বধরেশ্বরবাদের সমর্থক। তাঁর মতে ঈশ্বর জীব ও জগতের মধ্যেও আছেন, আবার বাইরেও আছেন। তিনি অন্তর্ব্যাপী ও অতিবর্তী উভয়ই।

হেগেলের মতে অসীম ও অনন্ত ঈশ্বর সসীম ও সান্ত জীব-জগতের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশিত করেন। তিনি এক হয়েও বৈচিত্র্যের নিহিতার্থ বিধান করেন। তিনি সকলের মধ্য দিয়েই নিজের পরিপূর্ণতা ও চরিতার্থতা খুঁজে পান। এই এক বহুকে পরিত্যাগ করেন না, বরং বহুর মধ্যে নিজের ঐক্যের মাধুর্য উপলব্ধি করেন। ঈশ্বর সবকিছুই ধারণ করে আছেন। তাই তিনি সর্বধরেশ্বর। অপূর্ণ ও শান্ত যে যাই হোক না কেন কেউই পূর্ণ ও অনন্ত ঈশ্বরের প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হন না।

আমাদের বিবেচনায়, ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্পর্ক-নির্ণয়-প্রসঙ্গে সর্বধরেশ্বরবাদের বক্তব্যই সবচেয়ে বেশী যুক্তিগ্রাহ্য। অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ যে যুক্তিগ্রাহ্য নয়, তা আমরা আগেই দেখেছি। সর্বধরেশ্বরবাদে অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদের কোন দোষ-ক্রটিই নেই।

সর্বধরেশ্বরবাদ মতে, ঈশ্বর জীবের ভেতরেই শুধু নেই, তিনি বাইরেও আছেন। সুতরাং মানুষের দায়িত্ব, নৈতিকতা ও ধর্ম অর্থহীন হতে পারে

না। মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আছেন বলে মানুষ যা খুশী তাই করতে পারে না। সুতরাং তার একটা দায়িত্ব বোধ থাকে। মানুষের মধ্যে দেবত্ব থাকায় এই দেবত্বকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করাই মানুষের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এই কর্তব্য-বোধই নীতি-বোধ জাগ্রত করে। ঈশ্বর জীবের সম্পূর্ণ বাইরে নন বলে সহজেই ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করা যায়। সুতরাং ভক্তের আকৃতি সর্বধরেশ্বরবাদে পরিপূর্ণ পরিপূর্তি লাভ করে। সর্বধরেশ্বরবাদে ঈশ্বর অনন্ত হয়েও সান্তকে প্রত্যাখ্যান করেন না, অসীম হয়েও সসীমকে তুচ্ছ বলেন না। সান্ত ও সসীমের মধ্যেই অসীম ও অনন্ত ঈশ্বর আপনার বিচিত্র লীলা চালিয়ে যান। সুতরাং এই মতবাদে জীব ও জগৎ মিথ্যা নয়। তাদের প্রত্যেকেরই অনন্ত সত্তায় যথাযোগ্য স্থান আছে। বিশ্বের উদ্দেশ্যমুখীনতাও সহজেই এই মতবাদে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেহেতু ঈশ্বর আপনার বিচিত্র উদ্দেশ্য এই জগতের মধ্য দিয়ে সফল করে নিচ্ছেন, সেজন্যই জগৎ যান্ত্রিকভাবে চলে না। এসব নানা দিক থেকেই সর্বধরেশ্বরবাদ যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

ঈশ্বরবাদ (Theism) :

হেগেলের সর্বধরেশ্বরবাদকে ঈশ্বরবাদও বলা হয়। কিন্তু মার্টিনিউ ঈশ্বরবাদ বলতে সর্বধরেশ্বরবাদ বোঝেন না। তাঁর ঈশ্বরবাদ হেগেলের ঈশ্বরবাদ বা সর্ব-ধরেশ্বরবাদ থেকে একটু স্বতন্ত্র। আমরা এখন মার্টিনিউ সাহেবের ঈশ্বরবাদের প্রকৃতি আলোচনা করব।

মার্টিনিউ হেগেলের মতই জগতের ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে অন্তর্ব্যাপী ও অতিবর্তী দুইই বলেন, অর্থাৎ মার্টিনিউ সাহেবের মতে ঈশ্বর জগতের মধ্যেও আছেন আবার বাইরেও আছেন। এই দিক থেকে হেগেলের ঈশ্বরবাদের সঙ্গে মার্টিনিউ সাহেবের ঈশ্বরবাদের কোন পার্থক্যই নেই। কিন্তু জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক-ব্যাপারে মার্টিনিউ ও হেগেল একই মতবাদ গ্রহণ করেন না। হেগেলের মতে জগতের মত জীবের বেলাতেও ঈশ্বর অন্তর্ব্যাপী ও অতিবর্তী।. কিন্তু মার্টিনিউ মনে করেন, ঈশ্বর জীবের সম্পূর্ণ অতিবর্তী। অর্থাৎ ঈশ্বর একেবারেই জীবের বাইরে থাকেন; জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের কোন নিবিড় সম্পর্কই নেই।

আমাদের মনে হয়, মার্টিনিউ সাহেবের কথা যুক্তিযুক্ত নয়। ঈশ্বর যদি: জীব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হন, তবে তাঁর সঙ্গে কোন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক

স্থাপন সম্ভব নয়। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে ভক্ত ঈশ্বরের অন্তরঙ্গতা যাচ্ঞা করেন। সুতরাং মার্টিনিউ সাহেবের কথা স্বীকার করলে ধর্মজীবনের আকূতি ও আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়।

অন্যদিক থেকেও মার্টিনিউ সাহেবের ঈশ্বরবাদের অসুবিধে আছে। মার্টিনিউ জীবকে ঈশ্বর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলে মনে করেন। একথা যদি সত্য হয় তবে জীব পূর্ণস্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হবে। কিন্তু পূর্ণস্বাতন্ত্র্য আর উচ্ছৃঙ্খলতা একই কথা। জীবের উচ্ছৃঙ্খলতা নিশ্চয়ই কেউ সমর্থন করবেন না। তারপর জীবের যদি পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য থাকে তবে ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে যখন জীবের ইচ্ছার দ্বন্দ্ব দেখা দেবে তখন জীব তার ইচ্ছামতই কাজ করবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে আর সর্বশক্তিমান বলা যাবে কি? সুতরাং ঈশ্বরকে জীবের সম্পূর্ণ অতিবর্তী বলা যায় না।

ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্পর্ক নিয়ে ওপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, হেগেলের সর্বধরেশ্বরবাদ বা ঈশ্বরবাদই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ ও মার্টিনিউ সাহেবের ঈশ্বরবাদ কোন না কোন দোষে দুষ্ট। সুতরাং ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে হেগেল যা বলেছেন, তাই গ্রহণ করতে হয়। ঈশ্বর জীব ও জগতের মধ্যেও আছেন, আবার বাইরেও আছেন। তিনি জীব ও জগতের অন্তর্ব্যাপী ও অতিবর্তী দুইই। অনন্ত পুরুষ ঈশ্বর জীব ও জগতের সীমা ও বন্ধনের মধ্য দিয়ে নিজের অসীমতা ও মুক্তি উপলব্ধি করেন। সীমার মধ্যে অসীমের সুর বাজে। সান্তের মধ্যে অনন্তের গান শোনা যায়।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ:

ঈশ্বরের প্রকৃতি ও ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্পর্ক আলোচনা করা হল। এখানে প্রশ্ন ওঠে—যে ঈশ্বর নিয়ে এত আলোচনা, তিনি যে আছেন, তার প্রমাণ কি? ভক্তেরা বলবেন— বিশ্বাসে মিলায় হরি, তর্কে বহুদূর। তাঁদের মতে ঈশ্বর প্রমাণের অতীত। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হয়। যুক্তিতর্ক বিচার-বিশ্লেষণ এখানে নিষ্ফল। কিন্তু তার্কিক ও দার্শনিক একথায় খুশী হন না। তাঁরা সব কিছুই প্রমাণের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখতে চান। সব বিষয়েই প্রমাণ খোঁজা তাঁদের স্বভাব বলে তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বেরও প্রমাণ খোঁজেন। বিভিন্ন দার্শনিক ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রমাণ বের করেছেন। কিন্তু তাঁদের কোন প্রমাণই ঈশ্বরের অস্তিত্ব

সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে পারে না। এখানে প্রশ্ন ওঠে কোন প্রমাণই যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ না করতে পারে তবে ঈশ্বরের এসব প্রমাণের তাৎপর্য কি ? লোট্‌জা (Lotze) বলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রমাণগুলো ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বাভাবিক বিশ্বাসের পক্ষে কতগুলো ওজর (pleas) মাত্র। যদি আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তবে এসব প্রমাণ আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় করতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নিরপেক্ষভাবে এসব প্রমাণ কখনই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্বে স্বাভাবিক বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করাই ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রমাণের তাৎপর্য। আমাদের মনে হয়,ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রমাণগুলোর আর একটা তাৎপর্যও আছে। মানুষের স্বভাবই এই যে, সে সব কিছুই যুক্তি দিয়ে বুঝতে চায়। সেজন্যই সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও যুক্তি খোঁজে। হয়ত তার এই অনুসন্ধান সম্পূর্ণ সফল হয় না। কিন্তু তা হলেও তার অনুসন্ধানের নিষ্ঠাকে ত আর অস্বীকার করা যায় না। মানুষের স্বাভাবিক এই অনুসন্ধান-নিষ্ঠার নিশ্চয়ই একটা দাম আছে। সফলতাই বড কথা নয়, প্রচেষ্টার নিষ্ঠা ও সঙ্কল্পের সাধুতাই বড কথা। এদিক থেকে বিচারে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রমাণ-গুলো মানুষের যুক্তি খোঁজার প্রচেষ্টার নিষ্ঠা সূচনা করে বলে তারা কখনই তাৎপর্যহীন হতে পারে না।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রমাণগুলোর মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আমরা এখন সেগুলো বিচার করে দেখব।

(১) বিশ্বতত্ত্ব-বিষয়ক বা আদিকারণ-বিষয়ক যুক্তি (The Cosmological or Causal Argument)

বিশ্বতত্ত্ব-বিষয়ক বা আদিকারণ-বিষয়ক যুক্তি সর্বজনগৃহীত কার্যকরণতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কার্যকারণতত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেক কার্যেরই কারণ থাকে ; কারণ ছাড়া কোন কার্যই হয় না। একথা যদি সত্য হয়, তবে প্রত্যেক কারণেরই আবার কারণ থাকবে। এমনি করে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। এ অনবস্থা দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এক আদি কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। এই আদি কারণ স্বয়ংসৃষ্ট (causa sui)। সুতরাং আদি কারণের আর কারণ নেই। এই আদি কারণের নামই ঈশ্বর।

বিশ্বতত্ত্ব-বিষয়ক বা আদিকারণ-বিষয়ক যুক্তিটিকে অন্যভাবেও প্রকাশ করা যেতে পারে। প্রত্যেক সাংশ বস্তুই কার্য। জগৎ বহু সাংশ বস্তুর সমষ্টি।

সুতরাং জগৎও কার্য। প্রত্যেক কার্যেরই কারণ থাকে বলে জগতেরও কোন না কোন কারণ থাকবে। জগতের কারণ কোন সসীম বস্তুই হতে পারে না। জগতের কারণ সসীম হলে তারও আবার একটা কারণ খুঁজতে হবে। সুতরাং জগতের কারণ অসীমই হবে। এই অসীম কারণের নামই ঈশ্বর।

সমালোচনা: ঈশ্বরকে জগতের আদি কারণ বলে স্বীকার করলে জগদতিরিক্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হয়। ঈশ্বর বিশেষ সময়ে জগৎ সৃষ্টি করেছেন তাও মানতে হয়। এক কথায় অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস-স্থাপন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আমরা অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি যে, এই মতবাদের দোষ-ত্রুটির অন্ত নেই। সুতরাং ঈশ্বরকে আদি কারণ বলা যায় না।

আদিকারণ-বিষয়ক যুক্তি কার্যকারণতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেক কার্যেরই কারণ থাকে। কিন্তু স্বয়ংসৃষ্ট কোন কারণে বিশ্বাস এই তত্ত্ব প্রমাণিত করতে পারে না। এ তত্ত্বানুসারে প্রত্যেক কারণেরই আবার কারণ থাকবে। সুতরাং কার্যকারণ-তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ঈশ্বরকে স্বয়ংসৃষ্ট আদি কারণ বলা যায় না।

আর একটা কথাও ভাবার আছে। সাধারণতঃ আমরা সসীম বস্তুর কারণ সসীম বস্তু বলেই মনে করি। কিন্তু আদিকারণ-বিষয়ক যুক্তিতে অসীম ঈশ্বরকে সসীম জগতের কারণ বলে মনে করা হয়েছে। সসীম কার্য থেকে অসীম কারণের অস্তিত্ব অনুমান করা যায় কি?

জগৎকে কার্য বলে ধরে নিলে এর কারণ হিসেবে অসীম ও অনন্ত ঈশ্বরকে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। আমরা ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু এই বিশ্বাস নিশ্ছিদ্র যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

(২) উদ্দেশ্যবাদ-বিষয়ক যুক্তি (Teleological Argument)

আমরা একাদশ অধ্যায়ে উদ্দেশ্যবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি যে, জগতের শৃঙ্খলা, ঘটনা-পারম্পর্য ও সুসমঞ্জস প্রকাশ জগতে এক উদ্দেশ্যমূলক কারণের অস্তিত্ব সূচনা করে। জগতের গঠন-পারিপাট্য ব্যাখ্যা করার জন্য এক অনন্ত চৈতন্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হয়। এ অনন্ত চৈতন্যই ঈশ্বর। উদ্দেশ্যবাদ বিষয়ক যুক্তি এ ধারণাই প্রকাশ করে। এ যুক্তিতে জগতের পরিকল্পক হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা দেখা যায়।

সমালোচনা : সাধারণভাবে উদ্দেশ্যবাদ-বিষয়ক যুক্তি অকাট্য বলেই মনে হয়। চরম সংশয়বাদী দার্শনিক হিউমও উদ্দেশ্যবাদ-বিষয়ক যুক্তি খানিকটা যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন।[১] বার্ট্রাণ্ড রাসেল জগতের উদ্দেশ্যমূলকতা যে একেবারে অবিশ্বাস করা যায় না, তা অস্বীকার করেন নি। কিন্তু উদ্দেশ্যবাদ-বিষয়ক যুক্তি যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করতে পারে না, একথা স্বীকার করতেই হবে।

উদ্দেশ্যবাদ-বিষয়ক যুক্তি আসলে একটি উপমার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা সাধাবণতঃ যে কোন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল বস্তুই কোন না কোন শিল্পীর সৃষ্টি বলে মনে করি। জগৎ সুন্দর ও সুশৃঙ্খল বলে এব স্রষ্টা হিসেবে আমরা অনন্ত ও অসীম ঈশ্বরকে স্বীকার করি। আমাদের মনে হয়, এ উপমা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। সাধারণ শিল্পী দৈহিক বিভিন্ন অঙ্গের ব্যবহার করে শিল্পবস্তু তৈরী করেন।

কিন্তু ঈশ্বর চিন্ময় হওয়ায় তাঁর পক্ষে তা সম্ভব নয়। ঈশ্বরকে জগতের শিল্পী বলতে গেলে তাঁকে দেহী বলতে হয়। কিন্তু ঈশ্বর অসীম ও অনন্ত বলে দেহী হ'তে পাবেন না। কারণ, যে কোন দেহই বিশেষ স্থান ও কাল জুড়ে থাকে। সুতরাং যে কোন দেহীই অসীম ও অনন্ত হ'তে পারে না। সাধারণতঃ আমরা সসীম শিল্প-বস্তুর স্রষ্টাকে সসীম শিল্পী বলেই দেখতে পাই। সুতরাং এ উপমা থেকে সসীম জগতের শিল্পীকে সসীমই বলা যেতে পারে। কিন্তু উদ্দেশ্যবাদ-বিষয়ক যুক্তিতে জগতের যে শিল্পীর কথা বলা হয়েছে, তিনি অসীম ও অনন্ত ঈশ্বর। সুতরাং উদ্দেশ্যবাদ-বিষয়ক যুক্তির সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়।

(৩) তত্ত্ববিষয়ক যুক্তি (The Ontological Argument)

তত্ত্ববিষয়ক যুক্তি ঈশ্বরের ধারণার তাত্ত্বিক বিচার থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করে। মধ্য যুগে সেণ্ট আন্‌সেলম্ এ যুক্তির প্রথম অবতারণা করেন। পরবর্তীকালে ডেকার্টে, হেগেল প্রভৃতি অনেক দার্শনিকই বিভিন্ন ভাবে এ মতবাদ গ্রহণ করেছেন।

সেণ্ট আন্‌সেল্‌ম বলেন, আমাদের মনে এক পূর্ণ সত্তার ধারণা আছে। এ পূর্ণ সত্তা নিশ্চয়ই অস্তিত্বশীল হবে। কারণ অস্তিত্বশীলতা পূর্ণতার এক লক্ষণ। যার অস্তিত্ব নেই তাকে পূর্ণ বলা যায় না। সুতরাং পূর্ণ পুরুষ ঈশ্বরকে অস্তিত্বশীল বলতে হয়।

১। উৎসাহী পাঠক হিউমের মতবাদের পূর্ণ পরিচয় পাওয়ার জন্য হিউমের 'Dialogues concerning Natural Religion' গ্রন্থটি পড়তে পারেন।

ডেকার্টে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য আন্‌সেল্‌মের যুক্তিই একটু ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের এক অসীম সত্তার ধারণা আছে। কোন সসীম মানুষই এ অসীম সত্তার ধারণার সৃষ্টি করতে পারে না। সসীম মানুষ সসীম বস্তুর ধারণাই করতে পারে। সুতরাং অসীম সত্তার ধারণার স্রষ্টা হিসেবে অসীম সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হয়। এ অসীম সত্তাই ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বর আছেন।

কাণ্ট তত্ত্ববিষয়ক যুক্তি তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন, কোন ধারণাই বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না। আমার একশ ডলারের ধারণা নিশ্চয়ই আমার পকেটে একশ ডলারের অস্তিত্ব প্রমাণ করে না। পূর্ণ ও অসীম সত্তার ধারণা থেকে অস্তিত্বের ধারণা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু অস্তিত্বের ধারণা ও আসল অস্তিত্ব এক কথা নয়। সুতরাং ঈশ্বরের ধারণা থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না।

হেগেল কাণ্টের এ যুক্তি খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, ধারণা বস্তুর অস্তিত্ব সূচনা করে। বস্তু না থাকলে ধারণাই থাকতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের ধারণা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

মন্তব্য : আমাদের মনে হয়, হেগেলের কথা সহজে উপেক্ষা করা যায় না। ধারণা কখনও কখনও বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে। ঈশ্বর বলতে আমরা এক পরিপূর্ণ পুরুষ বুঝি। পরিপূর্ণতা আমাদের জীবনের এক আদর্শ বিশেষ। আদর্শ যদি বাস্তব (real) ও সত্য না হয়, তবে মনুষ্য-জীবনের পরিপূর্ণতা লাভের সমস্ত আকূতি তাৎপর্যহীন হ'য়ে পড়ে। পরিপূর্ণতা লাভের আকূতিই মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে দিয়েছে। যদি এ আকূতি অবাস্তব ও মিথ্যা হয়, তবে মানুষের সঙ্গে পশুর কোন তফাৎই থাকে না। সুতরাং মানুষের পরিপূর্ণতার আদর্শকে বাস্তব ও সত্য না বলে উপায় নেই। মানুষের এ আদর্শ রূপ নিয়েছে ঈশ্বরের পরিপূর্ণতার রূপে। সুতরাং ঈশ্বরকে অস্তিত্বশীলই বলতে হয়।

কাণ্ট নিজে নীতির আদর্শের তাৎপর্য রক্ষার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছেন। তিনি বলেন, ধর্ম পুরস্কৃত হবে ও ধার্মিক সুখী হবে—এ আমাদের নৈতিক জীবনের দাবী। কিন্তু এ জগতে প্রায়ই আমরা ধার্মিককে সুখী হতে দেখি না। সুতরাং এমন এক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হয় যিনি পরজন্মে হলেও ধার্মিককে পুরস্কৃত করবেন। নৈতিক জীবনের সার্থকতা প্রতিপন্ন করার জন্য কাণ্ট যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তবে মানুষের পরিপূর্ণতা লাভের আকূতির তাৎপর্য বিধানের জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানতে বাধা কি ?

পরও সুন্দর থাকবে। আমার সুন্দরের জ্ঞান আমার দেখার ওপরই নির্ভর করে, কিন্তু সুন্দরের অস্তিত্ব দেখার ওপর নির্ভর করে না। আমি যা জানি না, আমি যা কখনও দেখিনি তাও অনায়াসে সুন্দর হতে পারে।

তাঁরা আরও বলেন, সুন্দর যদি আমার ওপর নির্ভর করত তবে মহৎ শিল্পের সৌন্দর্য ত সবাই উপলব্ধি করতে পারত না। সুন্দর বস্তুগত বলেই বিভিন্ন লোকের কাছে একই বস্তুর সৌন্দর্য ধরা দেয়। অজন্তা ইলোরার চিত্রসম্ভার আজ পর্যন্ত কারও কাছে অসুন্দর বলে ত মনে হয়নি। সুতরাং অজন্তা ইলোরার চিত্রের মধ্যেই সৌন্দর্য আছে, একথা মানতেই হবে। মানুষ তা দেখে সুন্দর বলছে বলেই তা সুন্দর নয়। মানুষ যদি তা না দেখত তবুও তা সুন্দরই থাকত।

আমাদের মনে হয়, এ মতবাদ খানিকটা সত্যি হলেও সম্পূর্ণ সত্যি নয়। জাতিতে জাতিতে, নবীনে প্রবীণে, একালে সেকালে সৌন্দয যে বিভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দেয়, তা অস্বীকার করা যায় না। কালী মায়ের কালোরূপের আলো দেখে ভক্ত যখন মুগ্ধ হ'ন, কোন বিদেশী হয়ত তখন তাকে বীভৎস বলে অবজ্ঞা করে। উড়িষ্যায় মন্দিরগাত্রের খোদিত মূর্তি দেখে কেউ কেউ তৃপ্ত হন, আবার পশ্চিমের কোন কোন লোক তাদের চরম অসুন্দর বলে সমালোচনা করেন। সুতরাং সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিষয়গত, তা বলা যায় না।

কিন্তু তা বলে যাঁরা সৌন্দর্যকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করেন, তাঁদের কথাও সত্যি নয়। তাঁদের মতে বস্তুতে সৌন্দর্য বলে কিছু নেই, মানুষ যাকে সুন্দর বলে তাই সুন্দর, আর মানুষ যাকে অসুন্দর বলে তাই অসুন্দর। মানুষই নিজের মনের মাধুর্য দিয়ে সুন্দরকে সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ বলেন,

আমারই চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হ'য়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠলো আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর—
সুন্দর হল সে।

যাঁরা বলেন, সৌন্দর্য সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাঁদের কথা এর চেয়ে সুন্দর ও সহজ করে আর প্রকাশ করা যায় না।

আমাদের মনে হয়, এ মতবাদও খানিকটা সত্যি হলেও সম্পূর্ণ সত্যি নয়। সৌন্দর্য খানিকটা মানুষের মনের রঙে রঙিন হয়, তা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু সুন্দর সম্পূর্ণরূপেই মানুষের মনের সৃষ্টি, তাও মানা যায় না। আমি আকাশের দিকে চোখ মেললুম বলেই আলো জ্বলে উঠল, আর গোপালকে সুন্দর বললুম বলেই তা সুন্দর হল—একথা মানা মুশকিল। আমরা বলতে পারি, আকাশে আলো ছিল, আমার মনের আলো লেগে তা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু যেখানে একেবারেই আলো নেই, সেখানে শুধু মনের আলো কোন আলোই সৃষ্টি করতে পারে না। গোলাপ স্বভাবতঃই সুন্দর, মানুষের রঙিন মনের পরশ পেয়ে তার সৌন্দর্য আরও একটু মধুর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু অসুন্দর গোলাপ কখনই মানুষের মনের স্পর্শ পেয়ে সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না। সুতরাং সুন্দরকে খানিকটা পরিমাণে বস্তুগত আর খানিকটা পরিমাণে ব্যক্তিগতই বলতে হয়। সৌন্দর্যসৃষ্টিতে বস্তু ও ব্যক্তি উভয়েরই অবদান আছে। নির্মেঘ নীল আকাশে যে সন্ধ্যাতারা নিঃসঙ্গ একাকী জ্বলছে, তার নিঃসঙ্গতার এমনিতেই একটা সৌন্দর্য আছে।' কবি-মনের ছোঁয়া লেগে তা আরও সুন্দর, আরও সার্থক ও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। গায়কের কণ্ঠে যে সুরের মূর্ছনা দেখা দেয়, তা শ্রোতার অন্তর-রসে রসসিক্ত হয়ে পরিপূর্ণ রূপ নেয়। বস্তুর সৌন্দর্য যেন অন্ধ। মানুষ যেন তার কল্পনার শলাকা দিয়ে এ অন্ধতা ঘুচিয়ে দেয়। অন্ধ না থাকলে ত আর তার দৃষ্টি দেওয়া যায় না। আবার দৃষ্টি দিতে গেলে শিল্পীর শলাকাও দরকার। সুতরাং সৌন্দর্যের চক্ষুষ্মান্ রূপের জন্য বস্তু ও মনের কল্পনা উভয়ই দরকার। সাধারণতঃ বলা হয়, বস্তুর গঠন-ভঙ্গীর সামঞ্জস্য, উপাদানের ঐক্য ও গঠন-ভঙ্গীর সঙ্গে উপাদানের সামঞ্জস্য সৌন্দর্যের বস্তুগত ভিত্তি। এ ভিত্তিতে যখন রসিক মনের পরশ লাগে তখনই সৌন্দর্যের ইমারৎ দাঁড়িয়ে যায়। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় এ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা উদ্ধার করেই আমরা এ প্রসঙ্গের উপসংহার করি। তিনি বলেন, "সুন্দর জিনিসের বাইরের উপকরণে আর ভিতরের পদার্থে হরিহর আত্মা—যেমন রূপ, তেমনি ভাব। বহিরঙ্গ যা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গের অবিচ্ছেদ্য মিলন ঘটিয়ে সুন্দর বর্তমান হ'ল। চোখের বাইরে যে পরকলা তার সঙ্গে চোখের ভিতরে যে মণি-দর্পণ তার যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য হ'ল; তখনই সুন্দরভাবে দেখতে পাওয়া গেল বিশ্বের জিনিস, চশমার কাঁচে আঁচড় পড়ল চোখ রইল পরিষ্কার, কিংবা চোখের মণিতে ছানি পড়ল চশমা রইল ঠিকঠাক, এ হ'লে সুন্দর দেখা একেবারেই সম্ভব হ'ল না।"

ওপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, মানুষের চিন্তার আদর্শ সত্য, কৃতির আদর্শ শিব আর অনুভূতির আদর্শ সুন্দর। মানুষের জীবনের এই ত্রি-আদর্শ নিয়ে তিনটি আদর্শ বিজ্ঞান (Normative Science) গড়ে উঠেছে। যে আদর্শ-বিজ্ঞান সত্য নিয়ে আলোচনা করে তার নাম ন্যায়শাস্ত্র বা তর্কবিজ্ঞান। যে আদর্শ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় শিব, তার নাম নীতিশাস্ত্র। আর যে আদর্শ-বিজ্ঞান সুন্দরকে নিযে আলোচনা করে তার নাম নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics)। আমরা এখন ঈশ্বরের সঙ্গে মানব-জীবনের ত্রি-আদর্শের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব।

মূল্য ও তত্ত্ব (Value and Reality)

মান বা মূল্যের সঙ্গে তত্ত্বের সম্পর্ক কি, তা আলোচনা করা দরকার। বিভিন্ন দার্শনিক এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করেন।

(১) কারও কারও মতে মান বা মূল্য তত্ত্বের চেযে উচ্চস্তরের, আদর্শ বাস্তবেব চেযে মহত্তর ও উন্নততর। প্লেটো এক হিসেবে এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। প্লেটোর দর্শনে ধারণাই তত্ত্ব। বস্তু ধাবণার ছাযা মাত্র। ধারণা-গুলোর মধ্যে শিবের ধারণা (The Idea of Good) সব চেয়ে উচ্চস্তরের। সুতরাং শিব সাধারণ তত্ত্বের চেয়ে বড। শিব যে এক মূল্য বা আদশ তা আমরা আগেই বলেছি। সুতরাং প্লেটোর দশনে আদর্শকে তত্ত্বের চেয়ে বডই বলা হযেছে। আধুনিক কালে রিকার্ড (Rickard)-ও তত্ত্বের চেয়ে মান বা মূল্যকে বড বলে মনে করেছেন। তিনি বলেন, মূল্য আদর্শ হিসেবে তত্ত্বের চেয়ে উচ্চতর, মহত্তর ও উন্নততর।

আমাদের ধারণা, মূল্য বা মান মানুষের সঙ্গে বিশেষভাবে জডিত। সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শও মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়েই সাথকতা লাভ করে। মানুষের আদর্শকে তত্ত্বের চেয়ে বড় বলার মধ্যে মানুষের অহমিকা প্রকাশ পায়। দুনিয়ায় মানুষের আদর্শকেই সবচেয়ে বড বলার বিশেষ কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। তত্ত্ব মানুষের আদর্শ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হবে, এ ত মানুষের ঐকান্তিক বাসনামাত্র। মানুষের বাসনা অনুসারেই বস্তু রূপ নেবে, এমন কথা ভাবার পেছনে কোন সঙ্গত যুক্তি আছে কি?

(২) পশ্চিমের দর্শনে ব্র্যাডলি বলেছেন, মান বা মূল্যের ধারণার মধ্যে আত্ম-বিরোধ (self-contradiction) আছে। যা আত্মবিরোধযুক্ত তাকে

তত্ত্ব বলা যায় না। সুতরাং মান বা মূল্যের কোন তাত্ত্বিক সত্তা নেই। মান বা মূল্য আভাস মাত্র (appearance)। অবশ্য সব আভাসই চরম তত্ত্বের কোলে একটু পরিবর্তিত হয়ে স্থান পায়। চরম তত্ত্ব কাউকেই প্রত্যাখ্যান করে না। মূল্যের ধারণার মধ্যে আত্ম-বিরোধ দেখাতে গিয়ে ব্র্যাড্‌লি বলছেন, মূল্য কল্পনামাত্র নয়, সুতরাং তাকে অস্তিত্বহীন বলা যায় না। আবার টেবিল চেয়ারের মত মূল্য দেশ-কাল জুড়ে আছে, এমন কথাও বলা যায় না। সুতরাং মূল্য অস্তিত্বসম্পন্ন হতে পারে না। কাজেই মূল্য অস্তিত্বসম্পন্ন ও অস্তিত্বসম্পন্ন নয়—এমন অদ্ভুত স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। সুতরাং মূল্যের তাত্ত্বিক সত্তা স্বীকার করা যায় না।

আমাদের মনে হয়, মূল্যের ধারণার মধ্যে কোন স্বতঃবিরোধই নেই। 'মূল্য অস্তিত্বসম্পন্ন আর অস্তিত্বহীন' এ দু-কথার মধ্যে 'অস্তিত্ব' শব্দটি দুটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যদি তারা একই অর্থে ব্যবহৃত হত, তবে চিন্তা-বিরোধ দেখা দিত। কিন্তু যেহেতু 'অস্তিত্বসম্পন্ন' শব্দে 'অস্তিত্ব' বলতে যুক্তিগ্রাহ্যতা ও 'অস্তিত্বহীন' শব্দে 'অস্তিত্ব' বলতে দেশে কালে স্থিতি বুঝিয়েছে, সুতরাং এখানে কোন চিন্তা-বিরোধ দেখা দেয়নি। কাজেই মূল্যকে এ যুক্তিতে আভাসমাত্র বলা যায় না। আর তর্কের খাতিরে মূল্যকে আভাস বলে ধরে নিলেও তত্ত্বের বিস্তৃত বক্ষে কি করে এ আভাস স্থান লাভ করে, তা আমরা বুঝি না। আভাস যদি আভাস হয় তবে নিশ্চয়ই তা তত্ত্ব নয়। আর যা তত্ত্ব নয় তা তত্ত্বে কি করে থাকে, তাও বোঝা যায় না। সুতরাং এদিক থেকেও ব্র্যাড্‌লির বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

(৩) হেগেলের বক্তব্য অনুসরণ করে রয়েস্ বলেছেন, চরমতত্ত্বেই মানুষের সব মূল্য ও আদর্শ পরিপূর্ণ পরিপূর্তি লাভ করে। মানুষের কাছে সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শ কখনও বাস্তবে রূপায়িত হয় না। মানুষ এসব আদর্শ নিজেদের জীবনে সম্পূর্ণ সার্থক করে তুলতে চায়। কিন্তু সীমিত ক্ষমতা নিয়ে মানুষ তা কখনই পারে না। খানিকটা পরিমাণে মাত্র সে সার্থকতা লাভ করে। কিন্তু মানুষের কাছে সত্য-শিব-সুন্দর আদর্শ হলেও এগুলো এক পরম পুরুষের মধ্যে বাস্তব রূপ লাভ করে। সে পুরুষোত্তম ঈশ্বর, আবার সে ঈশ্বরই চরমতত্ত্ব। সুতরাং পুরুষোত্তম বা ঈশ্বরের জীবনে মানুষের সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শ চরম সার্থকতা লাভ করে।

ঈশ্বর বা পুরুষোত্তমের জীবনে মানুষের আদর্শ পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করে, একথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু হেগেল, রয়েস্ প্রভৃতি ভাববাদী

দার্শনিকেরা ঈশ্বরকেই চরমতত্ত্ব বা পরব্রহ্ম বলেছেন, তা আমরা মানতে রাজী নই। পরব্রহ্ম যে কেন ঈশ্বর হতে পারেন না, তা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। সুতরাং এখানে আবার তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যা হোক্, পরব্রহ্ম যেহেতু ঈশ্বর নন, সুতরাং ঈশ্বরে যখন মানুষের আদর্শ পরিপূর্ণতা লাভ করে তখন তা পরব্রহ্মেও পরিপূর্ণতা লাভ করে, একথা বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর যা বলেছেন, তাই আমাদের কাছে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। শঙ্কর বলেন, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে পরব্রহ্মকেই ঈশ্বর বলে মনে হয়। পরব্রহ্ম নির্গুণ। কিন্তু প্রাকৃতজনের কাছে এই নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণ ঈশ্বর হয়ে দেখা দেয়। এ ঈশ্বরের মধ্যে মানুষের সমস্ত আদর্শ পরিপূর্ণতা লাভ করেন। সগুণ ঈশ্বরই মানুষের সমস্ত আদর্শের একমাত্র সংরক্ষক। তাঁর পূর্ণতাতেই আদর্শ পূর্ণতা লাভ করে। পরব্রহ্ম সম্বন্ধে মানুষের কোন মূল্যই প্রযোজ্য নয়। পরব্রহ্মকে যখন চরম সত্য বলে পরিচয় দেওয়া হয় তখন পরব্রহ্ম যে অসত্যাতিরিক্ত তাই বোঝান হয়। সত্যতা পরব্রহ্মের কোন গুণ নয়। পরব্রহ্ম সম্পূর্ণ নির্গুণ। জাগতিক ব্যবহারে তিনি ঈশ্বর বলে পরিচিত। যদিও পারমার্থিক দৃষ্টিতে ঈশ্বরের কোন স্থিতি নেই, তবু জগৎ ও জীবের প্রসঙ্গে ঈশ্বর একান্ত অসৎ নন। এ ঈশ্বরের মধ্যে মানুষের জীবনের মূল্য ও আদর্শ সার্থক ও সফল হয়ে ওঠে। যেহেতু জগতের জীবের কাছে ঈশ্বর অসৎ নন, সুতরাং তার কাছে ঈশ্বরের জীবনের সত্য-শিব-সুন্দরের প্রকাশও অসৎ হ'তে পারে না। জগতের জীবের কাছে সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শ সত্যের আলোতে জ্বলে, আর ঈশ্বরের জীবনে তা সার্থকতা লাভ করে। সুতরাং জগৎ ও জীবের প্রসঙ্গে মানবিক কোন মূল্যই অর্থহীন নয়। তবে এদের কোন পারমার্থিক সত্তা নেই। কিন্তু মানবিক মূল্যের কোন পারমার্থিক সত্তা নেই বলে মানুষের এই জাগতিক জীবনে তাদের মূল্য একটুও কমে না।

অষ্টাদশ অধ্যায়

তত্ত্ব-সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ—বহুতত্ত্ববাদ, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ

(The Different Theories of Rality—Pluralism, Dualism and Monism)

তত্ত্বের প্রকৃতি (The Nature of Reality):

জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যাদান ও মূল্যাবধারণ দার্শনিকের কাজ। কোন না কোন নিয়ম বা তত্ত্ব দিযেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সেজন্যই দার্শনিক-ব্যাখ্যা তত্ত্ব ভিন্ন হ'তে পাবে না। তত্ত্বের প্রকৃতি কি এবং সংখ্যা কত তা নির্ণয় কবা দার্শনিকদের কর্তব্যের অঙ্গ। তত্ত্বের প্রকৃতি-প্রসঙ্গে দু'টি মতবাদ প্রচলিত। একটির নাম জডবাদ (Materialism), অন্যটি অধ্যাত্মবাদ (Spiritualism)। জডবাদীদের মতে জগৎ ও জীবনের মূলতত্ত্ব জড বা জডীয়। কিন্তু, অধ্যাত্মবাদী-দের মতে চৈতন্য বা অধ্যাত্মতত্ত্ব দিযেই বিশ্বভুবনের ব্যাখ্যা হ'তে পারে; চৈতন্যই বিশ্বেব মূলতত্ত্ব। অধ্যাত্মবাদীদের কথা আমরা ভাববাদ প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করেছি। পুনরালোচনা নিষ্প্রযোজন। জডবাদও আলোচিত হযেছে এই গ্রন্থে। সুতরাং তত্ত্বেব প্রকৃতি নিযে কোন মতবাদেরই পুনরালোচনার আবশ্যকতা নেই।

তত্ত্বের সংখ্যা কত? (How many reals are there?)

তত্ত্বসম্পর্কিত আর একটি প্রযোজনীয় প্রশ্ন—তত্ত্বের সংখ্যা কত? দার্শনিকেরা এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে বিভিন্ন সমাধানে এসে পৌঁছেছেন। কোন কোন দার্শনিক বলেন, তত্ত্ব অনেক। এঁদের বহুতত্ত্ববাদী (Pluralists) বলা হয় এবং এঁদের মতবাদ বহুতত্ত্ববাদ (Pluralism) নামে পরিচিত। বহুতত্ত্ববাদ-এর দুই রূপ—জডাত্মক (Materialistic) এবং অধ্যাত্মমূলক (Spiritual)। পরমাণুবাদীরা (Atomists) জডাত্মক বহুতত্ত্ববাদী। লাইব্-নিজ অধ্যাত্মমূলক বহুতত্ত্ববাদী। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোকেও অধ্যাত্মমূলক বহুতত্ত্ববাদা বলা যায়। অনেকেশ্বরবাদীরাও (Polytheists) অধ্যাত্মমূলক বহুতত্ত্ববাদী।

আমরা নবম অধ্যায়ে জড় ও জড়বাদ প্রসঙ্গে জড়াত্মক বহুতত্ত্ববাদ নিয়ে আলোচনা করেছি। পঞ্চম অধ্যায়ে ভাববাদ আলোচনাকালে লাইবনিজ ও প্লেটোর অধ্যাত্মমূলক বহুতত্ত্ববাদ বিশ্লেষণ করেছি। অনেকেশ্বরবাদও ষোড়শ

অধ্যায়ে ঈশ্বর-কথা-প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। আমরা এ অধ্যায়ে শুধু দার্শনিক জেমসের বহুতত্ত্ববাদ নিয়ে আলোচনা করবো। ভারতীয় দর্শনে ন্যায় বৈশেষিক দার্শনিকেরা বহুতত্ত্ববাদী। আমরা তাঁদের কথা আমাদের লেখা 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থে আলোচনা করেছি।

অনেক দার্শনিকের মতে তত্ত্বের সংখ্যা বহু নয়, দুই। এঁদের দ্বৈতবাদী (Dualists) বলা হয়। দ্বৈতবাদীদের মত দ্বৈতবাদ (Dualism) নামে খ্যাত। গ্রীক দার্শনিক অ্যানাক্সাগোরাস-এর চিন্তায়, দার্শনিক ডেকার্টের মতে এবং ভারতীয় দার্শনিক সাংখ্যবাদীদের পুরুষ ও প্রকৃতির ধারণায় দ্বৈতবাদ প্রচারিত। এঁদের সকলের মতেই দুইটি তত্ত্বের মধ্যে একটি অধ্যাত্ম-মূলক (Spiritual) এবং অন্যটি জড়াত্মক (Material)। দ্বীশ্বরবাদীরা ও (Ditheists) দ্বৈতবাদী। এঁদের মতে দুইটি তত্ত্বই বলে ঈশ্বর চৈতন্যস্বভাব (Spiritual)। আমরা ষোড়শ অধ্যায়ে এঁদের কথা আলোচনা করেছি। সাংখ্যবাদীদের বক্তব্য পাওয়া যাবে আমাদের লেখা 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থে। আমরা এ অধ্যায়ে অ্যানাক্সাগোরাস ও ডেকার্টের দ্বৈতবাদ নিয়ে আলোচনা করবো।

বহু দার্শনিকের মতে তত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয়। এঁদের অদ্বৈতবাদী (Monists) বলা হয়। অদ্বৈতবাদীদের মত অদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। অদ্বৈতবাদের তিনটি রূপ—জড়বাদী (Materialistic), অধ্যাত্মবাদী (Spiritualstic) এবং মধ্যপন্থী (Neutral)। আমরা পূর্বেই জড়বাদ আলোচনা করেছি।

অধ্যাত্মমূলক অদ্বৈতবাদ দ্বিবিধ—কেবলাদ্বৈতবাদ (Abstract Monism) এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (Concrete Monism)। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে স্পিনোজা কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। আচার্য শঙ্কর ভাবতীয় দর্শনে অনেকটা এ মতই প্রচার করেছেন, তবে স্পিনোজার সঙ্গে শঙ্করের পার্থক্যও সুস্পষ্ট। স্পিনোজার মতে জগৎ সত্য না মিথ্যা, এ নিয়ে মতভেদ আছে। শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা এবং এ নিয়ে কোন মতভেদের অবকাশ নেই। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে হেগেল, কেয়ার্ড, রয়েস প্রভৃতি দার্শনিকেরা এবং ভারতীয় দর্শনে রামানুজাচার্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। আমরা এ অধ্যায়ে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের কেবলাদ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নিয়ে আলোচনা করবো। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ এবং রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-এর আলোচনা আমাদের লেখা 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

রাসেল প্রভৃতি নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের (Neo-realists) মতে তত্ত্ব জড়াত্মকও নয়, আধ্যাত্মিকও নয়, মধ্যরূপী (Neutral)। এঁদের মতই মধ্যপন্থী অদ্বৈতবাদ (Neutral Monism) নামে খ্যাত। আমরা এঁদের মতও এই অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

বহুতত্ত্ববাদ (Pluralism)

বহুতত্ত্ববাদীদের মতে জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা এক বা দুই তত্ত্ব দিযে সঙ্গতভাবে করা যায না, সঙ্গত ব্যাখ্যার জন্য বহুতত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। আমরা পূর্বেই বলেছি, জড় পরমাণুবাদ, চিৎপরমাণুবাদ, প্লেটোবাদ, অনেকেশ্বরবাদ এবং জেমসের বহুত্ববাদ বহুতত্ত্ববাদের বিভিন্ন রূপ। জেমসের বহুত্ববাদ ছাড়া অন্য সমস্ত বহুতত্ত্ববাদই আমরা এই গ্রন্থের পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। আমরা এখানে শুধু জেমসের বহুতত্ত্ববাদ নিযেই আলোচনা করবো।

জেম্‌সের বহুতত্ত্ববাদ (Pluralism as advocated by William James)

আমেরিকার দার্শনিক উইলিযম জেম্‌স্ প্রযোগবাদ-এর প্রবক্তা ও প্রচারক। তাঁর মত মুখ্যতঃ 'Pragmatism' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ পাওয়া যায। তিনি এই গ্রন্থে হেগেলের পরব্রহ্মবাদ-এর তীব্র সমালোচনা করেছেন ' হেগেলের মতে এই বিশ্বসংসার এক পরমব্রহ্মের প্রকাশ এবং বিশ্বের বস্তুনিচয পরস্পর একান্ত বিচ্ছিন্ন নয, এক আঙ্গিক ঐক্যে (organic unity) আবদ্ধ।

জেম্‌স্ হেগেলের জগৎকে স্বাধীনতাহীন, বৈচিত্র্যহীন এক বদ্ধজগৎ (Block Universe) বলে বিদ্রূপ করেছেন। তাঁর মতে জগৎ এক অদ্বৈত পরব্রহ্মের প্রকাশ হ'লে জগতের সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য ও গতিশীলতার কোন ব্যাখ্যা হয় না। জগতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন বস্তু বর্তমান, এদের মধ্যে কোন আঙ্গিক ঐক্য নেই। এই বিচিত্র জগতের ব্যাখ্যা একমাত্র বহুতত্ত্ব দিয়েই করা সম্ভব, কোন একটি তত্ত্বই এই বিচিত্রের নিহিতার্থ বিধান করতে পারেনা। জেম্‌স্ বৈচিত্র্যের জয়গান করেছেন, ঐক্যের তিনি ভক্ত নন।

সমালোচনা—জগতে বৈচিত্র্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই বৈচিত্র্য-এর অর্থ বিশৃঙ্খলা নয়। জগতে বিচিত্র বস্তুরাজি এমনভাবে সন্নিবিষ্ট যে, তাতে প্রচ্ছন্ন ঐক্য বর্তমান। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আছে বলেই এ জগৎ এমন সুন্দর। নইলে জগৎ হ'ত বিশৃঙ্খল ও অসুন্দর। আমরা অভিব্যক্তি আলোচনা

কালে জগতের রচনা-পারিপাট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং সিদ্ধান্ত করেছি যে, জগতে বিশৃঙ্খলা নেই, ঐক্যই আছে। সুতরাং জেমসের বৈচিত্র্যবাদ বা বহুত্ববাদ আমাদের কাছে অযৌক্তিক বলে মনে হয়। শুধু জেম্‌স্ কেন, সমস্ত বহুত্ববাদীরাই বৈচিত্র্যবাদী। তাঁরা কেউই জগতের ঐক্যের, শৃঙ্খলার, সৌন্দর্যের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন না।

বিজ্ঞান ও দর্শনের সম্পর্ক আলোচনাকালে আমরা বলেছি, অনেককে একের অধীনে আনাই ব্যাখ্যার কাজ। দার্শনিক জগৎ ও জীবনের সামগ্রিক ব্যাখ্যাদানের প্রয়াসী। তিনি জগৎ ও জীবনের চরম ব্যাখ্যা দেবেন তখনই যখন মাত্র একটি তত্ত্ব দিয়ে সব কিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব হ'বে। এদিক থেকে বহুতত্ত্ববাদী দার্শনিকেরা যে জগৎ ও জীবনের চরম ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি, তা মানতে হ'বে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বলার আছে। জেম্‌স্ প্রভৃতি বহুতত্ত্ববাদীরা বহুতত্ত্বের সত্যতা স্বীকার করেছেন, কিন্তু এদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে কিছু বলেন নি। বহুতত্ত্ব কিভাবে সম্পর্কিত তা না বললে বহুতত্ত্ব সম্পর্কে শেষ কথা বলা হয় না। সেজন্যই আমরা মনে করি, বহুতত্ত্ববাদ বহুত্বের সম্পর্ক আলোচনা করেনি বলে অসম্পূর্ণ।

দ্বৈতবাদ (Dualism)

মানুষের চিন্তার অগ্রগতির ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায়, মানুষ প্রথমতঃ ছিল বহুতত্ত্ববাদী, তারপর তাদের মধ্যে দ্বৈতবাদের আবির্ভাব হয়েছে এবং সর্বশেষে তারা অদ্বৈতবাদের ধারণা করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বহুতত্ত্ববাদের পরেই দ্বৈতবাদ।

দ্বৈতবাদীদের মতে জড় ও চৈতন্য (Matter & Mind), এই দুইটি তত্ত্বই বিশ্বের মূল কারণ। এই দুইটি তত্ত্ব দিয়েই বিশ্বের ব্যাখ্যা-দান সম্ভব। দ্বৈতবাদীরা আরও বলেন, জড় ও চৈতন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দু'টি সত্তা, একটিকে কখনই আর একটিতে পরিণত করা যায় না।

প্রাচীনকালে, মধ্যযুগে এবং আধুনিককালে দ্বৈতবাদ বিভিন্ন দার্শনিকের মধ্যে বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমাদের মনে হয়, গ্রীক দার্শনিক অ্যানাক্সাগোরাস একদিক থেকে পরমাণুবাদী বলে যেমন বহুতত্ত্ববাদী ছিলেন তেমনি আবার অন্যদিক থেকে বিচার করলে দ্বৈতবাদীও ছিলেন। অ্যানাক্সাগোরাস যেমন জড়পরমাণুতে বিশ্বাসী ছিলেন তেমনি আবার তাদের নিয়ন্ত্রিত

করার জন্য Nous নামে একটি চৈতন্য সত্তাও স্বীকার করেছেন। সুতরাং অ্যানাক্সাগোরাস-এর মতে জড় ও চৈতন্য দু'টি সত্তা, একথাও বলা যেতে পারে। ভারতীয় দর্শনে ন্যায় বৈশেষিকেরা সাধারণতঃ বহুতত্ত্ববাদী বলে পরিচিত হলেও জগতের উপাদান কারণ জড়পরমাণু এবং নিমিত্ত কারণ ঈশ্বর একথা প্রচার করে একপ্রকার দ্বৈতবাদও ঘোষণা করেছেন বলে মনে হয়। ভারতীয় দর্শনে সাংখ্যকার কপিল পুরুষ ও প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে দ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। সাংখ্যমতে পুরুষ চৈতন্যস্বভাব এবং প্রকৃতি জড়, এঁরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং এ দের সংযোগে বিশ্বের অভিব্যক্তি হয়।

মধ্যযুগে অধিকাংশ দার্শনিকই দেহ ও আত্মার পার্থক্য স্বীকার করে একপ্রকার দ্বৈতবাদই প্রচার করেছেন। তাঁদের মতে দেহ জড়াত্মক এবং আত্মা একটি আধ্যাত্মিক দ্রব্য (Spiritual substance)।

আধুনিক কালে দার্শনিক ডেকার্টে দ্বৈতবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রূপে স্বীকৃতিলাভ করেছেন। তাঁর মতে দেহ ও আত্মা দু'টি স্বতন্ত্র দ্রব্য। দেহ বিস্তৃতিসম্পন্ন ও অচেতন, কিন্তু আত্মা বিস্তৃতিহীন ও চেতন। অর্থাৎ দেহ ও আত্মা একান্ত বিরুদ্ধস্বভাব। কিন্তু, এরা বিরুদ্ধস্বভাব হ'লেও ডেকার্টে এদের মধ্যে একপ্রকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (Interactionism) স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, আমরা যখন কোন কিছু জানি তখন দেহ মনের ওপর ক্রিয়া করে, আর যখন কোন কাজ করি তখন মন দেহের ওপর ক্রিয়া করে। আমরা এই গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এ মতের বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

সমালোচনা—দ্বৈতবাদীরা সকলেই জড় ও চৈতন্যকে বিজাতীয় স্বতন্ত্র সত্তা বলে মনে করেন। ফলে তাঁরা কেউই এদের পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্তিযুক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। জড় ও চৈতন্য যদি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধস্বভাব হয়, তবে তাদের মধ্যে কোন স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকতে পারে না। সাংখ্য দর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনে বিশ্বের অভিব্যক্তি হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু, বিরুদ্ধস্বভাব পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন কি ভাবে হ'বে সে বিষয়ে কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি। সেজন্যই যোগদর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ-বিধানের জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। জড় পরমাণু জগতের উপাদান কারণ, এবং ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ একথা বলেছেন বলে ন্যায়বৈশেষিকদের যদি দ্বৈতবাদী বলা হয় তবে তাঁদের মতও যুক্তিযুক্ত হ'বে না। কারণ, এক্ষেত্রে নিমিত্ত

কারণ ঈশ্বর উপাদান কারণ পরমাণুর দ্বারা সীমিত হবেন, কিন্তু ঈশ্বর অসীম বলেই স্বীকৃত।

ডেকার্টে জড় ও চৈতন্যকে বিরুদ্ধস্বভাব বলেও তাদের মধ্যে একপ্রকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু, জড় ও চৈতন্য বিরুদ্ধস্বভাব হ'লে তাদের মধ্যে কি করে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে, তা আমরা বুঝি না।

দ্বৈতবাদ মানলে মানুষের জ্ঞানের কোন সদ্ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। জ্ঞান জ্ঞাতা বা মন-এর সঙ্গে জ্ঞেয় বা বিষয়ের সম্পর্ক বোঝায়। মন ও বিষয় যদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয় তবে তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক হ'তে পারে না এবং ফলে জ্ঞানের কোন ব্যাখ্যা মেলে না।

দার্শনিক ডেকার্টে যে দ্বৈতবাদের সৃষ্টি করেছেন তার ফলে আধুনিক দর্শনে অনেক অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তাঁকে সেজন্যই আধুনিক দর্শনের সমস্ত অশান্তির জনক বলা হয় (He is the father of all evils in modern philosophy)। দেহ ও মনকে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলে ডেকার্টে এদের সম্পর্ক বিষয়ে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তীকালের বহু দার্শনিক এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে গলদ্‌ঘর্ম হয়েছেন। জ্ঞান জ্ঞাতা মন ও জ্ঞেয় বিষয়ের সম্পর্ক রূপে স্বীকৃত। মন ও বিষয় যদি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধস্বভাব হয় তবে জ্ঞান কীভাবে সম্ভব, তা নির্ণয় করা অসাধ্য হয়ে পড়ে। একদিকে জড়বাদ এবং অন্যদিকে একমাত্র আত্মার অস্তিত্ববাদ (Solipsism) ডেকার্টের দেহ ও মনের আত্যন্তিক বিরোধ থেকে অনুসৃত হয়। ডেকার্টেই দেহ ও মনের বিরুদ্ধ স্বভাবের ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রকৃতিতে জড় ও চৈতন্যের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি করেছেন। আসলে ডেকার্টের দ্বৈতবাদ কোন সমস্যার সমাধান না করে নূতন নূতন জটিল সমস্যার উদ্ভব করেছে। সেজন্যই চিন্তাশীল ব্যক্তিরা নানা অশান্ত ও উপদ্রবের উৎস দ্বৈতবাদ পরিহারের পরামর্শ দিয়েছেন।

আমরা অনেকবার বলেছি, একটি তত্ত্ব দিয়ে জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা দিতে পারলেই চরম ও পরম ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়। এদিক থেকে দ্বৈতবাদ বিশ্বের চরম ব্যাখ্যা দিতে পারে না বলেই স্বীকার করা আবশ্যক। লাঘব নিয়ম অনুসারে (According to the Law of Parsimony) দ্বৈতবাদ বহুতত্ত্ববাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট, কিন্তু অদ্বৈতবাদের চেয়ে নিকৃষ্ট।

অদ্বৈতবাদ (Monism)

অদ্বৈতবাদ অনুসারে এক অদ্বৈত তত্ত্বই জগৎ ও জীবনের মূলতত্ত্ব এবং এই তত্ত্ব দিয়েই জীবন ও ভুবনের সঙ্গত ব্যাখ্যা-দান সম্ভব। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, জগতের শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও গঠন-পারিপাট্য একমাত্র অদ্বৈত তত্ত্ব দিয়েই যথার্থ ভাবে বোঝা যায়।

অদ্বৈতবাদ ত্রিবিধ—জড়বাদী, অধ্যাত্মবাদী ও মধ্যপন্থী (Neutral)। জড়বাদ অনুসারে একমাত্র জড় (Matter)—তত্ত্ব দিয়েই বিশ্বভুবনের ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা এ মতবাদ এই গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করে খণ্ডন করেছি। এখানে এ মতের পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

মধ্যপন্থী অদ্বৈতবাদ (Neutral Monism)

অদ্বৈততত্ত্ব যদি জড়াত্মক (Material) না হয়, তবে তা আধ্যাত্মিক (Spiritual) হ'বে, সাধারণভাবে একথাই মনে হয়। কিন্তু, আধুনিক কালে রাসেল প্রভৃতি দার্শনিকেরা তৃতীয় একপ্রকার অদ্বৈতবাদের কথা বলেছেন। এই অদ্বৈতবাদ মধ্যপন্থী অদ্বৈতবাদ (Neutral Monism) নামে পরিচিত। রাসেল তাঁর 'The Analysis of Mind' গ্রন্থে আমেরিকার বস্তুস্বাতন্ত্র্য-বাদী দার্শনিক অধ্যাপক পেরি ও হোল্টের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন, জড়াত্মকও নয়, আধ্যাত্মিকও নয় এমন কতগুলো মধ্যপন্থী উপাদান (Neutral Particulars) জড় ও মন-এর কারণ। রাসেল আরও বলেন, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান পদার্থকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞান মনকে দেহের ব্যবহারে পর্যবসিত করে এই সিদ্ধান্তকে অবশ্য-ম্ভাবী করে তুলেছে। মধ্যপন্থী উপাদান এক বিশেষ সংগঠনে জড় এবং অনুরূপ সংগঠনে মন সৃষ্টি করে। মধ্যপন্থী উপাদান সাধারণ বস্তুর মত দেশে কালে থাকে না, তবে স্থিতিসম্পন্ন (Subsistent); অর্থাৎ মধ্যপন্থী উপাদান দেশে কালে না থাকলেও মনের ধারণা বা কল্পনার বিষয় নয়। এই মতবাদে জড় ও মনের দ্বৈতধারণা মধ্যপন্থী উপাদানের অদ্বৈত ধারণায় সমন্বিত হয়েছে, সুতরাং একেও একপ্রকার অদ্বৈতবাদই বলতে হয়।

সমালোচনা: আমাদের অভিজ্ঞতায় দেশে কালে থাকে না অথচ কাল্পনিক নয় এমন কোন স্থিতিসম্পন্ন উপাদান (Subsistent entity)-এর পরিচয় পাই না। যে কোন উপাদানই হয় জড়াত্মক, নয়ত আধ্যাত্মিক

হবে, কিন্তু, জড়াত্মকও নয় আধ্যাত্মিকও নয় এমন উপাদান অভিজ্ঞতা-সিদ্ধ নয়। অভিজ্ঞতা-বিরোধী বলে এই মতবাদ গ্রহণ করা যায় না।

অধ্যাত্মবাদী অদ্বৈতবাদ (Spiritual Monism)

অধ্যাত্মবাদী অদ্বৈতবাদ অনুসারে অদ্বৈততত্ত্ব স্বরূপতঃ আধ্যাত্মিক (spiritual)। অধ্যাত্মবাদী অদ্বৈতবাদ দ্বিবিধ—কেবলাদ্বৈতবাদ (Abstract Monism) এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (Concrete Monism)। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে স্পিনোজা কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন এবং হেগেল, রয়েস প্রভৃতি দার্শনিকেরা প্রচার করেছেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। ভারতীয় দর্শনে শঙ্করাচার্য কেবলাদ্বৈতবাদের প্রচারক। এই অদ্বৈতবাদ স্পিনোজার অদ্বৈতবাদ থেকে ভিন্ন। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবক্তা। আমাদের লেখা 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থে শঙ্কর ও রামানুজ-মতের বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে। আমরা এই গ্রন্থে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের কথাই আলোচনা করবো।

কেবলাদ্বৈতবাদ (Abstract Monism)

পাশ্চাত্ত্য দর্শনে কেবলাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক ও প্রচারক স্পিনোজার মতে যা স্বনির্ভর অর্থাৎ অন্যনির্ভর নয়, তাই দ্রব্য (Substance is that which exists in and is conceived through itself)। এই অর্থে একমাত্র ঈশ্বরই দ্রব্য। এই ঈশ্বরই বিশ্বের চরম সত্য ও সত্তা। ঈশ্বর নির্গুণ, নিষ্কল ও অনির্দেশ্য। এই কথা সত্য হ'লে জগৎকে মিথ্যা বলতে হয়। কিন্তু, স্পিনোজা একথা বলেছেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, তিনি যেমন দ্রব্য বা ঈশ্বরকে স্বনির্ভর বা স্বয়ম্ভূ বলছেন, তেমনি আবার তাকেই জগতের কারণ (Natura Naturans) এবং জাগতিক সমস্ত বস্তুর সমাহার (Natura Naturata) বলেও উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বরই যদি জাগতিক সমস্ত বস্তুর সমাহার হ'ন তবে জগৎ মিথ্যা হ'তে পারেনা। এই মতবাদকে সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism)-ও বলা হয়। এই মতে সবই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই সব।

সমালোচনা: আমাদের মনে হয়, দ্রব্য বা ঈশ্বরকে একই সঙ্গে নির্গুণ, নিষ্কল ও অনির্দেশ্য আবার জগতের কারণ এবং জাগতিক দ্রব্যের সমাহার বলা যায় না। দ্রব্য যদি নির্গুণ হয় তবে তা আবার জগতের কারণ হ'বে কি করে? আর যা কারণ তা কি অনির্দেশ্য হ'তে পারে?

স্পিনোজার মতে দ্রব্য ও ঈশ্বর সমার্থক। ঈশ্বর স্বরূপতঃ আধ্যাত্মিক

(Spiritual)। এই আধ্যাত্মিক দ্রব্য কি ভাবে জগতের বিভিন্ন জড় বস্তুর সমাহার হ'তে পারে, তা আমরা বুঝি না।

অনেকেই বলেন, স্পিনোজা অদ্বৈততত্ত্ব বা ঈশ্বরের আত্যন্তিক সত্তা স্বীকার করে বিশ্বের বৈচিত্র্য অস্বীকার করেছেন। হেগেল বিদ্রূপ করে স্পিনোজার ব্রহ্মকে 'সিংহের গহ্বর' (Lion's den) বলে উল্লেখ করেছেন। হেগেলের বক্তব্যের নিহিতার্থ এই, সিংহের গহ্বরে গেলে সমস্ত প্রাণীই যেমন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তেমনি বিশ্ব-বৈচিত্র্য স্পিনোজার ব্রহ্মে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

স্পিনোজার মতানুসারে ঈশ্বরই যদি সব হ'ন, তবে ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি অর্থহীন হয়ে পড়ে। ব্যক্তির স্বাধীনতা না থাকলে তার কাজের নৈতিক বিচার হয় না। অর্থাৎ নীতি তাৎপর্য হারায়। সেজন্যও স্পিনোজার মত গ্রহণযোগ্য নয়।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (Concrete Monism)

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে এই বিশ্বভুবনের পশ্চাতে এক আধ্যাত্মিক অদ্বৈত-তত্ত্ব বর্তমান। এই তত্ত্ব বিশ্বের সীমার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে এবং বিশ্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করে। এই মতে জগতের ঐক্য ও বৈচিত্র্য দুইই সত্য। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের অদ্বৈততত্ত্ব শুধুমাত্র ঐক্য তত্ত্ব (কেবলাদ্বৈত) নয়, বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশিত, সঞ্জীবিত ও সমৃদ্ধ ঐক্যতত্ত্ব (বিশিষ্টাদ্বৈত)। এই বিশিষ্টাদ্বৈত তত্ত্বকে ব্রহ্ম বা Absolute নামে অভিহিত করা হয়। জড় জগৎ ও জীবাত্মা দুইই ব্রহ্মের প্রকাশ, সুতরাং দুইই সত্য। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে হেগেল, রয়েস প্রভৃতি দার্শনিকেরা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচারক।

হেগেল বলেন, ব্রহ্ম (The Absolute) জড় জগৎ ও জীবাত্মার মধ্যেও আছেন, আবার বাইরেও আছেন। তিনি অসীম ও অনন্ত হলেও সীমার মধ্যে ধরা দেন। এই তাঁর লীলা। এই মত সর্বধরেশ্বরবাদ (Panentheism) নামেও পরিচিত। আমরা এই গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ে সর্বধরেশ্বরবাদ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

ভারতীয় দর্শনে রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচারক। তাঁর মতে চরম তত্ত্ব ব্রহ্ম চিৎ ও অচিৎ এই দুই অংশ বিশিষ্ট ; জগৎ অচিৎ-অংশের পরিণতি এবং জীবাত্মা চিৎ-অংশের প্রকাশ। সুতরাং জড় জগৎ ও জীবাত্মা দুইই সত্য।

সমালোচনা: চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদই সাধারণতঃ সন্তোষজনক মতবাদরূপে স্বীকৃত হয়। অনেকেরই ধারণা এই মতবাদে জীব ও জগতের যথার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা এবং জগতের বৈচিত্র্য এই মতবাদে সত্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। জ্ঞাতা মন ও জ্ঞেয় জগৎ দুইই ব্রহ্মের প্রকাশ, একথা বলে এই মতবাদ সহজেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-এর সম্পর্ক বা জ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারে। এই মতে ব্রহ্ম জীবের ভেতরেও আছে আবার বাইরেও আছে বলে জীবের পক্ষে এই ব্রহ্মলাভের ব্যাকুলতা বা ধর্ম এবং ব্রহ্মের পূর্ণতা-প্রাপ্তির চেষ্টা বা নীতি (Ethics) স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এই মতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন। আমরা এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যা কি ভাবে এই মত দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় তা আলোচনা করেছি। এই সব কথা বিবেচনা করে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা যায়।

এই প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, যদিও সাধারণভাবে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়, তবুও আমরা যদি চিন্তার জগতে আরও উচ্চগ্রামে উন্নীত হই, তবে শঙ্করের অদ্বৈতবাদই সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ বলে মনে হবে। যুক্তির দিক থেকে দেখতে গেলে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ মানুষের মহত্তম ও গভীরতম চিন্তার প্রকাশ বলে মনে করি। তবে চিন্তার এই সুউচ্চ মিনারে সকলের পক্ষে ওঠা সম্ভব নয়।

আমরা পূর্বেই বলেছি, বহুতত্ত্ববাদ ও দ্বৈতবাদের চেয়ে অদ্বৈতবাদ যুক্তিযুক্ত। আবার অদ্বৈতবাদের মধ্যে জড়বাদী ও মধ্যপন্থী অদ্বৈতবাদ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদ শ্রেষ্ঠ। আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদ অনুসারে এই বিশ্ব সংসারের পশ্চাতে এক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিরাজিত এবং এই তত্ত্বই আত্যন্তিক সত্য। একথা যদি মানতে হয়, তবে অধ্যাত্মতত্ত্ব ভিন্ন এই জড় জগৎ সত্য হ'তে পারে না, জগৎ মিথ্যা বা মায়াই হ'তে পারে, একথাও বলতে হয়। অনেকে সাহস করে এমন কথা বলতে পারেন না। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে স্পিনোজা একথা বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত বলতে পারেন নি। ব্রেডলি জগৎকে সত্য নয়, আভাস মাত্র (Appearance) বলেও আবার এই আভাস একমাত্র সত্য বা তত্ত্ব (Reality) ব্রহ্মে এক বিশেষ প্রকারে বর্তমান, এমন অদ্ভুত কথা বলেছেন। ভারতীয় দর্শনে একমাত্র শঙ্করই সাহস করে যা যুক্তিতে পাওয়া যায় তা যতই লোকের অপ্রিয় হোক বলতে পেরেছেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাবেই বলেছেন, উপলব্ধির শেষ অবস্থায় শুধু চৈতন্য বা আধ্যাত্মিক সত্তা বা ব্রহ্মই থাকে, জগৎ মিথ্যা

হয়ে যায়। আমাদের মতে শঙ্করের দর্শনেই অদ্বৈতবাদের চরম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তবে শঙ্কর বলেছেন, লোক-ব্যবহারের দিক থেকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মিথ্যা নয়। তাঁর বক্তব্য এই, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের চেয়েও গভীরতর অধিকতর যুক্তিযুক্ত মতবাদ কেবলাদ্বৈতবাদ। সাধনার সর্বশেষ স্তরে কেবলাদ্বৈতের উপলব্ধি লাভ করে সাধক ধন্য হয়।

প্রমাণপঞ্জী

প্রথম অধ্যায়

Sinclair—An Introduction to Metaphysics.
Lewis—Introduction to Philosophy.
Holt & others—New Realism.
R. Das—A Handbook on Kant's Critique of Pure Reason.
Mure—An Introduction to Hegel.
Ewing—Fundamental Questions of Philosophy.
Ayer—Logical Positivism.
Patrick—Introduction to Philosophy.
Dr. K. D. Bhattacharyya—Alternative Standpoints in Philosophy.

দ্বিতীয় অধ্যায়

Descartes—Discourse on Method (Translation by John Veitch).
Hume—An Enquiry concerning Human Understanding.
R. Das—A Handbook on Kant's Critique of Pure Reason.
Mure—An Introduction to Hegel.
Bergson—An Introduction to Metaphysics.
Cunningham—Problems of Philosophy.
S. C. Chatterjee--Problems of Philosophy.

তৃতীয় অধ্যায়

Creighton & Smart—An Introductory Logic.
Bosanquet—Essentials of Logic.
Stebbing—A Modern Introduction to Logic.
Keynes—Formal Logic.
Cunningham—Problems of Philosophy.

চতুর্থ অধ্যায়

Paulsen—Introduction to Philosophy.
Walsh—Reason and Experience.
Cunningham—Problems of Philosophy.
R. Das—A Handbook on Kant's Critique of Pure Reason.
Wright—History of Modern Philosophy.
Hume—An Enquiry concerning Human Understanding.
Mure—An Introduction to Hegel.

পঞ্চম অধ্যায়

Hocking—Types of Philosophy
S C Chatterjee—Problems of Philosophy.
Holt & others—New Realism
Drake & others—Critical Realism.
Morris—Locke, Berkeley, Hume
Latta—Monadology
D M Datta—The Chief Currents of Contemporary Philosophy.
Mure—An Introduction to Hegel
Alexander—Space, Time & Deity, Vol I

ষষ্ঠ অধ্যায়

Eddington—The Nature of the Physical World
Russell—An Outline of Philosophy.
Eddington—Space, Time & Gravitation.
Schlik—Space & Time
Vasiliev—Space, Time, Motion.
Taylor—Elements of Metaphysics
Bradley—Appearance & Reality
Alexander—Space, Time & Deity.
Latta—Monadology
R Das—A Handbook on Kant's Critique of Pure Reason
Patrick—Introduction to Philosophy
Joad—Guide to Philosophy.

সপ্তম অধ্যায়

Bradley—Appearance & Reality.
R Das—A Handbook on Kant's Critique of Pure Reason.
Russell—Our Knowledge of the External World
Russell—Problems of Philosophy.
Mure—An Introduction to Hegel
Hume—An Enquiry concerning Human Understanding
Wright—History of Modern Philosophy.
Whitehead—Process & Reality.
Alexander—Space, Time & Deity.

অষ্টম অধ্যায়

Joachim—The Nature of Truth.
Laird—Knowledge, Belief & Opinion.

Rogers—What is Truth ?
Russell—Problems of Philosophy.
D. M. Datta—The Chief Currents of Contemporary Philosophy.
Russell—The Analysis of Mind.
Eric Temple Bell—The Search for Truth.
William James—Pragmatism.
Schiller—Studies in Humanism.
Dewey—Essays in Experimental Logic.
S. C. Chatterjee—Problems of Philosophy.
A. C. Das—Negative Fact, Negation & Truth.

নবম অধ্যায়

Cunningham—Problems of Philosophy.
Russell—The Analysis of Matter.
Eddington—The Nature of the Physical World.
James Jeans—The New Background of Science.
Lange—History of Materialism.
Haldane—Materialism.
Hocking—Types of Philosophy.
James Ward—Naturalism & Agnosticism, Vol. I.

দশম অধ্যায়

Cunningham—Problems of Philosophy.
Hoernle—Matter, Life, Mind and God.
Symposium on Mechanism & Vitalism in The Philosophical Review, Vol. XXVII., pp. 571 ff.
Loeb—The Organism as a whole.
Loeb—The Mechanistic Conception of Life.

একাদশ অধ্যায়

Darwin—The Descent of Man.
Newman—Evolution Yesterday & Today.
Lloyd Morgan—Emergent Evolution.
Bergson—Creative Evolution.
Boodin—Cosmic Evolution.
Alexander—Space, Time and Deity.
Sellars—Evolutionary Naturalism.
Mure—An Introduction to Hegel.
Hoernle—Matter, Life, Mind & God.

দ্বাদশ অধ্যায়

Cunningham—Problems of Philosophy.
Morris—Six Theories of Mind.
Hume—An Enquiry concerning Human Understanding.
R. Das—A Handbook on Kant's Critique of Pure Reason.
John Laird—The Nature of Self.
Watson—Psychology from the standpoint of a Behaviorist.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

Paulsen—Introduction to Philosophy.
McDougall—Body and Mind.
J. B. Pratt—Matter and Spirit.
Cunningham—Problems of Philosophy.
Descartes—Meditations.
Latta—Monadology.

চতুর্দশ অধ্যায়

Galloway—The Idea of Immortality.
James—Human Immortality.
Myers—Human Personality and its Survival of Bodily Death.
Barrett—Psychical Research.
Royce—The Conception of Immortality.
স্বামী অভেদানন্দ—মরণের পরে।
ফণিভূষণ তর্কবাগীশ—বাৎস্যায়ন ভাষ্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

G. C. Bussey—Typical Recent Conceptions of Freedom.
David Hume—Essay on Liberty & Necessity.
C. D. Broad—Determinism, Indeterminism & Libertarianism.
Bergson—Time & Free Will.
Paulsen—A System of Ethics.

ষোড়শ অধ্যায়

Royce—The Conception of God.
Waterhouse—Religion.
Wright—A Student's Philosophy of Religion.
James—Varieties of Religious Experience.
Bosanquet—What religion is.
Hume—Dialogues concerning Natural Religion.

Schurman—Belief in God.
Dr. A. K. Raychoudhury—Doctrine of Maya.
—Self and Falsity in Advaita Vedanta.
Caird—Religion.
R. Das—A Handbook on Kant's Critique of Pure Reason.

সপ্তদশ অধ্যায়

J. Laird—The Idea of Value.
Clarke—A Study in the Logic of Value.
Perry—General Theory of Value.
Santayana—The Sense of Beauty.
Croce—Aesthetics, Part I.
Taylor—Elements of Metaphysics.
Plato—The Republic, Book III.
Royce—The Conception of God.
Bradley—Appearance & Reality.
Dr. A. K. Ray Choudhury—Doctrine of Maya.

অষ্টাদশ অধ্যায়

পঞ্চানন শাস্ত্রী—ভাষা পরিচ্ছেদ
কালী কৃষ্ণবন্দ্যোপাধ্যায—ন্যায়তত্ত্ব পরিক্রমা
Descartes—Discourse on Method (Translated by John Veitch).
Descartes—Meditations.
Hocking—Types of Philosophy.
William James—Pragmatism.
Stace—An Outline of Greek Philosophy.
Latta—Monadology.
Russell—The Analysis of Matter.
Haldane—Materialism.
Wright—History of Modern Philosophy.
Falckenberg—History of Modern Philosophy.
Mure—Hegel.
Bradley—Appearance & Reality.
K. C. Bhattacharyya—Studies in Vedantism.